২য় ভাগ। ১২৯৪ সাল ১ম খণ্ড।

দ্বিতীয় বর্ষ।

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর অতিবাহিত হইল ; সুতরাং বেদব্যাসের জীবনেরও এক বৎসর পূর্ণ হইল। এই একটি বৎসর আমরা যথাসাধ্য পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া বেদব্যাসের সেবা করিয়াছি এবং তাহার জন্য আশাতিত ফলও পাইয়াছি। আমরা কখন ভাবি নাই, যে, বেদব্যাস এই একবৎসর মধ্যেই সাধারণ হিন্দু মাত্রেরই এত আদরের ধন হইবে। গতবৎসর যেরূপ উৎসাহ ও সহায়তা পাইয়াছি তাহাতে আমাদের ভরসা আরও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ এবং অন্যান্য নানা কারণে আমরা বেদব্যাসের উন্নতি সাধন পক্ষে কায়মনবাক্যে সম্যক চেষ্টা করিতে পারি নাই। শরীর পীড়িত হইলে, কার্য্যের যে নানা প্রকার গোলযোগ হওয়া সম্ভব, তাহা বোধ হয় বেশী করিয়া বলিতে হইবেনা। সুতরাং গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট আমাদের অনেক ত্রুটি হইয়াছে। আমরা সেজন্য গ্রাহক সমীপে সানুনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ঈশ্বর কৃপায় আমাদের স্থুল দেহটা এখন অনেক সুস্থ হইয়াছে ; সুতরাং, এবার যাহাতে বেদব্যাসের নানা বিষয়ে উন্নতি বিধান করিতে পারি তাহার নিমিত্ত বিধিমত প্রকারে যত্ন ও পরিশ্রম করিতে কৃত সংকল্প হইয়া আমরা দ্বিতীয় বৎসরের কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলাম। মনে অনেক সাধ আছে। ভগ-

বানের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা এই, যে, তিনি আমাদের এই ক্ষুদ্র চেষ্টার সহায় হইয়া আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল মানবের আত্মার কল্যান সাধন করুন। ত্রিতাপাক্রান্ত পাপীর ভগবানই একমাত্র ভরসা।

আর একটী কথা। আমাদের একান্ত বাসনা, যে বেদব্যাস খানিকে যেন আমরা বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অধ্যাপকগণের মুখপত্ররূপে পরিচয় দিতে সক্ষম হই। বঙ্গের অধ্যাপক কুল ভূষণ স্বরূপ মহাত্মাগণের শাস্ত্রীয় উপদেশ পূর্ণ.প্রবন্ধাদি ও নানাবিধ শাস্ত্রীয় বিচারাদিতেই বেদব্যাসের কলেবর পুষ্ট হউক। এই অত্যুচ্চ উদ্দেশ্য লইয়াই আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলাম। গত বৎসর আমরা কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছি। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য এখনও সফল হয় নাই। দ্বিতীয় বৎসরে যাহাতে সেই উদ্দেশ্য সম্যক প্রকারে ফলপ্রদ হয় তজ্জন্য আমরা প্রাণপণে সচেষ্ট হইব।

অধ্যাপক মহোদয়গণের নিকট আমাদের করযোড়ে বিনীত প্রার্থনা' যে, তাঁহারা কৃপা করিয়া বেদব্যাসকে আপনার করিয়া লউন, এবং আপনার জিনিষ ভাবিয়া যেরূপ যত্ন ও চেষ্টা সম্ভব সেইরূপ যত্ন ও চেষ্টা প্রয়োগ করুন। তাহা হইলেই তাঁহাদের এই সমবেত চেষ্টার বেদব্যাসের দ্বারা সমাজের পরম মঙ্গল সংসাধিত হওয়া একান্ত সম্ভব।

সন্ধিপূজা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয়তঃ, উক্ত সৃষ্টি তত্ত্ব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া যে ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত হয়, তাহার সেই অনুরাগ বিষয়ানুরাগ মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। উহা রাজস বা তামস অনুরাগ নহে, উহা সাত্বিক অনুরাগ। ইন্দ্রিয়াদির ভোগ কামনা করিয়া, যে অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তাহাই বিষয়ানুরাগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তাহাকেই রাজস বা তামস অনুরাগ বলে। সেই অনুরাগের দ্বারাই জীব বিষয়ের সহিত আবদ্ধ হইয়া অধোগত হয়। এবং সেই অনুরাগ জনিত কার্য্যের ভাল মন্দের নিমিত্ত তাহারই সম্পূর্ণ দায়িত্ব। আমার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগকে সাত্বিক অনুরাগ বলে, এবং আমার আজ্ঞা বা নিয়ম পরিপালন মনে করিয়া যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহা ঐ সাত্বিক অনুরাগ মূলক, অথবা আমার অনুরাগ মূলক; অতএব আমার প্রতি অনু-

রাগ মূলক, যে, স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ তাহাও সাত্বিক অনুরাগের অন্তর্গত। কথস্থায়ি পিতা মাতার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইলে, যেমন তাঁহাদের কার্য্যের প্রতিও অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, এবং সেই কার্য্যানুরাগ তাহাদের পিতৃ মাতৃ অনুরাগ মূলক বলিয়া, উহাও সেই পিতৃ মাতৃ অনুরাগের মধ্যে গণ্য, এ স্থলেও সেইরূপ আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইলেই স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, এবং তাহার হ্রাস হইলেই উহারও হ্রাস হয়। অতএব আমার অনুরাগ মূলক যে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ তাহা আমার অনুরাগের মধ্যেই পরিগণিত। এজন্য ঐরূপ ভাবে যদি স্ত্রীর প্রতি অনুরক্তি হয় তদ্দারা আমার সহিতই ক্রমে ঘনিষ্টতা হইতে থাকে, আমার সহিত অভিসম্বন্ধ হইতে থাকে, কিন্তু বিষয়ের সহিত কিছু মাত্র সম্বন্ধ হয় না।

যাঁহারা হতভাগ্য তাহাদের মনে এই তত্বস্থান পায় না। পশু পক্ষী, কীট, এবং উদ্ভিজ্জাদির মধ্যে আমার সৃষ্টি ক্রিয়ার জ্বলন্ত উদাহরণ সর্ব্বদা দেখিয়াও তাহারা শিক্ষিত হয় না। তাহারা বিশ্বাস করে এই, যে, তাহাদের ভোগের নিমিত্তই আমি স্ত্রীর সৃষ্টি করিয়াছি, এবং স্ত্রীর ভোগের নিমিত্তই পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছি, আর স্ত্রী পুরুষের পরস্পরানুরাগ বা প্রেমকেও ভোগের অঙ্গ বিশেষ বলিয়া গণ্য করে। স্ত্রী পুরুষ সংযোগাদি ব্যাপারও এই ভাব হইতেই করিয়া থাকে ; সুতরাং অধোগত হইয়া নানা প্রকার কষ্টানুভব করে। এই বলিলাম স্ত্রী পুরুষের ব্যবহার নিয়ম, এখন পুত্র কন্যাদি রক্ষা এবং অন্যান্য গার্হস্থ্যানুষ্ঠানের নিয়ম বলিতেছি শুন।

পিতা মাতার দ্বারা যে শিশু সন্তানের লালন পালনাদি কার্য্য হইয়া থাকে তাহাও আমারই পালন কার্য্যের অন্তর্গত। আমিই পৃথক২ পিতামাতার দ্বারা পৃথক পৃথক শিশুর সংরক্ষা ও প্রতিপালন করিয়া থাকি। ভোলাদাস! তুমি একবার পশু পতঙ্গাদির সন্তান প্রতিপালন ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া দেখ, তাহা হইলেই ইহার জাজ্জ্বল্যমাণ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সকলেই প্রাণপণে আপনাপন শিশু সন্তানের প্রতিপালন করে ; কিন্তু সন্তানের দ্বারা কোনরূপ প্রত্যুপকার বাসনায় তাহারা এরূপ করে না। পুত্র কন্যার দ্বারা যে পিতামাতার কোন উপকার হইতে পারে এজ্ঞানও তাহাদের নাই, অথচ আপনি না খাইয়া শিশুকে খাওয়ায়, আপনি মরিয়াও শিশুকে বাঁচায়। ইহাকি উহাদের নিজের কার্য্য ? কখনই নহে· উহা আমার কার্য্য, আমি সর্ব্বদাই সকলের রক্ষার নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্ট

করিতেছি, আমিই পিতামাতার দ্বারা এই শিশু শাবকগুলিকে, রক্ষা করিয়া থাকি। অবোধ এবং অসমর্থ শিশুর রক্ষার নিমিত্ত আমিই উহাদের পিতা মাতার হৃদয়ে অপরিমিত স্নেহ মমতা জন্মাইয়া দিই। পরে যখন ঐ শিশু গুলি আপনা হইতেই আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, তখন আমার সমর্পিত স্নেহ আবার আমিই তুলিয়া নীই। আবার আবশ্যক মতে আমিই প্রসবের পূর্ব্বেই মমতার সঞ্চয় করিয়া দিই। সেইরূপ মনুষ্যগণ যে আপনাপন শিশু সন্তানকে লালন পালনকরে তাহাও আমারই পালন কার্য্য। আমিই,অবোধ অসমর্থ নিঃসহায় নিঃসম্বল জীবের সংরক্ষণ ও পরিপুষ্টির নিমিত্ত জননীর গর্ভে স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছি; প্রসবের পরেও সেই জড় পিণ্ডবৎ জীবের সংরক্ষণের নিমিত্ত তাহার পিতামাতার হৃদয়ে অতিশয় স্নেহ সঞ্চার করি, উহারা সেই স্নেহ মমতার বশবর্ত্তী হইয়া শিশু সন্তানের সংরক্ষণে যত্নবান্ হয়। আমি মাতার দ্বারা উহার শারীরিক পরিচর্য্যা করাই, এবং পিতার দ্বারা উহার আহার ও শয্যাসন বসনাদিসংগ্রহের নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জনাদি কার্য্য করাইয়া থাকি। ক্রমে এই শিশুটি একটু সমর্থ হইলেই আবার আর একটি জন্মাইয়া থাকি। আবার তাহার নিমিত্ত পিতা মাতাকে ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করি, এইরূপে জীবের কর্ম্মচক্র চলিতে থাকে। ভোলাদাস! আমার এই পালন কার্য্যের রহস্য সর্ব্বদাই মনে রাখিয়া সমস্ত কর্ম্ম করিবে। সন্তান সন্ততির শরীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং আহারাচ্ছাদনাদির নিমিত্ত, মাতা পিতাকে যে কোন কর্ম্ম বা চেষ্টা করিতে হয়, তাহাই আমার কার্য্য বলিয়া, সুদৃঢ় ধারণা রাখিবে। তৎপর তাহাদের নিজের দেহ রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত, যে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান করে তাহাও আমারই সেই সার্ব্বভৌম পালন ক্রিয়ার অন্তর্গত। সকলের যথা নিয়মিত জীবন রক্ষার নিমিত্ত আমিই সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছি, এবং তাহার নিমিত্ত নানা প্রকার বৃত্তি, ব্যাপার, ও কৌশলাদির উদ্ভাবন করিয়া এক এক বৃত্তি, এবং এক এক ব্যাপারে এক এক জনকে নিযুক্ত করিয়া থাকি। তদ্দ্বারা তাহাদের নিজ দেহ রক্ষা এবং স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদির দেহ রক্ষা করি। বৎস! ভোলাদাস! যাহারা এবিষয়ে সন্দিহান হয় তাহাদিগকে তুমি বলিও তাহারা যেন একবার এই জগতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, তবেই তাহাদের বোধোদয় হইবে।

ভোলাদাস। মা! জগতের প্রতি তাকাইয়া তোর কি দেখিবে?

জগদম্বা। আমার সৃষ্টিরক্ষার কৌশল বুঝিতে পারিবে, এবং তাহাদের

আত্মাভিমান বিদূরিত হইবে। ভাবিয়া দেখ! মনুষ্য যদি একান্তই আত্মাভিমান করে, তবে কেবল ধন ধান্যাদি উপার্জ্জন বা সংগ্রহের নিমিত্ত যে সকল ক্রিয়া হয়, তাহাতেই তাহাদের নিজের কর্ত্তৃত্ব বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে; কিন্তু তদ্বারা কি প্রাণীর জীবন রক্ষা হইতে পারে? যদি উপযুক্ত মত ঋতু পরিবর্ত্তন ও জল বর্ষণাদি না হয় তবে কেবল মাত্র কৃষকের চেষ্টার দ্বারা ধান্য সংগ্রহ হইতে পারে কি? আর যদি ধান্যাদি শষ্যই সমুৎপন্ন না হয়, তবে কেবল অর্থোপার্জ্জনের দ্বারা জীবন রক্ষা হয় কি? তাহা কদাচ সম্ভবেনা। কিন্তু ঐ সকল কার্য্যে কি কাহারও হাত আছে? মনুষ্য ইচ্ছা বা চেষ্টা করিয়া শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুর আনয়ন বা পরিবর্ত্তন করিতে পারে কি? অথবা বৃষ্টির অবতারণা করিয়া শষ্য রক্ষা করিতে পারে কি? কখনই না। তৎপর সহস্র বৃষ্টিবর্ষা হইলেও আমি যদি আপন শক্তি বিস্তার দ্বারা শষ্যাঙ্কুর উদ্ভিন্ন, বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট না করি, তবে কোন মানবের এমন ক্ষমতা আছে কি, যে, তাহার নিজের শক্তি বা ইচ্ছা দ্বারা একটি বীজ অঙ্কুরিত করিতে পারে? কখনই না। ঐ সকল ক্রিয়া আমার হস্তে নিহিত। জগতের রক্ষার নিমিত্ত আমিই যথা সময়ে ঋতু পরিবর্ত্তন, জলবর্ষণ, তাপদান, এবং শষ্যাদির সৃষ্টি, পুষ্টি ও বৃদ্ধি করিয়া থাকি। লোকে একটু সামান্য চিন্তা করিলেই ইহা দেখিতে পারে; সেইরূপ, আপনাপন আহারাদি সংগ্রহের নিমিত্ত, যে, মনুষ্যগণ নানা প্রকার চেষ্টা করে তাহাও তাহাদের নিজ হইতে হয় না। তাহা আমিই করাই, তাহাও আমার সেই সার্ব্বভৌম পালন ক্রিয়ার অন্তর্গত। যে নিয়মানুসারে আমি শীতের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা ঋতু প্রাদুর্ভূত করি, যে নিয়মানুসারে অনাবিষ্টির পর বৃষ্টি, অতি বৃষ্টির পর শুষ্কতার আবির্ভাব করি, যে নিয়মানুসারে আমি নির্ব্বাতের পর বায়ুপ্রবাহ এবং মহাবাত্যার পর মন্দ বায়ু পরিচালনা করি, যে নিয়মানুসারে আমি যথা কালে যথা সময়ে অসঙ্খ্যের পুষ্প, ফল, মূল, ও লতা পত্রাদির সমুদ্গম করিয়া নিখিল দেহের পরিপুষ্টি ও সংরক্ষণ করি, যে নিয়মানুসারে আমি পিতা মাতার হৃদয়ে অপরিমিত স্নেহ সঞ্চার করিয়া সমস্ত জীবজন্তুর রক্ষা করিয়া থাকি, সেই সার্ব্বভৌম নিয়মানুসারেই আমি নিখিল প্রাণিগণকে ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা, ব্যাপার ও ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত করিয়া থাকি। আমিই বায়ুর দ্বারা মেঘমালা বহন করিয়া নীই, আবার মেঘের দ্বারা জলবর্ষণ করি, কর্ম্মকারের দ্বারা লাঙ্গল গড়ি, কৃষকের দ্বারা কর্ষণ করি,

এবং সূর্য্যের দ্বারা তাপ বিকীরণ করি; আমিই স্থপতিরদ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ, তন্তুবায়ের দ্বারা বস্ত্র বয়ন, বণিকের দ্বারা বানিজ্য, ভৃত্যের দ্বারা সেবা, প্রভুর দ্বরা রক্ষণ, এবং ধার্ম্মিকের দ্বারা ধর্ম্ম বিতরণ ইত্যাদি নিখিল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। আমি যাহাকে যে পরিমাণে যে কার্য্যের উপযুক্ত মনে করি তাহাকে সেই পরিমাণে সেই কার্য্যে সেই প্রবৃত্তি জন্মাইয়া চেষ্টা যুক্ত করি, পরে তাহা সম্পন্ন হয়; এই সকল চেষ্টা ও ব্যাপারের দ্বারা উহাদের নিজ নিজ দেহ এবং আত্মা পরিরক্ষিত হয়। আবার অন্য দেহ রক্ষার ও বিশেষ বিশেষ সহায়তা করে। এই রূপে আমার অদ্ভূত পালন কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

ভোলাদাস! মানবগণ, জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত যে কোন রূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার প্রত্যেক কার্য্যের দ্বারাই, সন্তান সন্ততি রক্ষা, স্ত্রী রক্ষা, আত্মরক্ষা এবং অন্যান্যের দেহ রক্ষা এই চারিটিই সংসাধিত হয়; কিন্তু যাহার স্ত্রী পুত্রাদি নাই তাহার কর্ম্মদ্বারা কেবল আত্ম রক্ষা আর অন্যান্যের রক্ষা কার্য্যই সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং সংসারের সমস্ত কার্য্যই আমার সেই সার্ব্বভৌম পালন ক্রিয়ার অন্তর্গত। এইকথা গুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া আত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাবৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। প্রাতঃকালে যখন গাত্রোত্থান করিবে, তখন অন্ততঃ দুই দণ্ড কাল পর্য্যন্ত স্থিরচেতা হইয়া উক্ত ভাবটী দৃঢ়ীকৃত করিবে, তৎপর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যখন যে কর্ম্মের আরম্ভ করিবে, তখনই ঐ ভাবটি এক এক বার জাগাইয়া লইবে। তৎপর কার্য্যারম্ভ করিবে, এই ভাব বিস্মৃত হইয়া কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইবে না। আমার এইরূপ ক্রিয়া রহস্য আমিই শ্রুতিতে বারম্বার বলিয়াছি, "অহ মেবচ গাং গেভিস্তর্পয়ামি, ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেন তর্পয়ামি, হবির্হবিষা, আয়ুরায়ুষা, ইত্যাদি" (আথর্ব্বনশ্রুতি)। গীতাতেও আদ্যোপান্তই এই উপদেশ দিয়াছি। ঋষিগণ এবং ইন্দ্রাদি দেবগণও বারম্বার এই কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, "বিসৃষ্টৌ সৃষ্টরূপাত্বং স্থিতিরূপাচ পালনে। তথা সংহৃতি রূপান্তে হ্যোতাহস্য জগন্ময়ে। মহা বিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ। মহা মোহাচ ভবতী মহাদেবী মহা সুরী। প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয় বিভাবিনী। কালরাত্রির্ম্মহা রাত্রির্ম্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা। ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরীত্বংহ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্ব্বোধলক্ষণা। লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টি স্ত্বং শান্তিঃ

কান্তিরেবচ।” ইত্যাদি। আবার সমস্ত দেবগণ একত্রিত হইয়া বলিয়াছিলেন “ * * যাদেবী সর্ব্ব ভূতেষু বৃত্তি রূপেণ সংস্থিতা * * যাদেবী সর্ব্ব ভূতেষু মাতৃ রূপেণ সংস্থিতা * * যাদেবী সর্ব্ব ভূতেষু দয়া রূপেণ সংস্থিতা * * ইত্যাদি।” অতএব আমার কর্ত্তৃত্বের বিশ্বাস ভুলিয়া কথনই অস্মাভিমান করিও না।

বৎস! ভোলাদাস! যে ব্যক্তি আত্মাভিমান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, সমস্ত সাংসারিক কর্ম্মকে আমার কর্ম্ম বলিয়া নিশ্চিত ধারণা রাখে, এবং সেই ভাবেই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে যদি চব্বিশ ঘণ্টাও কেবল সংসারের কার্য্যই করে, তথাপি তাহাকে সংসারী বলিতে পারা যায় না। তাহার কোন কর্ম্মই সাংসারীক কর্ম্ম বলিয়া গণ্য নহে। কারণ উহা তাহার নিজের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয় না; কিন্তু এই সমস্ত কর্ম্মই আমার উপাসনা মধ্যে পরিগণিত হয়। সে যে সন্তানোৎপত্তির ক্রিয়া করে তাহাও আমার উপাসনা, স্ত্রীকে ভাল বাসে তাহাও আমার উপাসনা, শিশু সন্তানের লালন পালনাদি করে তাহাও আমার উপাসনা, কৃষি বাণিজ্যাদি করে তাহাও আমার উপাসনা, পরকীয় বিষয়কর্ম্ম করে তাহাও আমার উপাসনা; সে যাহা করে তাহাই আমার উপাসনা তাহাই আমার পূজা। কারণ সে আমার কার্য্য বলিয়া সুদৃঢ় ধারণা করিয়া ঐ সকল কার্য্য করিতেছে; সুতরাং আমারই কর্ম্ম করিতেছে। অতএব ঐরূপ ব্যক্তি পৃথকরূপে আমার ধ্যান ধারণা বা পূজাদি না করিলেও কিছুমাত্র দোষ হইতে পারে না। ঐরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম “কর্ম্মযোগ।” ঐরূপ কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিলেই এক প্রকারে আমার ধ্যান ধারণাদি করা হয়। এইরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কাহারও কোনরূপ দায়িত্ব হইতে পারে না, তাহার কর্ম্মের ভাল মন্দের নিমিত্ত আমিই দায়িনী থাকি, অথচ তাহার জীবন যাত্রাও অক্লেশে নিষ্পাদিত হয়। এই কথাই আমি শ্রীমান অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছি।

কিন্তু যে ব্যক্তি অবিদ্যা বশগ হইয়া আমার কার্য্যকে তাহার নিজের কার্য্য বলিয়া ধারনা করে, এবং সেই ভাবেই সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করে, অর্থাৎ আপনার ভোগ্য বস্তু বলিয়া স্ত্রীরপ্রতি অনুরক্ত হয় এবং আপনার ভোগ্যবস্তু বলিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণাদির নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জনাদি করে, যে ব্যক্তি আপনার ভবিষ্যৎ উপকার আশায় “আমার আমার ” বলিয়া সন্তান সন্ততি

লালন পালনাদি করে, এবং আপনার সুখ হইবে, আপনার উন্নতি হইবে, প্রভুত্ব হইবে ইত্যাদি প্রত্যাশায় "আমার সংসার আমার গৃহস্থালী" ইত্যাদি ধারণারশবর্ত্তি হইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহার ঐহিক পারত্রীক কোন প্রকার সুখের আশা নাই। তাহারই পক্ষে এই অনন্ত সংসার প্রবাহে, ধারাবাহিক্রমে, বারম্বার, জন্ম মৃত্যু, স্বর্গ, নরক, দুঃখ, শোকাদি হইয়া থাকে। সে আমাকে দেখিতে পায়না, পাইতেও পারেনা।

কিন্তু আমার কার্য্য বলিয়া যে মানব সংসার যাত্রার পরিচেষ্টাকরে তাহার তাহার সংসারে কোন প্রকার অভাব হইতে পারে না। আমিই তাহার সমস্ত অভাব বিমোচন করিয়া থাকি। স্ত্রী পুত্রাদি কিম্বা নিজ দেহের ও কোনরূপ, শোক, তাপ, রোগ বা অকালমৃত্যু প্রভৃতি অনিষ্ট হইতে পারে না। আমি আমার কার্ত্তিক গণেশের ন্যায় তাহাদিগকে ক্রোড়ে রাখিয়া রক্ষা করিয়া থাকি। ফলপক্ষে, যে ব্যক্তি আত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার কর্ম্ম বা আমার পরিচর্য্যা করিতেছে বলিয়া যাবৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার কোন রূপ শোক দুঃখ হওয়ার কারণই আদৌ থাকে না; কেন না, সংসারের আসক্তি বা ভোগানুরাগ বা ভোগ লিপ্সাই সকল প্রকার শোকদুঃখের মূল। স্ত্রী পুত্র ও ধন ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা নানা প্রকার ভোগ কামনা করিলেই ঐ সকল ভোগ্য বিষয়ের অন্যথা হইলে অগত্যা দুঃখ শোকাদি হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা ভোগবাসনাবশগ না হইয়া কেবল মাত্র আমার কর্ম্ম বা আমার পরিচর্য্যা বিশ্বাস করিয়া সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহাদের স্ত্রী পুত্র ধনাদির অন্যথা হইলে শোক দুঃখ হইবে কেন? সে সর্ব্বদাই পরমানন্দ-পরমশান্তির উপভোগ করে। অতএব তুমি সকলকেই বলিবে, যদি এই সংসারেতে কেহ প্রকৃত সুখ শান্তিরকামনা করে, তবে যেন সর্ব্বদাই আমার এই মহার্ঘ উপদেশ গুলি স্মরণ রাখে।

ভোলাদাস। মা! তুই যাহা বলিলি একথা পূর্ব্বেও অনেক বার অনেককে বলিয়াছিস, এবং ঋষিগণও তোর সেই কথা অনুবাদ করিয়া সকলকে উপদেশ দিয়া থাকেন; সুতরাং তোর ঐ ক্রিয়া রহস্য অনেকেই অবগত আছে, কিন্তু প্রায় কেহই কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না, তখন উহা অতীব সুকঠিন হইয়া পড়ে। কারণ তুই পুত্র কলত্রাদি প্রত্যেক ভোগ্য বিষয়ের মধ্যেই কিছু না কিছু সুখ মাত্রা নিহিত করিয়াছিস, অতএব আমরা কার্য্যের প্রারম্ভে যদিও তোরই কর্ম্ম করিতেছি বলিয়া বিশ্বাস বা সঙ্কল্প

করিতে পারি, কিন্তু কার্য্য করার সময়ে কিম্বা পরে যখন তাহাহইতে এক এক প্রকার সুখানুভূতি হইতে থাকে, তখন তোর কথা বিস্মৃত হইয়া সুখের ভাবই মনের মধ্যে উপস্থিত হয়; সুতরাং তাহারই প্রতি অনুরাগ হয়, এবং শেষে সেই অনুরাগ বশবর্ত্তী হইয়াই এক এক ক্রিয়া করিতে হয়, অতএব আত্মাভিমানও আসিয়া পড়ে। কিন্তু তুই যদি বিষয়ের মধ্যে কোন সুখ মাত্রা না দিতিস তাহাহইলে আর জীবের বিষয়ানুরাগ হইত না, আত্মাভিমাম ও হইত না। তবে তোর কর্ম্ম বলিয়াই সকলে সকল কর্ম্ম করিত, অথবা সুখ দিয়েছিলে দিয়েছিলে,—যদি অনুরাগ নাদিতিস তবে আত্মাভিমান হইত না। তাহাতেও তোর কর্ম্ম বলিয়াই কর্ম্মানুষ্ঠান হইত। কিন্তু তাহাতো তুই করিস নাই! তবে তোর কথা কার্য্যে পরিণত করিব কি রূপে? আবার আর এক, কথাও জানিতে ইচ্ছা; মা! তোর এই উপদেশ পালন করা যাহার ভাগ্যে ঘটে তাহার কি শ্রবণ মাত্রে এক দিনেই ঘটে?

জগদম্বা।—তাহা কখনই নহে, হৃদয়ের চিরসঞ্চিত সংস্কার এক দিনেই স্খলিত হয় না। জীব চিরদিন অবধি আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ঐশ্বর্য্য, আমার ধন, আমার সংসার, আমার নিমিত্তই সকল, আমি স্বাধীন আমিই সকল করি" এই ধারণা ও বিশ্বাস বা সংস্কারের দ্বারা পরিপোষিত হইয়া আসিতেছে। তাহার মন ঐরূপ সংস্কার রাশির দ্বারাই গঠিত। তাহা কি এক দিনেই বিনষ্ট হইতে পারে? তাহা নহে, কিন্তু আমার এই তত্বোপ-দেশানুসারে বহুদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে সুদৃঢ় অভ্যাসের দ্বারা যখন ঐ রূপ সংস্কার বলবান হইয়া দাঁড়ায়, তখনই এই চির সম্ভূত কুসংস্কার বা মিথ্যা সংস্কার বিদূরিত হয়। অতএব তীব্র যত্ন সহকারে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করা নিতান্ত উচিত।

বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তির উপায় বলিতেছি শুন। কেবল উপদেশের দ্বারা জীবের বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হওয়া নিতান্ত সুকঠিন তাহা সত্য, এই জন্য উপায়ান্তর পরিকল্পিত হইয়াছে। সে উপায় এমন সুকৌশলযুক্ত, যে, তদ্দারা বিষয়ের ভোগও অনায়াসে সম্পন্ন হয়, আবার তৎসঙ্গেং বিষয় বাসনা নিবৃত্ত হইয়া আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। সেই অদ্ভুত কৌশল তোমাকে বলিয়া দিতেছি, তুমি সকলকে ইহা জানাইবে, তাহা হইলেই তাহারা কৃত-

কার্য্য হইতে পারিবে। সমস্ত বিষয় আমাতে সমর্পন করা অর্থাৎ সমস্ত ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা আমার অর্চ্চনা করাই বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তির মুখ্যতম কৌশল। এমন কৌশল আর সম্ভবেনা। জীব পুর্ব্বোক্ত ভাবের অভ্যাস করিতে থাকিবে, অর্থাৎ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড একমাত্র আমারই সংসার; আমিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হর্ত্রী, কর্ত্রী, এবং বিধাত্রী; এ সংসারে যে কোন প্রকার ক্রিয়া হয় তৎসমস্তই আমার সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় ক্রিয়ার অন্তর্গত। আপন অভিপ্রায় বা কার্য্য সাধনের নিমিত্ত আমিই এই নিখিল প্রাণীদ্বারা নিখিল কর্ম্ম কলাপ করাইতেছি। এসংসারের প্রত্যেক জীব কেবল আমারই কর্ম্ম করিতেছে, নিজের নিমিত্ত কিছুই করিতেছে না এইরূপ ধারণা সুদৃঢ় করার চেষ্টা করিতে থাকিবে। সর্ব্বদাই এইরূপ চিন্তা এইরূপ ভাবনার অভ্যাস করিতে থাকিবে, অমনি তৎসঙ্গে নানা প্রকার ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিতে থাকিবে।

মনুষ্য দশটা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দশপ্রকার বিষয়ের ভোগ করিয়া থাকে, চক্ষুর দ্বারা নানা প্রকার সুদৃশ্য বস্তু দেখে, কর্ণ দ্বারা সুমধুর সঙ্গীতাদি শ্রবণ করে, রসনা দ্বারা বিবিধ রসাস্বাদ করে, নাসিকা দ্বারা সুরভি ঘ্রাণ গ্রহণ করে, চর্ম্মের দ্বারা শীতোষ্ণাদি সংস্পর্শ করে, এবং হস্ত, পদ, বাক, উপস্থ ও পায়ুর দ্বারা যথাক্রমে গ্রহণ, গমন, বচন, মৈথুন ও মল মুত্র ত্যাগ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত জীবের আর কোন ক্রিয়াও নাই, আর কোন বিষয় ও নাই। তন্মধ্যে পায়ু ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম বা বিষয় অর্থাৎ মলমুত্রাদি বিসর্জ্জন কার্য্যে কাহারও অনুরাগ বা আসক্তি জন্মিতে পারেনা। তদ্ব্যতীত আর নয়টী বিষয়ের উপরেই জীব অনুরক্ত ও আসক্ত হইয়া বিলিপ্ত হয়। এই নয় প্রকার বিষয় ভোগের নিমিত্তই জীব সর্ব্বদা লালায়িত। যত প্রকার ভোগ্যবস্তু আছে তৎসমস্তই এই নয়প্রকার বিষয়ের অন্তর্গত; এই নয় প্রকার বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি করিতে পারিলেই সমস্ত বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হইয়া যায়; এই নয়প্রকার বিষয়ের দ্বারাই আমার অর্চ্চনা করিতে হয়, তাহা হইলে আমার সঙ্গে [illegible]াইয়া বিষয় ভোগ হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হইয়া [illegible]ার প্রতিই অনুরাগ বা ভক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে।

[illegible]লাদাস।—মা? তোর একথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কোন [illegible] দ্বারা তোর কিরূপ পূজা করিতে হয়, তদ্দ্বারা বিষয়াসক্তি বা কিরূপে

যায়, আবার বিষয়ের উপভোগ বা কিরূপে হয়, আবার তোর প্রতি অনুরাগই বা কিরূপে বৃদ্ধি পায়, এবং তদ্দারা আত্মাভিমান নিবৃত্তিই বা কিরূপে হয়, ইত্যাদি কূট রহস্য আমি কিছুমাত্র ভেদ করিতে পারি নাই, তুই একবার ভাল করিয়া বল, তাহা হইলে সেইরূপই চেষ্টা করিয়া দেখিব।

এই কথা বলিতে না বলিতেই অন্য লোকজন আসিয়া পড়িল, জগদম্বা পুত্তলিকার ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। আজ আর ভোলাদাসের উত্তর শুনা হইল না, কেবল প্রশ্নই হইল। ভোলাদাস আগামী কল্য উহার উত্তর পাইবার প্রতীক্ষায় থাকিলেন, এবং জগদম্বার গুণ গান করিতে করিতে জ্ঞানানন্দের বাড়ি হইতে প্রস্থান করিলেন। সন্ধিপূজার কথোপকথন অগত্যা এই খানেই সমাপ্ত হইল।

আচার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"আচারলক্ষণোধর্ম্মঃ সন্তশ্চাচারলক্ষণাঃ।
সাধূনাঞ্চ যথাবৃত্ত মেতদাচার লক্ষণং॥"

ধর্ম্ম অনেক ভাগে বিভক্ত, তাহার মধ্যে আচার এক প্রকার ধর্ম্ম বিশেষ। সাধুআচার দ্বারাই মনুষ্য সাধু বলিয়া পরিচিত হন। অতএব সাধুগণের কার্য্যই অচারপদবাচ্য। শাস্ত্র এইরূপ সাধুগণের লক্ষণ করিয়াছেন যথা—

শিষ্টাঃ খলু বিগতমৎসরা নিরহঙ্কারা... অলোলুপাদম্ভদর্প লোভ মোহ ক্রোধ বিবর্জ্জিতাশ্চ।

যাঁহারা বিগতমৎসর, নিরহঙ্কার, অলোলুপ এবং মোহক্রোধাদি বিবর্জ্জিত, তাঁহারাই সাধু। এই সাধুগণই আমাদিগের প্রতিপাদ্য মহাজন। যদি "মহাজনো যেন গতঃ সপন্থাঃ" এই মহাজন বাক্য অনুসারে চলিত হয়, তবে যথা-সাধ্য ইহাঁদের পথের অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। কোন ধনে মহাজন সাধুপদ-বাচ্য, তাহা পরে বিস্তৃতরূপে বলিব, আদৌ দেখা যাক হিন্দুর সাধু-আচরিত আচারের উদ্দেশ্য কি? হিন্দুর আচারের উদ্দেশ্য পরমার্থ। পরমার্থ সূত্রে আর্য্যের আচার গ্রথিত। ঘুড়ি শূন্যে অলক্ষ্যমার্গে যতদূর উড্ডীন হউক না কেন, যেমন সূত্র পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ আমাদের আচার যত দূরে কেন

লৌকিকতায় পরিদর্শিত হউক, তাহারমূলসূত্র পরমার্থ পরিহার করেনা। পক্ষান্তরে ছিন্নসূত্র ঘুড়ি যেমন অধঃপতিত হয়, সেইরূপ পরমার্থরহিত আচারও পরিণামে অধঃপাতের কারণ হয়।

সাধারণের দুইটা পথ আছে; একটী পরমার্থের দিকে, অপরটী সংসারাভিমুখে। স্ব স্ব প্রকৃতিরঅনুসারে সাধারণে ইহার অন্যতর পথে বিচরণ করে। কঠবল্লীতে আছে—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবচ।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহুবিষয়াং স্তেষু গোচরান।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুমনীষিণঃ।
অসংযতৈরিন্দ্রিয়ৈস্ত সংসারমধিগচ্ছতি।
সংযতৈস্তধ্বনঃ পরং তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদম্॥

আত্মা রথস্বামী, শরীর রথ, বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি) সারথি। মন রশ্মি (লাগাম), ইন্দ্রিয়গণ অশ্বস্বরূপ এবং রূপ, রস গন্ধাদিরূপ বিষয়, রথচালাইবার মার্গ। পণ্ডিতেরা ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত জীবাত্মাকে তাহার ফলভোক্তা বলেন। ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব যদি বাগ নামানে, তাহাহইলে ক্লেশাবহ সংসার দিকে লইয়া যায়, আর যদি ঐ ইন্দ্রিয়াশ্ব সংযত হয়, তাহাহইলে তাহাদ্বারা গন্তব্যস্থান বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হিন্দু, বিষ্ণুর পরমপদের ভিখারী; কিন্তু সেস্থান অতি দুর্গম, অশ্ব স্বেচ্ছায় সে পথে চলিতে চায় না। অশ্ব উত্তমরূপ সুশিক্ষিত করিতে না পারিলে, সেস্থানে যাওয়া দুষ্কর, তাই হিন্দু ইন্দ্রিয় সংযমে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। যে কার্য্যের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযত হয়, তাহাই হিন্দুর শাস্ত্রসংগত অচার। ইন্দ্রিয়ের প্রশ্রয় যাহাতে বর্দ্ধিত না হয়, সেবিষয়ে আমাদের শাস্ত্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সুতরাং, যে আচার বলে, স্বস্বন্ধনির্ভেদে,ব্যাভিচারের অত্যাচার স্বপরনির্ব্বিশেষে প্রবঞ্চনার অবতারণা, বিষকুম্ভপয়োমুখে সাধুতার বক্তৃতা, এক কথায় যে আচারে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সম্পর্কজনিত ও কামজনিত তৃষ্ণা সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্যকে পশুত্বে পরিণত করে, সে আচার ঘৃণিত, অতএব হিন্দুর পরিহার্য্য। যে আচারে দয়াদি প্রভৃতি সদ্বৃত্তি মার্জ্জিত হইয়া দিনদিন পরিবর্দ্ধিত হয় এবং যে আচার পরমার্থের অনুকূল হইয়া সংসারের বিরোধী না হয়,

তাহাই হিন্দুর আচার। তবে আজকালের হিন্দুসন্তানগণ যে আচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, সে আচার ব্যভিচার।

এক্ষণে আমরা যে আচারের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে আচারের লক্ষ্য শারীরিক ও সাংসারিক উন্নতি। মুষলমানের আচার হিন্দুর আচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দুগণ বদ্ধকচ্ছ হইয়া ইষ্টচিন্তা করেন, মুষলমানগণ মুক্তকচ্ছে সে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। হিন্দু ভুক্তাবশিষ্ট শতায় রাখিতেবাধ্য, মুষলমানের তাহাতে অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপ প্রায় প্রত্যেক কার্য্যে হিন্দুর সহিত বিপরীত ভাব। ইহাদের আচারের মূল প্রায় লক্ষিত হয় না। হিন্দু-সন্তান মুষলমানের রাজত্বকালে প্রবল অত্যাচারেও মুষলমানীয় আচারানু-করণে আচারভ্রষ্ট হয় নাই। তাহারা পাশব বল প্রয়োগ করিয়াও আমাদের তত অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই, যত অনিষ্ট ইংরেজ রাজের দ্বারা সাধিত হইতেছে। তাহার কারণ হিন্দু স্বভাবত বুদ্ধিজীবী। আজকাল হিন্দুগণ অবনতির অতিভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে, তথাপি বুদ্ধিখানি হারায় নাই। নিরুদ্দেশ্য আচারের অনুকরণ করাই মূর্খের কার্য্য; তাই বহুশতাব্দি মুসলমানের পদানত থাকিলেও এত অধিক পরিমাণে আচার ভ্রষ্ট ও স্বধর্ম্ম দ্রোহী হয় নাই। তবে মুষলমানগণ বলপূর্ব্বক প্রপীড়ন করিয়া অতি অল্পসংখ্যক হিন্দুসন্তানকে স্বদলভুক্ত করে। ইংরেজের কোনরূপ বল প্রয়োগ নাই—ধর্ম্মে বিন্দুমাত্রও হস্তক্ষেপ নাই; তথাপি কি জানি কেমন একটু আকর্ষণী শক্তি "বোধদয়" হইতে শেষ পাঠ্য পুস্তকের প্রতি পত্রের প্রতি পঙ্‌ক্তির অন্তরে সন্নিহিত রহিয়াছে; হিন্দু সেই আকর্ষণী শক্তি বলেই পৈতৃক আচার হইতে বিপ্রকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজের আচার হাতেহাতে সুখের বাজরা লইয়া বেড়ায়, কাজেই অপরিণামদর্শী হিন্দুসন্তান সেই মরীচিকার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া ছুটিতে থাকে।

রুগ্নশরীরে আহারের অনিয়ম করিলে, যে, রোগ বৃদ্ধি হয়, এ জ্ঞান অনেকের আছে, তথাপি সাধারণেরই আশুসুখকর কুপথ্যে আদৌ রুচি হয়। এই সহজ রুচি মনুষ্যের অপরিণামদর্শিতার ফল মাত্র। এইরূপে মানব পদে-পদে কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে; চিরজীবন রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় ভার-বোধে জীবন বহন করে। রোগ, শোক, তাপ, প্রভৃতি সংসারের যতকিছু

ক্লেশকর আছে, সমস্তই এই সহজ রুচির ফল। সহজ রুচির বলেই পাশ্চাত্য আচার আচরিত হইতেছে।

জলের পক্ষ্যপাত যেমন নিম্নদিকে, মনুষ্যের পক্ষ্যপাতও সেইরূপ নিম্ন দিকে। উর্দ্ধে উঠিতে হইলে জোয়ার চাই। এখানে জোয়ার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি। কর্ত্তব্য বুদ্ধি থাকিলে উর্দ্ধে ও পক্ষপাত হয়। পুত্রের প্রতি পক্ষ পাত স্বভাব সুলভ, প্রায় সকলেরই হয়। কিন্তু কয়জন ব্যক্তির পিতার প্রতি পক্ষপাত হয়? যাহার হয়, তাহার কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে বলিয়া। সেইরূপ কামাদির প্রতি পক্ষপাত স্বভাবসিদ্ধ। দয়াদির সুপ্রবৃত্তির প্রতি পক্ষপাত কর্ত্তব্য জ্ঞান সাপেক্ষ। সুতরাং, যে আচার কামাদির প্রবর্ত্তক, সে আচারের আকর্ষণী শক্তি স্বভাবতই তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। যে আচার সদ্বৃত্তির প্রবর্ত্তক, অসদ্বৃত্তির নিবর্ত্তক, তাহার বিপ্রকর্ষণী শক্তি যে সমধিক বলবতী, সে বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় নাই।

সনাতন আচারের উদ্দেশ্য এবং অধুনাতন আচারের উদ্দেশ্য পূর্ব্বোক্ত বাক্য প্রপঞ্চের দ্বারা কতক পরিমাণে বুঝাগেল। এখন দেখা যাক, লোকে কি চায়? এবং যাহা চায়, তাহা পায় কি না।

রোগী নিরোগ চায়, কিন্তু কুপথ্যের পরবশ হইয়া অস্বাস্থ্য সম্পাদন করে। চোর অর্থ উপার্জ্জন করিতে চায়, বুদ্ধির বিপর্য্যয়ে অর্থ অনর্থে পরিণত হয়। লোকে চায় একবস্তু, কিন্তু বিবেচনার বৈপরীত্যেই, এইরূপ বিপরীত ফল ঘটিয়া থাকে। আজ কাল আমাদের মধ্যে এইরূপ বিপরীত ফল ফলিতেছে। দুঃখের বিষয়, দেখিয়াও জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইতেছে না। সকলেই একমাত্র সুখের ভিখারী। দান, ধ্যান, জপ, তপ, ভদ্রতা, বক্তৃতা, চাকরি, চুরি, উপকার অপকার প্রভৃতি যে যাহা করে, তাহাতে তাহার সুখ লাভ হয় বলিয়াই করিয়া থাকে, কিন্তু সকলের ভাগ্যে সুখ ঘটে না। গোয়ালার দুগ্ধের ন্যায় কতক লোক দেখান সুখের অভিমান হয় মাত্র। লোকে দেখিতেছে একসের করিয়া দুগ্ধ পান করিতেছি। কিন্তু মনের অগোচর পাপ নাই—দুধ খাইতেছি কি জল খাইতেছি মনে২ বুঝিতে পারিতেছি। [দুগ্ধদাতা ঘোষজিও ভাবিতেছেন, বেটারা কি নির্ব্বোধ পয়সা দিয়া জল খাইতেছে। আধুনিক আচারজনিত সুখ গোয়ালার দুধ। আর্য্যগণের আচার জনিত সুখ যেন ঘরের দুধ, তাই খাঁটিমাল।

লোকে যে সুখ চায়, সে সুখ কেবল ইহকালে অর্থাৎ বর্ত্তমানের জন্য। তাই পাশ্চাত্য আচারের সুখ কেবল ইহকালের। প্রাচীন আচরের সুখ পরকালের। প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান করিলে, যে. সাংসারিক সুখ হইতে একবারে বঞ্চিত থাকিতে হইবে, এরূপ যেন কেহ ভাবেন না। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য পারমার্থিকসুখ, সংসারিক সুখ ইহার আনুষঙ্গিক মাত্র। আচার অনুষ্ঠান কালে সাংসারিক সুখ, পরিণামে পারমার্থিক সুখ, জন্মাইয়া দেয়। যেমন সুপথ্য ভোজনের সঙ্গে২ বল সঞ্চয় ও অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভূত হয়, এবং ভবিষ্যতে বিপুল সুখের কারণ হইয়া থাকে। আরকুপথ্য ভোজন তৎকালিক তৃপ্তকর; কিন্তু পরিপাক বড় কষ্টকর।

ইহা দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, দুই পক্ষেই সুখ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সুখগত কিছু ভেদ আছে। একটী সূর্য্য কিরণের ন্যায় চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়, অপরটী শুধাংশুকরের ন্যায় তাপিত প্রাণ শীতল করে; এবং একটী আলো আঁধারে গোচ, অপরটী শুদ্ধ স্ফটিকবৎ নির্ম্মল। সাংসারিক সুখ, দুঃখ অনুস্যূত, সুখে বড় দুঃখের জের টানিতে হয়। জমা খরচ কাটিলে দুঃখের ভাগই অধিক; ধারে ধোরে, যোগে যাগে একরকমে চালাইতে হয়। যেমন আয় তেমনি ব্যয়, হাতে দু কড়াও থাকে না। কেবল জমাখরচ ঠিক করিতে করিতেই হয়রাণ। পারমার্থিক সুখ যেন কুবেরের ভাণ্ডার।—যতই ব্যয় কর "যথাপূর্ব্বং তথাপরং" কিছুই ক্ষয় হয়না।

আর্য্য ঋষিগণ এই সকল কারণে সাংসারিক সুখে বিতৃষ্ণ, এবং পারমার্থিক সুখে সতৃষ্ণছিলেন। সাংসারিক সুখ প্রার্থনা করিতেন, কিন্তু তত আসাক্ত ছিলেন না—হয় ভাল, নাহয়, নাহয় পারমর্থিক সুখ উপার্জ্জনই জীবনের এক মাত্র ব্রত করিতেন; সুতরাং, যে আচার পারমার্থিক সুখের অনুকূল, তাহাই তাঁহাদের আচার, ইহা ব্যতিত অন্য সুখের বা অন্য আচারের প্রার্থী ছিলেন না। এখন সেই আর্য্যচরিত আচার সমস্ত বিসদৃশ এবং ঘোরপক্ষপাত দুষ্ট বলিয়া আমদের ভ্রম জন্মে। আমরা যথাসাধ্য সেই ভ্রমোদ্ঘাটনের চেষ্টা করিব। তৎকালে প্রতীতি হইবে লোকে চায় এক, পায় আর।

পাপ ও পুণ্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

মহাভারতে বনপর্ব্বে এইরূপ লেখা আছে যে, কোন কপোত শ্যেন ভয়ে ভীত ও শরণার্থী হইয়া উশীনর নৃপতির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলে, শ্যেনপক্ষী, রাজার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, হে রাজন! সমুদায় ভূপালগণ আপনারে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অতএব আপনি কি নিমিত্ত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে অভিলাষী হইলেন? আমি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছি; আপনি ধর্ম্ম লাভ লোভে কদাচ চিরবিহিত ভক্ষ্য কপোতকে রক্ষা করিবেন না; তাহা হইলে আপনাকে ক্ষুধার্ত্তের আহার হরণ জন্য পাপে অবশ্যই লিপ্ত হইতে হইবে।

রাজা কহিলেন, হে বিহগরাজ! এই কপোত তোমার ভয়ে ভীত হইয়া জীবনের প্রত্যাশায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছে। অতএব ইহাকে পরিত্যাগ না করাই পরম ধর্ম্ম, তাহা কি তুমি জাননা? এই কপোত প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষার্থ আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাকে পরিত্যাগ করা অতি গর্হিত। ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যা করিলে যেরূপ পাপ হয়, শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগে তদ্রূপ পাপ জন্মে।

শ্যেন কহিলেন, মহারাজ! সমুদায় জীব আহার হইতে উৎপন্ন ও আহার দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হয় এবং আহার করিয়াই জীবিত থাকে। জীবগণ দুস্ত্যজ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়াও চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু ভোজন পরিত্যাগ করিলে কদাচ জীবন রক্ষা হয় না; অতএব আহার বিরহে আমার প্রাণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে প্রস্থান করিবে। আমার মৃত্যু হইলে পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিবার বর্গও বিনষ্ট হইবে। হে মহারাজ! আপনি একটি প্রাণির প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত বহু প্রাণির প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হে সত্যবিক্রম! যে ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তর বিরোধী, তাহা কখন ধর্ম্ম নহে; পরস্পর অবিরোধী ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম, অতএব যাহাতে বাধা নাই, সেই ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে। অথবা উভয় ধর্ম্মের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার লাঘব ও গৌরব বিবেচনা করত যাহাতে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা তাহারই অনুসরণ করিবে।

আবার কর্ণ পর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির গাণ্ডিবের নিন্দা করিয়া মহাবীর অর্জ্জুনকে ভৎসনা করিলে, বীরবর ধনঞ্জয় নিজ প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী গাণ্ডিব নিন্দুক যুধিষ্ঠিরকে নিধনোদ্যত হইলে, মহাত্মা কেশব অর্জ্জুনকে বারম্বার ধিকার প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন; হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তোমারে রোষপরবশ দেখিয়া নিশ্চয় জানিলাম, যে, তুমি যথাকালে জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ কর নাই। তুমি ধর্ম্মভীরু, কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃততত্ব সম্যক অবগত নহ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কখন ঈদৃশ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না। আজি তোমারে এরূপ অকার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া মূর্খ বলিয়া বোধ হইতেছে। যে ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কার্য্যকে কর্ত্তব্য ও কর্ত্তব্য কার্য্যকে অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে, সে নরাধম। বহুদর্শী পণ্ডিতগণ ধর্ম্মানুসারে যে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি তাহা অবগত নহ। অনিশ্চয়জ্ঞ ব্যক্তি কার্য্যাকার্য্য অবধারণ সময়ে তোমার মত নিতান্ত অবশ ও মুগ্ধ হইয়া থাকে, কার্য্যাকার্য্যের যথার্থ্য নির্ণয় করা অনায়াসে সাধ্য নহে। শাস্ত্র দ্বারাই সমস্ত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তুমি যখন মোহ বশতঃ ধর্ম্ম রক্ষার মানসে প্রাণিবধ রূপ মহাপাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার শাস্ত্র জ্ঞান নাই। আমার মতে অহিংসাই পরমধর্ম্ম। বরং, মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে; কিন্তু কখনই প্রাণি হিংসা করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি কিরূপে প্রাকৃত পুরুষের আর পুরুষ প্রধান, ধর্ম্মকোবিদ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ সংহারে উদ্যত হইলে? সজ্জনেরা সমরে অপ্রবৃত্ত, শরণাগত, বিপদগ্রস্থ, প্রমত্ত, রণ পরাঙ্মুখ শত্রুরেও বিনাস করা নিন্দনীয় কহিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত গুরুর প্রাণ সংহারে সমুদ্যত হইয়াছ। পূর্ব্বে তুমি বালকত্ব প্রযুক্ত এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছ এবং এক্ষণে মূর্খতা বশতঃ অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছ। তুমি অতি দুজ্ঞের্য় সুক্ষ্মতর ধর্ম্মপথ অবগত না হইয়া গুরুর বিনাস অভিলাষ করিয়াছ। হে ধনঞ্জয়! কুরু পিতামহ ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিদুর ও যশস্বিনী কুন্তি যে ধর্ম্ম রহস্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপ তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবন কর। সাধু ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই, সত্য তত্ব অতি দুজ্ঞের্য়। সত্য বাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্য স্বরূপ, সত্য মিথ্যা স্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে।

বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণ বিয়োগ ও সর্ব্বস্বাপহরণ কালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না। যে, সত্য ও অসত্যের বিশেষ অর্থ অবগত না হইয়া সত্যানুষ্ঠানে সমুদ্যত হয়, সে নিতান্ত বালক। আর যে ব্যক্তি সত্যও অসত্যের যথার্থ নির্ণয় করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। কৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি অন্ধবধকারী বলাক ব্যাধের ন্যায় দারুণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও বিপুল পুণ্য লাভ করিতে পারেন। আর অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়াও কৌশিকের ন্যায় মহাপাপে নিমগ্ন হয়।

পূর্ব্বকালে বলাক নামে এক সত্যবাদী অসূয়শূন্য ব্যাধ ছিল। সে কেবল বৃদ্ধ পিতা মাতা ও পুত্রকলত্র প্রভৃতি আশ্রিত ব্যক্তিদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত মৃগবিনাশ করিত। একদা ঐ ব্যাধ মৃগয়ায় গমন করিয়া কুত্রাপি মৃগ প্রাপ্ত হইল না। পরিশেষে এক অপূর্ব্ব নেত্রবিহীন শ্বাপদ তাহার নয়ন গোচর হইল। ঐ শ্বাপদ ঘ্রাণ দ্বারা দূরস্থ বস্তুও অবগত হইতে পারিত। ব্যাধ উহারে একাগ্রচিত্তে জলপান করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিল। তখন সেই অন্ধ শ্বাপদ নিহত হইবামাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। অপ্সরাদিগের অতি মনোরম গীত বাদ্য আরম্ভ হইল এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল।

হে অর্জ্জুন! সেই শ্বাপদ তপঃ প্রভাবে বরলাভ করিয়া প্রাণিগণের বিনাশ হেতু হওয়াতে বিধাতা উহারে অন্ধ করিয়া দিলেন। বলাক সেই ভূতগণ নাশক মৃগকে বিনাশ করিয়া অনায়াসে স্বর্গারোহণ করিল। অতএব ধর্ম্মের মর্ম্ম অতি দুর্জ্ঞেয়। আরদেখ কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীগণের সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সত্য বাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি দস্যুভয়ে লোকে ভীত হইয়া বন মধ্যে প্রবেশ করিলে দস্যুরাও ক্রোধ ভরে যত্ন সহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করত সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে ভগবন্! কতকগুলি ব্যক্তি এইদিকে আগমন করিয়াছিল. তাহারা কোন পথে গমন করিয়াছে, যদি আপনি অবগত থাকেন, তাহা হইলে, সত্যকরিয়া বলুন। কৌশিক দস্যুগণ কর্ত্তৃক এইরূপ

জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ লতা ও গুল্ম পরিবেষ্টিত অটবী মধ্যে গমন করিয়াছে। তখন সেই ক্রূরকর্ম্মা দস্যুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্য বাক্য জনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।

হে ধনঞ্জয়! ধর্ম্মনির্ণয়ানভিজ্ঞ অল্পবিদ্য ব্যক্তি জ্ঞান বৃদ্ধদিগের নিকট সন্দেহ ভঞ্জন না করিয়া ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্ব্বোধ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়। অনেকে শ্রুতিরে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না; কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্ম্মতত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই, এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেকস্থলে ধর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম-নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য্য করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, হিংস্রদিগের হিংসা নিবারণার্থেই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ (রক্ষা) করে বলিয়া ধর্ম্মনামে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যাহারা অন্যের সন্তোষ উৎপাদনই, ধর্ম্ম, ইহা স্থির করিয়া অন্যায় সহকারে পরদার হরণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সহিত আলাপ করাও কর্ত্তব্য নহে। যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে কাহার নিকট অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করা উচিত। যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্য স্বরূপ হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিবার মানসে ব্রত অবলম্বন করিয়া তাহা সেই কার্য্যে পরিণত না করে, সে কখনই তাহার ফললাভে সমর্থ হয় না। প্রাণ বিনাশ বিবাহ, সমস্ত জ্ঞাতি নিধন এবং উপহাস এই কএক স্থলে মিথ্যা কহিলেও উহা দোষাবহ হয় না। ধর্ম্মতত্ব-দর্শীরাও উহাতে অধর্ম্ম নির্দ্দেশ করেন না। যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারা চৌর সংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্য স্বরূপ হয়। সমর্থ হইলেও চৌরাদিরে ধন দান করা কদাপি বিধেয় নহে। পাপাত্মাদিগকে ধনদান করিলে

অধর্ম্মাচরণ নিবন্ধনদাতারেও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়। হে অর্জ্জুন! আমি তোমার হিতার্থ শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুসারে আপনার বুদ্ধি ও সাধ্যানুরূপ ধর্ম্মলক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম, ধর্ম্মার্থে মিথ্যা কহিলেও যে অনৃত নিবন্ধন পাপভাগী হইতে হয় না, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে ধর্ম্মরাজ তোমার বধার্হ কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া বল।

মহাভারতের গীতাধ্যায়ে, অর্জ্জুনের অনুরোধ অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুসৈন্য মধ্যে রথস্থাপন করিলে, অর্জ্জুন তাঁহার চতুর্দ্দিকে আত্মীয় স্বজন ও জ্ঞাতিবর্গকে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত করিয়া যুদ্ধদ্বারা জ্ঞাতিবধ পাপে লিপ্ত হইতে হইবে ভাবিয়া বিমর্ষ মনে ভগ্নোদ্যম হৃদয়ে রথোপরি বসিয়া পড়িলে, হৃষীকেশ সহাস্য হাস্যে উভয় সেনার মধ্যবর্ত্তি বিষণ্ণবদন অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমার মুখ হইতে পণ্ডিতগণের ন্যায় বাক্য সকল বিনির্গত হইতেছে; কিন্তু তুমি অশোচ্য বন্ধুগণের নিমিত্ত শোক করিয়া মূর্খতা প্রদর্শন করিতেছ। পণ্ডিতগণ কি জীবিত, কি মৃত, কাহারও নিমিত্ত শোক করেন না। পূর্ব্বে আমি, তুমি ও এই ভূপালগণ আমরা সকলেই বিদ্যমানছিলাম এবং পরেও বর্ত্তমান থাকিব। এই দেহ যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হয়; জীবাত্মা ও তদ্রূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; ধীর ব্যক্তি তদ্বিষয়ে মুগ্ধ হন না। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের যে সম্বন্ধ, তাহাই শীত, উষ্ণ ও সুখদুঃখের কারণ; সেই সম্বন্ধ কখন উৎপন্ন হয়, কখন বিনিষ্ট হয়, অতএব তুমি এই অনিত্য সম্বন্ধ সকল সহ্য কর। এই সম্বন্ধ সকল যাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারে না, সেই সমদুঃখসুখ বীর পুরুষ মোক্ষলাভের যোগ্য। যাহা কখন ছিল না, তাহা কখন হয় না এবং যাহা বিদ্যমান আছে, তাহার ও কখন অভাব হয় না; তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ ভাব এবং অভাবের এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। যিনি এই দেহাদিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন; তাঁহার বিনাশ নাই; কোন ব্যক্তি সেই অব্যয় পুরুষকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, এই সকল শরীর অনিত্য, কিন্তু শরীরী জীবাত্মা নিত্য অবিনাশী ও অপ্রমেয়। অতএব তুমি যুদ্ধ কর। যিনি মনে করেন জীবাত্মা অন্যকে বিনাশ করে এবং যিনি মনে করেন, অন্যে এই জীবাত্মাকে বিনাশ করে তাহারা উভয়ই অনভিজ্ঞ। কেননা জীবাত্মা কাহারও বিনাশ

করেন না এবং জীবাত্মারেও কেহ বিনাশ করিতে পারে না। ইহার জন্ম নাই মৃত্যু নাই। ইনি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হন না, ইনি অজ নিত্য শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলে ইনি বিনষ্ট হন না। যে পুরুষ ইহার অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন, তিনি কি কাহারও বধ করেন, না বধ করিতে আদেশ করেন? যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব দেহান্তর পরিগ্রহ করেন। ইনি শস্ত্রে ছেদিত, অগ্নিতে দগ্ধ জলে ক্লেদিত বা, বায়ুতে শোষিত হন না। ইনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থিরস্বভাব, অচল ও অনাদি। অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। ইনি চক্ষুরাদির অগোচর মনের অবিষয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। অতএব তুমি এই জীবাত্মাকে এবম্প্রকারে অবগত হইয়া অনুশোচনা পরিত্যাগ কর।

যদি জীবাত্মা সর্ব্বদা জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়া থাকেন বলিয়া তাহাকে জাত বা মৃত বোধ কর তাহা হইলে ত ইহার নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্যই নয়। কেননা জাত ব্যক্তির মৃত্যু ও মৃত্য ব্যক্তির জন্ম অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য; অতএব ঈদৃশ বিষয়ে শোকাকুল হওয়া তোমার উচিত নয়। ভূতসকল উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল, ধ্বংশ সময়েও অব্যক্ত হইয়া থাকে, কেবল জন্মমরণের অন্তরাল সময়ে প্রকাশিত হয়; অতএব তদ্বিষয়ে পরিবেদনা কি? কেহ এই জীবাত্মার বিস্ময়ের সহিত দর্শন করেন, কেহ বিস্ময়ের সহিত বর্ণনা করেন, কেহ বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন কেহ শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে পারে না। জীবাত্মা সর্ব্বদা সকলের দেহে অবধ্যরূপে অবস্থান করেন। অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্ত শোক করা উচিত নয়।

তুমি স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর এ প্রকার বিকম্পিত হইবে না ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের আর শ্রেয়স্কর কর্ম্ম নাই; যে সকল ক্ষত্রিয় যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত অনাবৃত স্বর্গদ্বারস্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ লাভ করে, তাহারাই সুখী। যদি তুমি সেই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি হইতে পরিভ্রষ্ট ও পাপভাগী হইবে। লোকে চিরকাল তোমার অকীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবে। সম্ভাবিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি, মরণ অপেক্ষা অধিকতর দুঃসহ। যে সকল মহারথ তোমার বহুমান করিয়া থাকেন, তাহাদিগের নিকট তোমার গৌরব থাকিবে না, তাঁহারা মনে করিবেন, তুমি ভয় প্রযুক্ত সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হই-

রাছ। তাঁহারা তোমারে কত অবক্তব্য কথা কহিবেন এবং তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবেন, ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আর কি আছে? সমরে বিনষ্ট হইলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে, জয়লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে, অতএব যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর; সুখ, দুঃখ, লাভালাভ ও জয় পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে পাপভোগী হইবে না।

আমরা গতবারের প্রবন্ধে ইহাই সাধ্যমত বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এই অমূল্য সত্য কেবল হিন্দু শাস্ত্রবেত্তারা বুঝিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দু শাস্ত্রের এত মাহাত্ম্য। যতদিন মনুষ্য সমাজ জগতে জীবিত থাকিবে তত দিন এই মহা সত্য আবিষ্কারক মহর্ষিদিগের অলৌকিক চিন্তাশীলতার বিষয় অবগত হইয়া মনুষ্যলোক স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাদের গুণগান করিবে। সমস্ত হিন্দু শাস্ত্রেরই এই মত। সমস্ত হিন্দু শাস্ত্র একবাক্যে বলিয়া থাকেন, যে পাপ পুন্য এ দুইটী আপেক্ষিক কথা মাত্র।

সাধু-দর্শন।

মহাত্মা ভাস্করানন্দ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। এইরূপ ভাবেই অর্দ্ধ দণ্ডকাল অতিবাহিত হইল। স্বামীজী এই সময়টুকু একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে সানুগ্রহে আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই স্তোত্রটি পাঠ করিতে বলিলেন।

"ন মাতা পিতা বা ন দেবা ন লোকাঃ
ন বেদা ন যজ্ঞা ন তীর্থং ব্রুবন্তি।
সুষুপ্তৌ নিরস্তাতিশূন্যাত্মকত্বাৎ,
তদেকোবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্"
ন সাংখ্যং ন শৈবং ন তৎ পাঞ্চরাত্রং
ন জৈনং ন মীমাংসকাদের্ম্মতম্বা।

বিশিষ্টানুভূত্যা বিশুদ্ধাত্মকত্বা,
স্তদেকোবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্।।" ঐ
ন শুক্লং ন কৃষ্ণং ন রক্তং ন পিতং,
ন কুব্জং ন পীনং ন হ্রস্বং ন দীর্ঘং।
ন রূপং তথা জ্যোতিরাকারকত্বাৎ,
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্।।" ঐ
ন শাস্তা ন শাস্ত্রং ন শিষ্যো ন শিক্ষা,
নচ ত্বং ন চাহং ন চায়ং প্রপঞ্চঃ।
স্বরূপাববোধো বিকল্পাসহিষ্ণু,
স্তদেকোবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলঽহম্।।"

স্বামীজীর অনুমতি অনুসারে সাগ্রহে স্তোত্রটি পাঠ করিলাম। যতক্ষণ স্তোত্রটি পাঠ করিলাম, ততক্ষণ কোন কিছুই বলিলেন না, যাই আমার স্তোত্রটি পাঠ সমাপ্ত হইল, অমনি বলিলেন "তোঁমরা দিক্ষা হুয়া? আমি উত্তর করিলাম! 'এখন পর্য্যন্তও হয় নাই।

স্বামী। (বিস্ময়ের সহিত) আবিতক্ দীক্ষীত্ নাহি হুয়া, ইয়ে কেয়েসা? ঋ্যায়সেহি কি বাঙ্গালাকা চাল্?

আমি। বাঙ্গলার এরূপ অবস্থা পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার দোষে, কাল বিপর্য্যয়ে বাঙ্গালাই সর্ব্বপ্রথমে অবনতির চরমের দিকে ধাবিত হইতেছে।

স্বামী। (আগ্রহের সহিত) ভালা, কহোতো, বর্ত্তমান সময়মে বাঙ্গলা দেশকো ক্যায়সি অবস্থা হুয়া? দেখো, বাঙ্গলাকা যো কোই হামারা পাস আতা হ্যায়, ওই যোগ, সমাধি, মুক্তি প্রভৃতি বড়ে বড়ে উচ্চমার্গকা বিষয় বার্ত্তালাপ করনে মাঙ্গতা। আউর হাম্ সব্ শুন্ কর্কে ভি সাংসারিক ব্যবহারকা উপদেশ দিয়া করতা হ্যায়। ইসি লিয়ে হামসে নারাজ্ হোকর্ চলে যাতে হ্যায়, ফির্ কোই কোইভি পরম আনন্দিত হো কর্ হামারা যশঃ আউর খ্যাতিকা বাখ্যান করতা হ্যায়; ইয়ে সব্ দেখ্ কর্ হামারা যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ উপস্থিত

হোতা হ্যায়। ইয়ে লোগোঁকো আত্মাকা কুছভি অস্তিত্ব বোধ নাহি, একদম্ পশু-বন্ গিয়া। কিয়া আপ্‌সোস্।

আমি। সাধন বিহীন এবং অনুষ্ঠান বিহীন মানব স্বভাবত দুর্ব্বল ও লক্ষ্যশূন্য হইয়া থাকে এবং সচরাচর সময়ের স্রোতে আপনাকে অনায়াসে ভাসাইয়া দেয়। সুতরাং, সমাজেরও অবস্থা সময়ের বলে পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত হইয়া পড়ে। সেই জন্য ঋষিরা এবং সাধুরা সময়ের বিকৃত গতিরোধ করিয়া সমাজকে ধর্ম্ম-পথে রাখিবার জন্য, সমাজের বন্ধন সুদৃঢ় করিতে এবং মানবের মনকে সর্ব্বদা সাত্ত্বিক ভাবে গঠিত রাখিতে, শাস্ত্রে নানাভাবে প্রচুর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুর্নিবার্য্য প্রবল সময় স্রোতে নিপতিত সমাজ, শাস্ত্রের সে সমস্ত মঙ্গলপ্রদ উপদেশ লক্ষ্য না করিয়া অবলিলাক্রমে ধ্বংশেরদিকে আপনাদের ছাড়িয়াদিয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশের অবস্থা এতই শোচনীয় যে শতাব্দির অধিক বঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব থাকিবে কি না বলিয়া সন্দেহ হয়!

বেশী দিন অতিত হয় নাই, শতাব্দির পূর্ব্বে বাঙ্গলী কেন, সমগ্র হিন্দু মধ্যে বহির্জগতে, বলিষ্ট দির্ঘজীবী, স্বাধীনচেতা, কার্য্যক্ষম ছিলেন, এবং অধিকাংশই অন্তরজগতে অনেক স্থলে উন্নতির চরমে উঠিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। এখনও দুই দশজন আপনাদের ন্যায় অন্তর্জগতের মহারথী বিদ্যমান রহিয়াছেন। কিন্তু আর বুঝি থাকে না। সংসার দিন দিনই অধঃপতনের শেষ সীমায় ধাবিত হইতেছে। মুষলমানের প্রবল নির্য্যাতনেও বাঙ্গালী অনেক পরিমাণে আত্ম রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু কি জানি ইংরাজের শিক্ষায়, ইংরাজের ব্যবহারের কি মোহিনী শক্তি যে এই অল্পকাল মধ্যেই বাঙ্গলাকে চিরধ্বংশের পথে লইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছে। আপনারা যদি বাঙ্গালার অবস্থা একবার অবলোকন করেন তাহা হইলে বাঙ্গালীকে একটা জাতি মধ্যে গণ্য করিতে ঘৃণা বোধ করিবেন; হয়ত তাহাদের বাঙ্গালী বলে চিনিয়াই উঠিতে পারিবেন না। একই জাতি, অথচ পরস্পর বেশ ভূষায়, হাব ভাবে, এবং প্রকৃতিগত এত পৃথক।

বর্ত্তমান বাঙ্গালী হিন্দু, হিন্দু, যবন ও ম্লেচ্ছ এই ত্রিবিধ জাতির যৌগিক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। যবনের আধিপত্যে যাবনিক ভাবের বহুল বিস্তারে

বহুদিনের জীর্ণ ও জরাগ্রস্থ হিন্দু সমাজের হিন্দুচিত আচার অনুষ্ঠান, যাবনিক আচার অনুষ্ঠানের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া একরূপ অপরূপ অবস্থা অর্থাৎ যবন-হিন্দু অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং বিশুদ্ধ হিন্দুভাব একেবারেই লোপ পাইয়া যায়। আবার ম্লেচ্ছের সংস্পর্শে ম্লেচ্ছোচিত রীতিনীতি, অনুষ্ঠান পদ্ধতি, আচার ব্যবহার সংমিলিত হইয়া, যবন-হিন্দু ম্লেচ্ছাচার সম্বৃত যবন-হিন্দুত্বে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং বিশুদ্ধ হিন্দুর অবস্থা হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালা দেশেই এই অদ্ভুত বিমিশ্রণ কাণ্ড অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দু এখন কেবল নামে মাত্র হিন্দু, কিন্তু আচারগত, অনুষ্ঠানগত, প্রকৃতগত স্থূলকথা সকল বিষয়েই ম্লেচ্ছ-যবনাচার বিশিষ্ট হিন্দুজাতিতে পরিণত। এইত বাঙ্গালার অবস্থা। কিন্তু, সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তাহা জানি না, আমেরিকাবাসী আল-কাট নামে জনৈক সাহেব কিছুদিন হইল ভারতবর্ষে আসিয়া এক তুমুল ধর্ম্মের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া হিন্দুকে জাতিয় গৌরবে উত্তেজিত করিতেছেন। আর্য্যঋষিদিগের অদ্ভুত অমানুষি ক্রিয়া কলাপের বিষয় বিজ্ঞান সিদ্ধ এবং যোগ বলের পরাকাষ্ঠা বলিয়া, সর্ব্বসমক্ষে ঋষিদের অসীম গুণানুকীর্ত্তন ও জয় ঘোষণা করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ের বিপথগামী আর্য্য সন্তানদিগকে শত সহস্র ধিক্কার দিয়া, নিজ মর্য্যাদা, নিজ গৌরব এবং পিতৃপুরুষদিগের পথ স্মরণ করিয়া পুনরায় আর্য্য আচরিত পথে বিচরণ করিয়া মানব জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে পরামর্শ দিতেছেন। একজন বিদেশী ম্লেচ্ছের মুখে আপনাদের পিতৃপুরুষদিগের গৌরব বার্ত্তা এবং অমানুষি ক্ষমতা এবং তাঁহাদের বিশুদ্ধ সভ্যতার বিষয় শ্রবণ করিয়া অনেকের মন ফিরিয়াছে, শাস্ত্রের উপদেশ লাভ করিতে চিত্ত কতক পরিমাণে ব্যাকুল হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কি হয়, তাঁহাদের মনের সঙ্গে সঙ্গেইত এই এত দিনের কুআচরণের সংস্কার রাশিত নষ্ট হয় নাই, মনের সে তামসিক আবরণ অপহৃত হয় নাই। শাস্ত্র সম্বন্ধে চিত্ত কেবল অন্ধকারে ঘুরিতেছে। কিন্তু ম্লেচ্ছশিক্ষার একমাত্র উপার্জ্জিত সম্পত্তি যে আত্মাভিমান সে টুকু হারায় নাই। সেই আত্মাভিমানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া শাস্ত্রের অতি গূঢ় রহস্যও বুঝিতে প্রয়াস পায়; অথচ সে সমস্ত বুঝিবার সম্বল টুকু হারাইয়া বসিয়া আছে। তাই বুঝুক আর নাই বুঝুক বড় ২ বিষয়ের

আলোচনায় ব্যতিব্যস্ত। ইহাতে আত্মাভিমানটা দিন ২ বাড়িতেছে মাত্র। কিন্তু কে কাহার কথা শুনিবে।

সোমনাথ।

ভারতের ইতিহাসে সোমনাথ চিরপ্রসিদ্ধ। ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর নিকট সোমনাথ চির পবিত্র। ভারতের প্রধান প্রধান রাজগণ সোমনাথের পূজা দিয়া অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতেন। গুজরাটের পশ্চিম প্রান্তে পর্ব্বতের উপরিভাগে সোমনাথের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্মুখে বিশাল অনন্ত সমুদ্র সর্ব্বদা বিশাল ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ভৈরভ রবে পর্ব্বতের পাদদেশ বিধৌত করিতেছে। আরাধ্য দেব সোমনাথের অধিষ্ঠিত পর্ব্বত মনোহর বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ। উপরে অনন্ত নীল আকাশ, নীচে অনন্ত নীল সমুদ্র, মধ্যভাগে পাদপ পরিবৃত সুনীল পর্ব্বতে দেবাদিদেব সোমনাথের পবিত্র মন্দির। হিন্দুর আরাধ্য দেবতা এইরূপ রমণীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

সোমনাথের মন্দির বৃহৎ ছিল না। মন্দিরের পরিধি ৩৩৬ ফীট, দৈর্ঘ্য ১১৭ ও বিস্তার ৭৪ ফীট মাত্র। ইউরোপ খণ্ডের মন্দিরের তুলনায় ভারতের এই দেব মন্দিরটি অবশ্য ক্ষুদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। হিন্দু উপাসকগণ জনতাপ্রিয় ছিলেন না, লোকারণ্যের মধ্যে তাঁহারা শান্ত ভাবে শান্তিময় আরাধ্য দেবতার উপাসনা করিতে ভাল বাসিতেন না। নীরবে, নির্জ্জনে একাগ্রচিত্তে রমনীয় দেবের ধ্যান করাই তাঁহারা পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং, তাঁহাদের উপাস্য দেবের মন্দির তদনুরূপ ভাবেই গঠিত হইত। এই জন্যই বোধ হয়, পবিত্র দেব সোমনাথের মন্দিরটি ক্ষুদ্রাকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মন্দির টি কঙ্কর প্রস্তরে নির্ম্মিত ও চারিখণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ডে বিবিধ কারু কার্য্যে খচিত এক একটি সুন্দর মণ্ডপ ছিল! মণ্ডপ গুলির ভগ্নাবশেষ এখনও পরধর্ম্ম বিদ্বেষী মুসলমানের প্রগাঢ় ধর্ম্মান্ধতার পরিচয় দিতেছে। মন্দিরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তি খোদিত থাকাতে উহা বিভিন্ন নামে পরিচিত হইত। এক অংশে কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ প্রকাণ্ড হস্তীর মস্তক ছিল। উহার নাম গজগৃহ। অপর অংশে

বিচিত্র বেশে সজ্জিত বিভিন্নভাবে স্থাপিত কতকগুলি অশ্ব ছিল। উহার নাম অশ্বশালা। অন্য অংশে মণ্ডলীবদ্ধ সুরসুন্দরীগণের নৃত্যাভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। উহার নাম রাস মণ্ডপ। খোদিত মূর্ত্তিগুলি সুগঠিত ও বৃহদাকার। কিন্তু ধর্ম্মান্ধ মুসলমানের অত্যাচারে সকল গুলিই শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। রাসমণ্ডপের সুরসুন্দরীগণের ভগ্ন হস্ত পদ ও মস্তক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিয়া জ্ঞানশূন্য মুসলমান আক্রমণ কারীদের ভীষণ লৌহ দণ্ডের ভীষণতার পরিচয় দিতেছে।

মধ্যভাগের মণ্ডপটি ভগ্ন হয় নাই। ঐ মণ্ডপের গুম্বজ আটটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। অনেকে অনুমান করেন, মুসলমানেরা হিন্দুদের উপকরণ লইয়া ঐ অংশ নির্ম্মাণ করিয়াছে। বস্তুতঃ ঐ অংশে মুসলমান্ কৃত শিল্প কার্য্যের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়াযায়। মন্দিরের যে অংশে সোমনাথের পবিত্র লিঙ্গ মূর্ত্তী ছিল, তাহা এখন ভগ্ন দশায় পতিত হইয়াছে। সে বিচিত্র কারুকার্য্য এখন কিছুই নাই, কেবল ভগ্ন প্রস্তর স্তূপ পরিবর্ত্তন শীল কালের অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে। মন্দিরের একস্থলে একটি অন্ধকারময় ক্ষুদ্রগৃহ আছে। গৃহটি ২৩ ফীটদীর্ঘ ও ২০ ফীট প্রশস্ত। পুরোহিতগণের নির্জ্জন ধ্যান ধ্যারনার জন্যই বোধ হয়, উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

একটি বৃহৎ চতুষ্কোন উচ্চ খণ্ডে সোমনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। উহার চারিদিক অত্যুচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। পবিত্র মন্দিরে বহুসংখ্য প্রস্তরময়ী দেবমূর্ত্তি বিভিন্ন ভাবে স্থাপিত ছিল। এখন উহা মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কথিত আছে, জুম্মা মজিদের জন্য মুসলমানেরা এইস্থান হইতে পাঁচটি লইয়া গিয়াছিল। সুলতান মহমুদ পবিত্র সোমনাথ মন্দির কিরূপে ধ্বংস করেন, তাহা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই।

সেদুঃখকাহিনী স্মরণ হইলে হৃদয় সিহরীয় উঠে। এখন সোম-নাথের মন্দির ভগ্ন দশায় পতিত রহিয়াছে। আর্য্যভূমির সৌভাগ্যের সময়ে উহার যে শোভাছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। পুণ্যশীলা অহল্যাবাইয়ের যত্নে এই স্থানে একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সোম নাথের উপাসকদিগের সন্তানগণ এখন এই দেবালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সে বিলুপ্ত গৌরব আর ফিরিয়া আইসে নাই।

গজনির সুলতান মহামুদ দ্বাদশবার ভারতবর্ষ আসিয়া শোমনাথের মন্দির অক্রামণ করেন। হিন্দুগণ আপনাদের পবিত্র দেবতার গৌরব রক্ষার জন্য অকাতরে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পাঁচ মাসপর্য্যন্ত মন্দিরের, পবিত্রতা রক্ষা করেন। পাঁচ মাস পর্য্যন্ত মুসলমানেরা হিন্দুদের পরাক্রমে নিরস্ত থাকে। শেষ চতুর সুলতান মহমুদ আপনার সৈন্যদল ফিরাইয়া পাঁচ ক্রোশ দূরে যাইয়া শিবির স্থাপন করেন। হিন্দুরা দেখিলেন দুরন্ত মুসলমান আপনার সৈন্য লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন; তাহাদের পবিত্র মন্দিরের পবিত্রতা অক্ষত রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহায়া প্রফুল্ল চিত্তে আমোদ করিতে লাগিলেন। সুলতান মহমুদ এই সুযোগে জাফর ও মজফ্‌ফর নামক দুই ভ্রাতার অধীনে দুই দল সাহসি সৈন্য মন্দির আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। মুসলমান ভ্রাতৃদ্বয় অলক্ষিত ভাবে দ্বারদেশে আসিয়া পহুঁছিল। বৃহৎকায় হস্তীর পরাক্রমে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। ইহার মধ্যে সুলতান মহমূদও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া বিপুল বিক্রমে হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিলেন। অসময়ে অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইলেও রাজপুত বীরগণ মুহূর্ত্তমধ্যে অস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শোনিত তরঙ্গিণী অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইল। ক্ষত্রিয়গণ আরাধ্য দেবতার জন্য অকাতরে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। অবশেষে শত শত বীরপুরুষ অসি হস্তে লইয়া মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু তাহাদের এই শেষ উদ্যমও সফল হইল না। ভয়াবহ শোনিত তরঙ্গিণীর মধ্যে আর্য্যবীরপুরুষগণের দেহরক্তের সহিত চির পবিত্র আর্য্যকির্ত্তির চিহ্ন বিনষ্ট হইয়া গেল।

কথিত আছে সোমনাথের মূর্ত্তি দশ হস্ত পরিমিত ছিল। সুলতান মহমুদ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, অনুচর দিগকে দণ্ডাঘাতে ঐ বিগ্রহ ভগ্ন করিতে আদেশ করিলেন। উপাসক ব্রাহ্মণেরা এই আজ্ঞায় ভীত হইয়া বিগ্রহ রক্ষার জন্য সুলতানকে বহুমূল্য অর্থ দিতে চাহিলেন। সুলতানের সহচরগণের অনেকে অর্থ গ্রহণ করিতেই পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু মহমূদ এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। তিনি বড় বিগ্রহ বিদেষী ছিলেন। হিন্দুদিগের বিগ্রহ বিনষ্ট করিলে পুণ্যলাভ হয়, তাঁহার এইরূপ সংস্কার ছিল। এজন্য তিনি অর্থের বিনিময়ে বিগ্রহ বিনাশে ক্ষান্ত থাকিলেন না। অবিলম্বে পবিত্র বিগ্রহকে দ্বিধা ভগ্ন করা হইল। বিগ্রহ ভগ্ন হইলে দেখা গেল, তন্মধ্যে নানা জাতীয় মনি মুক্তা ও রত্নাদি রহিয়াছে। অর্থলোভী মহমুদ এইরূপে আশাতিরিক্ত অর্থলাভ করিয়া মন্দিরের অন্যান্য মূর্ত্তিও ভগ্ন করিতে আদেশ দিলেন। ঐ সকল ভগ্ন মূর্ত্তির মধ্যে ও অনেক অর্থ পাওয়া গেল। দুরন্ত সুলতান এইরূপে সোমনাথের বিগ্রহ ভগ্ন করিয়া, ভগ্নখণ্ড মক্কা মদিনা, গজনি প্রভৃতি স্থানে পাঠাইলেন।

ধর্ম্ম-দ্বেষী মুসলমানের আক্রমণে সোমনাথ বিগ্রহ অন্তর্হিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিগ্রহের অধিষ্ঠান জন্য মন্দিরের পবিত্রতা আজ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় নাই। সোমনাথের পবিত্র নাম আজপর্য্যন্ত প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়ে পবিত্র ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছে, আজ পর্য্যন্ত সোমনাথের মন্দির হিন্দুর একটি তীর্থস্থান হইয়া রহিয়াছে।

একটী প্রস্তাব।

হিন্দু সমাজের শুভদিন, যে, বর্ত্তমান সময়ে অনেক কৃত-বিদ্য মহাত্মা সমাজের প্রকৃত কল্যাণেচ্ছু হইয়া নানা ভাবে সদনুষ্ঠানের পরিচেষ্টা করিতেছেন। দেশ বিদেশে, নগরে পল্লিতে ধর্ম্মালোচনার জন্য বহুবিধ হরিসভা ধর্ম্মসভা প্রভৃতি সংস্থাপিত হইতেছে। সুবক্তা পণ্ডিত মণ্ডলী আত্ম স্বার্থবিস্মৃত হইয়া বহু আয়াশ স্বীকার পূর্ব্বক দূর দূরান্তরে গমন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। এই সমস্ত দেখিয়া হৃদয়ে বড়ই আনন্দ হয়। আশা হয় যে, কালে বুঝি এই বহু শতাব্দি হইতে অধঃপতিত হিন্দু সমাজ পুনরায় নিজ পৈতৃক বীর্য্যবলে জাগরিত হইবে। আবার বুঝি "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত বরান্নিবোধত" এই উপনিষদ বাক্যের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। কিন্তু যখন দেশের শিক্ষা, রাজার উদ্দেশ্য, সময়ের স্রোতের বিষয় চিন্তা করি তখন সমস্ত আশাভরসা কোথায় চলিয়া যায়। এই ম্লেচ্ছাচারের, কুশিক্ষার এবং স্বার্থপূর্ণ শাসনের অধীনে হিন্দু সমাজের কল্যানাশা বিড়ম্বনা মাত্র।

এই ঘোর বিপদ সময়ে কি উপায়ে হিন্দু সমাজকে এই অধঃপতন হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে, ইহা লইয়া অনেক সমাজনীতিজ্ঞগণ বহুদিন হইতে চিন্তা করিয়া আসিতেছে। এবং এই উদ্দেশ্যে কিছু দিন হইতে কলিকাতায় একটী আর্য্যসমিতি নামে সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতির কার্য্য যদিও আপাতত অতি অল্প সংখ্যক সভ্য দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু উপস্থিত সভ্যেরা যেরূপ উদ্যমশীল ও উৎসাহী তাহাতে কালে ইহা যে, সমাজের অতীব হিতকরী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণের অবগতির জন্য সমিতির নিয়ম সম্বন্ধে কতকটা স্থূল বিবরণ এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

বিলুপ্ত প্রায় আর্য্যধর্ম্মের পুনরুন্নতি সাধন, ও মুমূর্ষু প্রায় আর্য্য জাতির পুনর্ব্বল সঞ্চারের উপায় উদ্ভাবন ও সেই সেই উপায়কে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই এই আর্য্য সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। ইহা কেবল কার্য্য-ক্ষেত্র মাত্র। ইহাতে কোনরূপ বক্তৃতা, উপদেশ, ব্যাখ্যা কি অন্য কিছুই হইবে না। কেবল কি উপায়ে সমাজকে পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খলায় আনয়ন

করা যাইতে পারে সেই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইবে। এবং যে যে উপায় দ্বারা হিন্দু সমাজের মঙ্গল হইতে পারে সেই সেই উপায়কে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিধিমত প্রকারে চেষ্টা করা হইবে। বঙ্গদেশে যতগুলি হরিসভা ধর্ম্মসভা আছে সে সমস্তগুলি যাহাতে একযোগে নির্ব্বিবাদে কার্য্য করিতে সক্ষম হন তাহার জন্য আর্য্য সমিতি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবেন। আর্য্যসমিতির সংক্ষিপ্ত নিয়ম

১। হিন্দুবংশজ ও হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী হইলেই আর্য্যসমিতির সভ্য হইতে পারা যাইবে।

২। সভ্যগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন। প্রথম শ্রেণী "নির্দ্দিষ্ট সভ্য" ও দ্বিতীয় শ্রেণী "সাধারণ সভ্য" এই দুই নামে অভিহিত হইবেন।

৩। যাঁহারা আনুষ্ঠানিক হিন্দু এবং হিন্দুশাস্ত্রে পূর্ণ আস্থাবান্ তাঁহারাই প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ "নির্দ্দিষ্ট সভ্য" মধ্যে গৃহীত হইবেন। তদ্ব্যতিত সকলেই "সাধারণ সভ্য" শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইবেন। "নির্দ্দিষ্ট সভ্য" দিগকে সভার কার্য্য সম্বন্ধে সর্ব্বদা উপদেশাদি দিতে হইবে এবং তাহাদেরই উপদেশ লইয়া সমিতির কার্য্য চলিবে।

৪। যাঁহারা "নির্দ্দিষ্ট সভ্য" হইবেন, তাঁহাদিগকে সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইবার সময় ৫৲ টাকা দিয়া সভ্য হইতে হইবে এবং তৎপর প্রতি মাসে ১৲ টাকা করিয়া, সভার কার্য্য নির্ব্বাহের ব্যয়ের জন্য, চাঁদা দিতে হইবে। কিন্তু "নির্দ্দিষ্ট সভ্যেরা" সর্ব্বদা সভার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া এই টাকা সম্বন্ধে তাঁহাদের উপর কোনরূপ বাঁধাবাঁধিভাব থাকিবে না। যাঁহার ক্ষমতায় কুলাইবে তিনি দিবেন, যাঁহার না কুলাইবে তিনি দিবেন না।

৫। "সাধারণ সভ্য" দিগকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার সময়, এককালীন ২৲ টাকা দিয়া সভ্য হইতে হইবে এবং প্রতি মাসে।• চারি আনা করিয়া চাঁদা স্বরূপে প্রদান করিতে হইবে। যিনি এ নিয়ম পালন না করিবেন তিনি কদাপি "সাধারণ সভ্য" শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন না।

৬। আর্য্যসমিতির কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ অধিবেশন হইবে না। কার্য্যানুযায়ী আবশ্যক বোধে অধিবেশনাদি হইবে। এবং পাঁচজন সভ্য উপস্থিত হইলেই সমিতির কার্য্য চলিবে।

৭। আর্য্যসমিতি হইতে কাগজ, পুস্তক, পুস্তিকা ইত্যাদি যাহা কিছু প্রকাশিত হইবে সকল সভ্যই সে সমস্ত বিনা মূল্যে নিয়মমত পাইতে থাকিবেন।

৮। সকল সভ্যকেই সমিতি সংক্রান্ত সকল কথাই গোপনে রাখিতে হইবে। সমিতির কার্য্য অতি সঙ্গোপনে চলিবে, তবে আবশ্যকমত প্রকাশিত হইবে।

এই সমস্ত উদ্দেশ্য লইয়া আর্য্যসমিতি দুই চারিজন মাত্র মহাত্মাদের সাহর্য্যে প্রায় চারি মাস কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তবে যতক্ষণ সমিতি কোন রূপ একটা সমাজের বিশেষ হিতকর কার্য্য করিতে সক্ষম না হইবেন ততদিন সমিতির কার্য্য কলাপের বিষয় সাধারণে কিছুই প্রকাশিত হইবে না।

আপাততঃ সমিতি নিম্নলিখিত তিনটি উপায় যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তজ্জন্য চেষ্টিত হইবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু, এরূপ ক্ষুদ্র সমিতির দ্বারা এতবড় গুরুতর কার্য্যাদি কদাপি সংসাধিত হওয়া সম্ভব নহে। তবে, সমিতি নিজ ক্ষুদ্র চেষ্টায় যতটুকু সম্ভব তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। বঙ্গে অনেক প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মানুরাগী ধনকুবের আছেন, তাঁহারা যদি নিজ নিজ গ্রামের এবং প্রজাবর্গের উন্নতি ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ কামনায় এই সমস্ত সদনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান হন, তবে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে। যদি কোন স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা ইহা পাঠ করিয়া স্বেচ্ছাও স্বাধীন ভাবে ইহার মধ্যে কোন একটি উপায় কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নশীল হন, এই আশায়, তাঁহারই অবগতির জন্য অদ্য এই স্থলে সেউপায় কএকটী প্রকাশিত হইল।

১ম। আর্য্যভাষার পুনঃ প্রচারার্থ ভারতবর্ষের নানা স্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপিত হউক। এই সমস্ত চতুষ্পাঠীতে প্রধান প্রধান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা বিবিধ আর্য্য শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদত্ত হউক। চতুষ্পাঠীর দুইটী বিভাগ থাকিবে। প্রথম বিভাগ, যে সমস্ত ছাত্র রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য ও অধ্যয়নব্রত অবলম্বন করিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহাদের জন্য। এই সমস্ত ছাত্রদিগকে রীতিমত শাস্ত্রোক্ত প্রথা অনুসারে স্ব স্ব ব্রহ্মচর্য্য ও অধ্যয়নব্রত পালন করিতে হইবে। স্থানীয় কোন সমিতি ইহাদের সর্ব্ব প্রকার ব্যয়ভার বহন করিবেন। চতুষ্পাঠীর দ্বিতীয় বিভাগ, শাস্ত্রানুরাগী ও শ্রমশীল ছাত্রদিগের জন্য। ছাত্রগণ নির্দ্দিষ্ট সময়মত আসিয়া অধ্যয়ন করিয়া যাইবেন এবং সাধ্যমত আর্য্য আচার ব্যবহার পালন করিবেন। স্থানীয় সমিতির আর্থিক অবস্থানুসারে ইহাদিগকে ন্যূনাধিক অর্থ সাহায্য করা ব্যবস্থা থাকিবে।

২য়। ইংরাজ রাজত্বে ইংরাজী বিদ্যা না শিখিলে চলে না, অথচ ইংরাজী বিদ্যার কেমনই মোহিনী শক্তি, ইংরাজী শিখিলেই আচার, ব্যবহার, চিন্তার গতি, সমস্তই ইংরাজী হইয়া যায়। যাহাতে ইংরাজী শিখিয়াও প্রকৃতি ইংরাজী না হয়, এই জন্য প্রসিদ্ধ২ হিন্দু সমিতির নিজের তত্ত্বাবধানে ভারত-বর্ষের নানা স্থানে আদর্শ ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করা হউক। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দিষ্ট সাহিত্য, গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য শাস্ত্রের স্থূল স্থূল বিষয় সকল শিক্ষা দেওয়া হউক! এই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে বাছিয়া

বাছিয়া হিন্দুধর্ম্মানুরাগী দেখিয়া নিযুক্ত করা হইবে। যাহাতে সর্ব্বতোভাবে বালকগণের মধ্যে আর্য্য ভাব অনুসৃত হয় তাঁহারা সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করিবেন। এই ছাত্রাবাসে আহার ও ব্যবহার ঠিক প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রানুসারে রক্ষিত হইবে। নিষ্ঠাবান হিন্দু কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে ইহা চালিত হইবে। যাহাতে ছাত্রগণ স্বল্পব্যয়ে স্বচ্ছন্দে ও নিরুদ্বেগে থাকিতে পায়, এমন বন্দোবস্ত হইবে। ছাত্রগণের চরিত্র ও রীতিনীতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিবে। ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও তজ্জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত থাকিবেন।

৩য়। পুস্তক প্রচারের দুইটী বিভাগ থাকিবে। প্রথম বিভাগ হইতে উপযুক্ত ও প্রসিদ্ধ ২ পণ্ডিতগণ দ্বারা আর্য্য শাস্ত্র সমূহের প্রকৃষ্ট অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রচার হইবে। দ্বিতীয় বিভাগ হইতে উপযুক্ত ইংরাজী ও সংস্কৃত বিদ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা দেশীয় ভাবে বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক সমূহ প্রস্তুত ও যাহাতে সেই সমস্ত পুস্তক দেশীয় বিদ্যালয় সমূহে প্রবর্ত্তিত হয় এরূপ চেষ্টা হইবে। আপাততঃ বিদ্যালয় সমূহে যে সমস্ত পুস্তক পঠিত হয় তৎসমস্তই ইংরাজী পুস্তকের নকল মাত্র। আদর্শ, উদাহরণ, তর্কপ্রণালী সমস্তই ইংরাজী। যাহাতে দেশীয় আদর্শ, দেশীয় উদাহরণ, দেশীয় তর্কপ্রণালী প্রথম হইতেই বালকগণ দেখিতে ও শিখিতে পায় এই বিভাগ হইতে সেই সমস্ত উপায় অবলম্বিত হইবে।

তিনটীই অতি গুরুতর ব্যাপার। একজনের কিম্বা একটী ক্ষুদ্রসমিতির কদাচ সাধ্য নহে যে একক এই গুরুতর ব্যাপার সহজেই সংসাধিত করিতে পারেন। ইহার প্রত্যেকটিই বহুব্যয় ও বহুপরিশ্রম সাপেক্ষ। আমরা বঙ্গের প্রত্যেক হরিসভা ও ধর্ম্মসভার সম্পাদক ও পরিচালক মহোদয়গণের মনযোগ আকর্ষণ জন্য সাগ্রহে আহ্বান করিতেছি; যদি সকলে একত্র হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া যায় তাহা হইলে ইহার মধ্যে অন্ন্যন কোন একটাও সংসাধিত হইতে পারিবে। কিন্তু সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। সমিতি সর্ব্বপ্রথমে যাহাতে বঙ্গদেশের নানা স্থলে চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত হয় তজ্জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিবেন। আপাততঃ অত্র কলিকাতা সহরে একটি উক্তরূপ চতুষ্পাঠী স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। সৌভাগ্যক্রমে, সমিতি, মহারাজা সৌরেন্দ্র মোহন ঠাকুরের ন্যায় ধনাঢ্য ও স্বদেশবৎসল এবং ডাক্তার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের ন্যায় হৃদয়বান, স্বধর্ম্মানুরাগী ও স্বদেশহিতেব্রত মহাত্মাদের পূর্ণ উৎসাহ পাইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের অনেক কৃতবিদ্য মহোদয়গণও আনন্দে এই মহদনুষ্ঠানে যোগ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এখন সর্ব্ববিঘ্ন বিনাসন ভগবান হরির কৃপায় সমিতির আশা ফলবতী হইলেই সমিতির সংগঠন সার্থক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

২য় ভাগ। ১২৯৪ সাল। ২য় খণ্ড।

হিন্দুর প্রাত্যহিক কর্ম্ম।

৪॥০ হইতে ৬টা পর্য্যন্ত।

১। প্রতিদিন রাত্রি প্রায় ৪॥০ টার সময় নিদ্রা হইতে জাগরিত হইতে হইবে। জাগরিত হইয়াই নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিতে হইবে।

ব্রহ্মা মুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী
ভানুঃ শশী ভূমিস্থতো বুধশ্চ
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতবঃ
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম স্থপ্রভাতং।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, নবগ্রহ, রাহু, কেতু, ইহাদের নাম গ্রহণ করা মনুষ্যের প্রথম কর্ত্তব্য। দেবতার নাম স্মরণান্তর গুরুর নাম স্মরণ করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিবে।

নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেব স্বরূপিণে!
যস্ত বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসার সংজ্ঞকং॥

"অর্থাৎ যাহার বাক্যামৃত পান করিলে, সাংসারিক জ্বালা যন্ত্রণা তিরোহিত হয় সেই গুরুকে আমি প্রণাম করি। গুরু ও ইষ্টদেব এ উভয়ে কোন প্রভেদ নাই। উপাসকের নিকট এ উভয়েরই মাহাত্ম্য একরূপ।"

দেববন্দন ও গুরুবন্দন সমাপন করিয়া একবার নিজের মাহাত্ম্য স্মরণ করিবে। ভাবিবে

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্য মুক্তস্বভাববান্।"

"অর্থাৎ আমি দেবতা, আমি ব্রহ্ম, আমি সচ্চিদানন্দ, আমি নিত্যমুক্ত, আমি অখণ্ড আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ, আমি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহি।" যে উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে যদি নিজ বংশের গৌরব ও মহিমা অহরহঃ স্মরণ করে, তবে তাহার নীচ বা নিন্দিত কার্য্যে মতি হয় না। সেই রূপ যদি আমরা আমাদের গৌরব ও মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ রাখি, যদি আমরা মনে রাখি যে আমাদের হৃদয় সিংহাসনেও সেই নিষ্কল নিরবদ্য পরম পুরুষ বিরাজ করিতেছেন, তাহা হইলে আর আমাদের পাপে বা অধর্ম্মে মতি হইবে না। এই জন্যই আমাদের নিজ গৌরবের কথা এক একবার স্মরণ করা কর্ত্তব্য। আত্ম গৌরব এইরূপ স্মরণ করিয়া ভগবানের নিকট আত্ম নিবেদন বা আত্ম সমর্পণ করিতে হইবে। বলিতে হইবে।

"লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব
"প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে।
জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্ম নচমে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

"অর্থাৎ হে প্রভো তুমিই সব, আমি কিছুই নহি, আমার জ্ঞান আছে কিন্তু শক্তি নাই! শুদ্ধ শক্তি নাই তাহা নহে, কুপথেই আমার মন সর্ব্বদা ধাবিত হয়। এক্ষণে তুমি যদি আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হও, তবেই আমি ধর্ম্ম পথে চলিতে পারি। হে প্রভো, আমি তোমার আজ্ঞায়, তোমারই উদ্দেশ্য সাধনার্থ এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করি। আমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, তবে আমি আর যেন বৃথা মায়া বশতঃ আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান না করি, এবং যেন তোমার দাসের ন্যায় দম্ভ মোহ বিসর্জ্জন করিয়া সংসার ধর্ম্মে বিচরণ করিতে পারি। আমি কর্ত্তা বলিয়া আমার যে অভিমান আছে সেই অভিমানই অনর্থ ও সর্ব্বনাশের মূল। হে লোকেশ, হে চৈতন্যময় আমাকে প্রকৃত কথা বুঝিতে দাও। আমার চক্ষুর আবরণ উন্মুক্ত কর।"

২। এই রূপে দেব, গুরু, প্রভৃতির বন্দন করিয়া এবং নিজের গৌরব ও মহিমা স্মরণ করিয়া ও ঈশ্বরের নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়া একবার সমস্ত দিনের করণীয় কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিবে। প্রথমে ধর্ম্ম অর্থাৎ নিজের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধক বিষয় সমস্ত চিন্তা করিবে। পরে ধর্ম্ম পথে থাকিয়া কিরূপে অর্থোপার্জ্জন করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিবে। পরে ধর্ম্ম ও অর্থ বজায় রাখিয়া কিরূপে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সম্পাদন করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিবে।

"প্রবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্মং অর্থঞ্চাস্যাবিরোধিনং।
অপীড়য়া তয়োঃ কাম্যং উভয়োরপি চিন্তয়েৎ।"

৩। ধর্ম্ম অর্থ কাম বিষয়ক চিন্তা সমাপন করিয়া শয্যা হইতে গাত্রো-ত্থান করিবে এবং "প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" এই বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার করতঃ গৃহ হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইবে। এই সময়ে কর্কোটক নাগ, দময়ন্তী নল, ঋতপর্ণ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি পুণ্যশ্লোকগণের নামোচ্চারণ করিবে। কারণ সাধুদিগের নামোচ্চারণ করিলে অসাধুও সাধু হয়।

"কর্কোটস্য চ নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনং॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ।
যোঽস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানব।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যান্নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ॥"

৪। এইরূপে পুণ্যশ্লোকদিগের ও বীরবরের নামকীর্ত্তনের পর বিমূত্র ত্যাগ, শৌচ, আচমন (মুখ প্রক্ষালন) ও দন্তধাবন। আচমনান্তে দন্তধাবন বিধেয়। দন্তধাবন পক্ষে নিম্ন লিখিত কয়েকটী বৃক্ষ প্রশস্ত—যথা খদির, কদম্ব, করঞ্জ, বট, তিন্তিড়ী, বেণুপৃষ্ঠ (?), আম্র, নিম্ব, অপামার্গ, বিল্ব, অর্ক (আকন্দ), উড়ুম্বর। প্রতিপদ, অমাবস্যা ষষ্ঠী নবমী অথবা চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা এই কয় তিথিতে দন্ত ধাবন করিবে না। শুদ্ধ মৃত্তিকা ও দ্বাদশ গণ্ডূষ জলের দ্বারা মুখশুদ্ধি সংসাধন করিবে। গুবাক, তাল, হিন্তাল (?), তাড়ী, তাল, কেতকী, খর্জ্জুর নারিকেল, এই সমস্ত দ্বারা দন্তধাবন নিষিদ্ধ। দন্তধাবনের উপযুক্ত কাষ্ঠ না পাইলে অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিবে। দন্ত ধাবন পক্ষে অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ ভিন্ন অন্য অঙ্গুলির ব্যবহার করিবে না। তৃণ, অঙ্গার, কপাল [অস্থি], প্রস্তর, লোহ, বালুকা,

অথবা চর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা দন্তধাবন করিবে না। যাহারা সূর্য্যোদয়ে স্নান কালে দন্তধাবন করে, পিতৃগণ ও দেবগণ তাহাদের হস্তে তর্পণাদি গ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণ পক্ষে দন্তধাবন মন্ত্র যথা,—

"ওঁ অন্নাদ্যায় ব্যূহধ্বং সোমোরাজায় মাশমৎ।
সমেস্থং প্রমৃষ্যাত যসসা চভাগন চ ॥"

৫। দন্ত ধাবনান্তে স্নান। স্নানের কাল সম্বন্ধে বিষ্ণু সংহিতা বলেন— "প্রাতঃস্নায়ী অরুণ-কিরণ-গ্রস্তাং প্রাচীং অবলোক্য স্নায়াৎ" অর্থাৎ অরুণ কিরণোদ্ভাসিত পূর্ব্বদিক দর্শন করিতে করিতে স্নান করিবে। পীড়িত অথবা অন্য কোন কারণে অশক্ত হইলে অশিরস্ক স্নান করিবে। তাহাতেও অশক্ত হইলে আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবে। "আতুরাণান্ত শিরো-বিহায় গাত্রপ্রক্ষালনং তদশক্তৌ সর্ব্বগাত্র মার্জ্জনং অর্দ্রেণ বাসসা কুর্য্যাৎ"।

৬। স্নানকালে ও স্নানান্তে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবে। স্নানকালে নানা বিধ মন্ত্র আছে। হিন্দুর প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রারম্ভে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা করিতে হয়। ইহাই শাস্ত্রীয় বিধি। ৪॥০ হইতে ৬টা পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে।

৬টা হইতে ৭॥০টা পর্য্যন্ত।

১ম। হোম। যাঁহারা সাগ্নিক তাঁহাদের পক্ষে এই বিধি।
২য়। কেশপ্রসাধন।
৩য়। মঙ্গলকর বস্তুর দর্শন। মঙ্গলকর বস্তু আটটি যথা, ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, স্বর্ণ, ঘৃত, সূর্য্য, জল রাজা। "সদ্বৃত্ত সন্নিকর্ষোহি ক্ষণার্দ্ধমপি শস্যতে", সাধুর সহিত ক্ষণার্দ্ধকাল অবস্থানও অতীব শ্রেয়স্কর।
৪র্থ। গুরু, সন্ন্যাসী, যতী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ আলাপ ইত্যাদি।

৭॥০ হইতে ৯টা পর্য্যন্ত।

বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতি প্রভৃতির অধ্যয়ন, অভ্যাস ও অধ্যাপনা।

দানেন তপসা যজ্ঞৈরুপবাসৈর্ব্রতৈস্তথা।
ন তাং গতি মবাপ্নুয়াৎ বিদ্যয়া যামবাপ্নুয়াৎ ॥

অর্থাৎ

"দান, তপস্যা, যজ্ঞ, উপবাস প্রভৃতি দ্বারা যে উপকার না হয়, অধ্যয়ন (শাস্ত্রাধ্যয়ন) দ্বারা সেই উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৯টা হইতে ১০॥০।

পোষ্য বর্গের ভরণ-পোষণ জন্ত অর্থ সংগ্রহ। মাতা, পিতা, গুরু, ভার্য্যা, প্রজা, দীন, আশ্রিত, অতিথি, অভ্যাগত ও অগ্নি ইহাদিগকে পোষ্য বলে। যে পোষ্যবর্গের ভরণ করে তাহার স্বর্গ হয়। যে ব্যক্তি পোষ্য-বর্গের পীড়ন করে তাহার নরকপ্রাপ্তি হয়।

"ভরণং পোষ্যবর্গস্থ প্রশস্তং স্বর্গসাধনং।
নরকং পীড়নে তস্থ তস্মাদ্‌যত্নেন তান্‌ ভরেৎ।"

নারদ বলেন

"ধনমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাযত্ন তস্থার্জ্জনে মতঃ।
রক্ষণং বর্দ্ধনং ভোগ ইতি তত্র বিধিঃক্রমাৎ।"

"ধন ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মই সম্পন্ন হয় না। অতএব ধনোপার্জ্জনে যত্ন করা উচিত। অগ্রে ধনের রক্ষণ, পরে তাহার বর্দ্ধন ও সর্ব্বশেষে তাহার ভোগ করা উচিত।" তন্মধ্যে ব্রাহ্মণদের অধ্যাপন, জীবিকো-পায়ের মধ্যেও গণ্য অর্থাৎ অধ্যাপনার দ্বারাও জীবনোপায়ের অধিকাংশ কার্য্য সংসাধিত হয়; কারণ, অধ্যাপনের উপযুক্ত দক্ষিণা এবং শুশ্রূষা গ্রহণ করাও শাস্ত্র নিহিত। কিন্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির অধ্যাপন নিষেধ, সুতরাং তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ অধ্যয়নান্তর ৩। ৪ ঘণ্টা সাংসারিক কার্য্যই করিবেন।

১০॥০ হইতে ১২টা।

১। মধ্যাহ্ন স্নান।
২। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা ও তর্পণ।
৩। দেবপূজা।

---

১২ টা হইতে ১॥০।

১। যক্ষ রক্ষ, মনুষ্য জীব জন্তু প্রভৃতির উদ্দেশে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বলি দান।
২। অতিথি ভোজন।
৩। নিত্যশ্রাদ্ধ।
৪। গোগ্রাসদান।
৫। ভোজন।

১॥০ হইতে ৪॥০টা পর্য্যন্ত।

ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতির আলোচনা।

৪॥০ হইতে ৭॥০ টা পর্য্যন্ত।

১। লোক যাত্রা অর্থাৎ সাংসারিক ক্রিয়া কর্ম্ম।

২। সায়ংসন্ধ্যা।

৭॥০টা হইতে ১০॥০ টা পর্য্যন্ত।

দিনের বেলায় যে সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য অনিষ্পাদিত ছিল, তৎসমস্ত সম্পাদন। ১০॥০ টার পর ভোজন ও তৎপরে নিদ্রা।

এই সমস্ত কার্য্যাবলীর তালিকা প্রস্তুত করিলে দেখা যায় যে প্রত্যহ হিন্দুর ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রায় ॥৵০ আনা সময় যায়, সাংসারিক কার্য্যে ।৵০ আনা সময় যায় ও ভোজনে ৵০ সময় যায়। বাস্তবিক হিন্দু শাস্ত্রে এইরূপ উপাই পরিকল্পিত আছে যদ্দারায় উত্থান অবধি শয়ন পর্য্যন্ত কি জীবিকোপায় কি অন্য বিষয়ে, যে কোন কার্য্যই করুক না কেন, তৎসমস্তই ধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। হিন্দুর ধর্ম্ম কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই সম্ভবে না। হিন্দু সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্ম কার্য্য।

আপাততঃ মনে হইতে পারে, যে, যে ॥৵০ সময় ধর্ম্মে ব্যয় করে, তাহার পক্ষে ধনবান অথবা বলবান হওয়া অসম্ভব; তাহার দারিদ্র্য দুঃখ অনিবার্য্য। কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই রূপে জীবন যাপন করিয়াও অনেকেই বহু সম্পত্তির অধিকারী হইতেন এবং শত শত আশ্রিত অভ্যাগতকে প্রতিপালন করিতেন। বলুন দেখি, বর্ত্তমান সময়ে দুই চারি জন ব্যতীত কে ঐ রূপ সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিয়াছেন? আমাদের মধ্যে ৸৵০ আনা লোকের "অদ্যান্নং মে ধনুর্গুণং।" আমাদের মধ্যে কর্ত্তার জীবিত কালে গৃহিণীর সন্দেশের দানা গলায় বাধে। কিন্তু কর্ত্তার পরলোক প্রাপ্তি হইলেই গিন্নী পথের ভিখারিণী অপেক্ষাও হীনাবস্থায় পতিত হন। কেন না কর্ত্তা প্রায়ই বহু ঋণে আবদ্ধ থাকেন। অথচ আমরা বিষয়ের কীট। দয়া, ধর্ম্ম, লোক লজ্জা, সমাজ ভয়, প্রভৃতি এমন কি চক্ষু লজ্জা পর্য্যন্ত সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া, সকল প্রকার ন্যূনতা, হীনতা, অমর্য্যাদা স্বীকার করিয়া অহরহঃ কেবল টাকা টাকা করিতেছি। তথাপি আমাদের এরূপ হইবার

কারণ বোধ হয় এই, যে যাহারা ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্, তাহারা অনায়াসেই অর্থোপার্জ্জনে ও অর্থ সংরক্ষণে সক্ষম হয়। কিন্তু যাহারা শুদ্ধ অর্থপিশাচ, তাহারা ত ধর্ম্মহীন হয়ই, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অর্থহীনও হইয়া থাকে। অধার্ম্মিক ধর্ম্মার্থ উভয় বিবর্জ্জিত হইয়া "ইতো নষ্ট স্ততোভ্রষ্ট" হয়।

এক্ষণকার শিক্ষিত যুবকেরা বলেন যে পূর্ব্বে লোকে সুখে সচ্ছন্দে থাকিত তাহার কারণ এই যে তৎকালে "জীবিত সংগ্রাম" এত বিভীষণ ছিল না। ইহার উত্তরে আমি বলি অধার্ম্মিকের পক্ষে জীবিত সংগ্রাম চিরকালই এইরূপ প্রবল হইয়া থাকে। হংসও পক্ষী শকুনিও পক্ষী। হংসের মধ্যে কেহ কখন জীবিত সংগ্রাম দেখিয়াছেন ? আর শকুনিতে শকুনিতে অহরহই জীবিত-সংগ্রাম। "পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে সমলোভী-জীবে।" কপোতও পক্ষী, বায়সও পক্ষী। ইহাদের মধ্যে কপোতই বা সর্ব্বদা সানন্দ মনে ব্যোম ব্যোম বলিয়া বিচরণ করে কেন ? আর বায়সই বা জগৎ সংসার কে প্রতারিত করিয়াও হা হা রবে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করে কেন ? শিক্ষিত যুবকগণ ! বলুন ত একজন ভদ্রলোককে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, তাহার জামাতা হইতে হইবে, ইহা "জীবিত সংগ্রামের" কোন পরিচ্ছেদের অন্তর্ভূত ? শুনিতে পাই এক্ষণকার যুবক যুবতীর মধ্যে দাম্পত্য প্রণয় অতিশয় জাজ্বল্যমান। জানিনা, এক্ষণকার প্রিয়ারা তাঁহাদের দয়িত দিগকে কিরূপে সম্ভাষন করেন। তাঁহারা কি বলেন—"হে প্রিয়, হে বল্লভ, হে স্বামিন্ ! তুমি আমার পিতার সর্ব্বান্তক। অতএব হে কৃতান্তোপম, আইস নয়ন-জলে তোমার শ্রীচরণ অভিষিক্ত করি।" যে পত্নী পিতার সর্ব্বনাশক পতিকে প্রেম করিতে পারে, তাহার প্রেম, প্রেম নহে, কাম, সুতরাং তাহা সাধুজনের নিন্দনীয় ও অপবিত্র। আরও দেখুন, ঐ যে রামচন্দ্র বাবু ত্রিশ টাকা বেতনের সরকার। উঁহার বাড়ীতে ৩ জন পাচক ব্রাহ্মণ কেন ? উঁহার এত দাসদাসী কেন ? উঁহার গায়ে সোণার গহণা কেন? সন্তানকে স্তন্য দান করিতেও উঁহার স্ত্রীর ক্লেশ হয় কেন ? হে শিক্ষিত যুবক !, বলুন ত ডারুইনের পুস্তকের কোন পরিচ্ছেদে এইরূপ জীবিত-সংগ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ? আমাদের মূর্খতা, আমাদের কাপুরুষতা, আমাদের বিলাসিতা, আমাদের অধার্ম্মিকতা, আমাদের সর্ব্ব প্রকার অনর্থের মুল। আমরা অধঃপাতে যাই ক্ষতি নাই। কিন্তু আমাদের পূজ্য, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও যে আমাদের দৃষ্টান্তে বিলাসিতার

জঘন্য পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছেন, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয়। অহো কি দুর্দ্দৈব! যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্ত্রী পূর্ব্বে শুভ্র বসন পরিহিতা হইয়া লৌহ, শঙ্খ, কড় প্রভৃতি সামান্য আভরণে ভূষিতা হইয়া, অরুন্ধতি অথবা সতী সাবিত্রীর ন্যায় শোভমানা ছিলেন, যাঁহাকে দেখিলে দেবী বলিয়া ভ্রম হইত, আজি তিনিই স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া রঙ্গিণীর বেশ ধারণ করিতে লজ্জা বোধ করেন না। এখনও যদি আমরা বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে পারি, এখনও যদি আমরা অর্থদাস না হইয়া ধর্ম্মদাস হই, তাহা হইলে সহস্র জীবিত সংগ্রাম ও সহস্র ডারুইন সত্বেও আমাদের গৃহে পূর্ব্ব লক্ষ্মী বিরাজিত হইতে পারেন। নতুবা ঐ বায়সের ন্যায় "ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট" হইয়া অহরহঃ আমাদিগকে কেবল হাহা করিতে হইবে।

নবমী পূজা।

জগদম্বা ও ভোলা পাগলার কথোপকথন।

অদ্য মহানবমী পূজা, মহোৎসবের শেষ দিন। আজ পূজা সমাপনও দক্ষিণান্ত হইবে। পৃথিবীর সৌভাগ্যে এবার অষ্টমী তিথি যাট্ হইয়াছিল, তাই জগদম্বা এবার চারি দিন পর্য্যন্ত ভক্তের ঘরে বিরাজ করিয়া পৃথিবীর শোক, তাপ, মোহ, অপনোদন করিলেন। আগামী কল্য সমস্তই ফুরাইবে, পৃথিবী অন্ধকারময়ী করিয়া জগদম্বা অন্তর্হিতা হইবেন। সকলেই অতিরিক্ত আগ্রহ সহকারে জগদম্বাকে দেখিতেছেন, কাল হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত মাকে দেখিতে পাইবেন না এজন্য বোধ হয় যেন সকলে আজ একদিনের মধ্যেই এক বৎসরের জগদম্বা দর্শন সংগ্রহ করিয়া নয়ন মধ্যে পুরিয়া রাখিতেছে। আজ জগদম্বার দর্শক বৃন্দের নয়ন পানে তাকাইলেই বোধ হয় যেন, চক্ষুর পরলে পরলে একটির পর আর একটি করিয়া, জগদম্বার এক একটি ভাব আর এক একটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাজাইয়া রাখিতেছে। কিন্তু তথাপি প্রাণ ভরে না প্রাণের পরিতৃপ্তি হয় না। যত অভিনিবিষ্ট হইয়া দেখে ততই পিপাসার বৃদ্ধি, আজকার দিনটি যেন শীঘ্র শীঘ্র ফুরাইতেছে, ঘটিকা দশ পলে পরিসমাপ্ত এবং প্রহর ঘটিকায় পর্য্যবসিত হইতেছে। আজ ভোলাদাসের প্রাণ আরও ব্যাকুল! ভোলাদাস এক

এক বাড়ীতে মাকে দেখিতে গিয়া সমস্ত ভুলিয়া যাইতেছেন, দিন কোন্ পথে অতিবাহিত হইতেছে তাহা জানেন না, আহার, নিদ্রা পিপাসাদি সমস্তই বিস্মৃত। ভোলার মন মায়ের ভাবে উন্মত্ত, নয়নদ্বয় জগদম্বার অনুপম রূপেই নিমগ্ন, ভোলা যে দিকে তাকান সেই দিকেই মাকে দেখেন, ভোলার নয়ন মা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, মুখেও মায়ের কথা। মায়ের গুণ গান ব্যতীত আর কিছুই ভোলার মুখে শুনিতে পাইবে না, ভোলা এরূপ অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন। কিন্তু মায়ের সহিত তাঁহার কথোপকথন কেবল জ্ঞানানন্দের বাড়ীতেই হয়। অন্য সকল বাড়ীতেই অতিশয় ধুম ধামের পূজা, সর্বদাই লোক জনের কলরব ও ভীড় থাকে, কিন্তু জ্ঞানানন্দের সাত্ত্বিকী পূজা, তাহাতে বাহ্য আগড়ম্ বাগড়ম্ বড় কিছু নাই, সুতরাং অনেকটা নির্জ্জন; জগদম্বার পূর্ণ প্রভাও জ্ঞানানন্দের বাড়ীতেই পরিলক্ষিত হয়; এজন্য জ্ঞানানন্দের বাড়ীই ভোলারই কথোপকথনের স্থান। আজ বেলা তিনটার সময়ে ভোলাদাস জ্ঞানানন্দের বাড়ীতে উপস্থিত। এদিকে অন্যান্য ব্রাহ্মণ ভোজন ও দুঃখী দরিদ্রাদির ভোজন মিটিয়া গিয়াছে; জ্ঞানানন্দ ভোলা দাসেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন; ভোলাদাসই তাঁহার মহাযজ্ঞের মুখ্যতম ব্রাহ্মণ; ভোলাদাস প্রসাদ গ্রহণ না করিলে জ্ঞানানন্দ আহার করেন না। ভোলাদাস এত বেলায় আসিয়া জগদম্বাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হওয়া মাত্রেই, জ্ঞানানন্দ হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক ভোলাদাসকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। অনন্তর পরমানন্দের সহিত উভয়েই জগদম্বার প্রসাদামৃত গ্রহণ করিলেন। অনন্তর জ্ঞানানন্দ পূর্ব্ব দিবস অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন বলিয়া কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত শয়ন করিলেন, অন্যান্য সকলেও সেই কারণেই শয়িত, সুতরাং এখন কিছু কালের নিমিত্ত মণ্ডপ ঘর নির্জ্জন। যদিও অন্যান্য লোক জন জগদম্বার দর্শনে অজস্রই গতায়াত করিতেছে সত্য; কিন্তু তাহারা বাহির হইতেই মাকে দেখিয়া চলিয়া যায়, সুতরাং মণ্ডপে কোন গোলযোগই নাই। তখন ভোলাদাস মায়ের নিকট উপবিষ্ট হইয়া গত দিনের অর্দ্ধালোচিত বিষয়টি উপস্থিত করিলেন।

ভোলাদাস। মাগো! কালকার সেই কথাটি জানিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত উৎকণ্ঠতা রহিয়াছে; পরিপূর্ণ বিষয়ানুরাগ, পরিপূর্ণ সুখতৃষ্ণা থাকিলেও, জীব কিরূপে আপন মমতা আপন বর্ত্তৃত্ব বিস্মৃত হইবে,

কিরূপে তোর সংসারের কার্য্য বলিয়া সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সকল দায় এড়াইবে এবং তোর নিকটে থাকিবে, সেই অদ্ভুত রহস্য না জানিতে পারিলে আমার শান্তি হইতেছে না, মা! আজ সেই বিষয়টি বলিতে হইবে।

জগদম্বা। বৎস! এ কথা অতি রমণীয় বটে; কিন্তু তুমি একাগ্রমনা হইয়া শ্রবণ করিও, নচেৎ ইহার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিবে না।

সংসারের সকল প্রকার ভোগ্য বস্তুর দ্বারা আমার সেবা করিলেই, জীবের বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি হইতে পারে, এবং সেই বিষয় গুলিও নয় প্রকার ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বলিয়া নয় ভাগেই বিভক্ত, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি (৯—১০ পৃ)। এখন তাহার বিশেষ বিবরণ শুন।

এখন তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, সংসারের প্রত্যেক লোকেই আপনাপন পুত্র কলত্রাদিকে আত্ম-সম স্নেহ করিয়া থাকে এবং আপনি যাহা ভাল বাসে সেই সকল ভোগ্য বস্তুর দ্বারাই স্ত্রী পুত্রাদির পরিচর্য্যা করে। অনেক স্থলে যদি দ্রব্যাদির ত্রুটি থাকে, তবে স্বয়ং ভোগ না করিয়াও নিজের প্রিয় বস্তুর দ্বারা স্ত্রীপুত্রাদির সেবা করিয়া থাকে, তাহা করে কেন; তদ্দ্বারা তাহাদের নিজের কি ফল সাধিত হয়?

ভোলাদাস।—মা! এ কথা জিজ্ঞাসিলি কেন? ইহাতো সকলেই জানে! স্ত্রী পুত্রাদিকে আপন ইচ্ছামত নানা প্রকার বিষয় ভোগ করাইতে পারিলে, নিজেরই বিশেষ পরিতৃপ্তি বোধ হয়—নিজের সুখ বোধ হয়,—নিজেই যেন ভোগ করিতেছি এইরূপ মনে হইয়া থাকে। এজন্যই সকলে তাহাদিগকে নানাপ্রকার প্রিয় দ্রব্য ভোগ করাইয়া থাকে। স্ত্রীটি বা পুত্রটিকে যদি নানা প্রকার বেশভূষায় সজ্জিত করা যায় তবেই নিজের বেশভূষা করার সমান ফল হইয়া থাকে, ঐ বেশভূষা যেন আমি নিজেই করিয়াছি এইরূপ মনে হইয়া পরম সুখের অনুভূতি হয়। আপনার প্রিয় নানাপ্রকার আহার্য্য দ্রব্য, স্ত্রী পুত্রাদিকে যদি আহার করান যায় তবে মনে হয় যেন আমি নিজেই ঐ সকল দ্রব্য আহার করিলাম; সুতরাং নিজের আহার করার ন্যায়ই তৃপ্তি সুখের অনুভব হয়। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েও হইয়া থাকে।

জগদম্বা।—স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারে বিষয় ভোগ করিলে, নিজের পরিতৃপ্তি ও সুখ হয় কেন?

ভোলাদাস। তাহা আমি বলিতে পারি না, ওরূপ হয় কেন তাহা, মা, তুইই জানিস, তুইই তাহা বুঝাইয়াদে।

জগদম্বা।—স্ত্রী পুত্রাদির উপরে আত্মাভিমানই ইহার একমাত্র কারণ; লোকে স্ত্রী ও পুত্রাদিকে আপনার আত্মা হইতে বড় পৃথক্ ভাবে দেখে না; তাই স্ত্রী পুত্রাদিকে প্রিয় বিষয়ের ভোগ করাইতে পারিলেই নিজের ভোগ হইল বলিয়া মনে করে এবং নিজের ভোগের ন্যায়ই তৃপ্তি সুখের অনুভব করে। আবার যখন এই নিয়মের ব্যভিচার ঘটে যখন স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি আত্মাভিমান থাকে না, তখন আর এরূপও হয় না। এখন কারণ বুঝিতে পারিলে?

ভোলাদাস।—হ্যাঁ মা, বুঝিলাম; এখন অন্য কথা বল।

জগদম্বা।—আমার প্রতি যাহার ঐকান্তিক অনুরক্তি থাকে, যে আমাকে অকল্পিত-মাতৃভাবে অবলোকন করে, তাহারও আত্মার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়, সুতরাং তাহার নিজের প্রিয়তম ভোগ্য দ্রব্য সমূহ আমাকে ভোগ করাইয়াই, নিজের ভোগ সুখের অনুভব করিতে পারে। বস্ত্র, ভূষণ, ও গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা আমাকে অলঙ্কৃতা করিয়া নিজেই বস্ত্র ভূষণাদির ব্যবহার জনিত সুখের অনুভব করে। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি নানাবিধ দ্রব্য আমাকে সমর্পণ করিয়া নিজেই ভোজন সুখের সুখী হইতে পারে। তদ্ব্যতীত, ক্ষণিক মাতা, পিতা, বা পুত্র কলত্রাদির পরিপুষ্টি এবং বিষয় ভোগের দ্বারা, নিজের সেই অধ্যারোপিত ভোগ সুখ ভিন্ন, আত্মগত ভোগ-সুখ কিছু মাত্রই নাই; কিন্তু আমার অর্চ্চনায় তাহা নহে; প্রকৃত শ্রদ্ধা বা অনু-রাগ সহকারে আমায় অর্চ্চনা করিলে, সেই অধ্যারোপিত সুখও হয়, আবার নিজের ভোগেরও বঞ্চনা হইতে পারে না; এবং স্ত্রী পুত্রাদির ভোগ জনিত অধ্যারোপিত সুখও হইতে পারে। কারণ এমন অনেক উপহার আছে যাহা আমার সঙ্গে সঙ্গে দাতার নিজেরও ভোগ হইয়া ভোগানুরাগ চরিতার্থ হয়, এবং স্ত্রী পুত্রাদি পরিজনবর্গও তাহা ভোগ করিতে পারে। নানা প্রকারে সুসজ্জিত স্বর্ণ রজতাদি খচিত, নানাবর্ণে চিত্র বিচিত্রিত মণ্ডপালয়ে আমাকে সংস্থাপিতা করিয়া, স্ত্রী পুত্রাদির সহিত ভক্তও আমার নিকটেই সর্ব্বদা থাকে, অতএব আমাকে উত্তম গৃহে বাস করাইয়া যে অনুপম তৃপ্তি সুখ তাহাও ভক্তে ঘটে; আবার নিজেও স্ত্রী পুত্রাদির সহিত সেই গৃহ বাসের বসতি সুখ উপভোগ করে। নানা প্রকার সুগন্ধি গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা আমার

বেশ ভূষাদি করাইয়া অধ্যারোপিত তৃপ্তি সুখেরও অনুভব করে, আবার নিজের এবং স্ত্রী পুত্রাদির দ্বারাও যে ঐ সকল দ্রব্যের ঘ্রাণাদি গৃহীত হয় না তাহাও নহে। আমাকে নানাবিধ আহার্য্য দ্রব্য নিবেদন করিয়া অধ্যারোপিত তৃপ্তি সুখেরও অনুভব করে; আবার আমার প্রসাদ গ্রহণের দ্বারা স্ত্রী পুত্রাদির সহিত নিজ রসনাও চরিতার্থ হয়। এইরূপ প্রায় প্রত্যেক উপহারেই দ্বিবিধ বা ত্রিগুণিত ভোগ সুখের উপভোগ করিয়া বিষয় ভোগের অনুরাগ সফল করিতে পারে। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী পিতা মাতা বা স্ত্রী পুত্রাদিকে পরিচর্য্যা করিয়া কেবল অধ্যারোপিত তৃপ্তি সুখেরই উপভোগ হয়, তৎসঙ্গে নিজের ভোগ হওয়া, কদাচিৎ কোন বিষয়েই সম্ভবে। আবার যদি কেবল নিজেই ভোগ করে, তাহা হইলেও পিতা মাতা প্রভৃতির ভোগ-জনিত অধ্যারোপিত-সুখের ভোগ হইল না, অতএব আর কোন প্রকারেও ত্রিবিধ সুখভোগ হয় না। কিন্তু আমাকে নিখিল ভোগ্য বস্তু সমর্পণ করিলে উভয় প্রকারেই ভোগানুরাগ চরিতার্থ হইতে পারে। এই হইল প্রকৃত ঘটনা, এখন, এই উভয়বিধ ভোগ প্রণালীর মধ্যে অর্থাৎ আমাকে কোন বিষয় না দিয়া কেবল নিজেই স্ত্রী পুত্রাদির সহিত ভোগ করা, এবং আমাকে সমর্পণ করিয়া প্রসাদি ভোগ করা এতদু-ভয়ের মধ্যে যে বিশেষ রহস্য আছে তাহা শ্রবণ কর।

আমাকে বিষয় ভোগ করাইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে বিষয় ভোগ করা, আর কেবল নিজে নিজে বিষয় ভোগ করা, এতদুভয়ের ফলের বিশেষ বিভিন্নতা আছে। প্রথম প্রণালীর ভোগে তাহার বিষয়ানুরাগ ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া, উহা আমার অনুরাগে পরিণত হইবে এবং ভক্ত অবশেষে, আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। আর দ্বিতীয় প্রকার ভোগ প্রণালীর অনুসরণ করিলে বিষয়ানু-রাগ-বহ্নি ক্রমেই উচ্ছিখ ও অশমনীয় হইয়া জীবকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে, নানাপ্রকার পাপ কর্ম্মে বিনিযুক্ত করিবে এবং আমা হইতে বহু দুরবর্ত্তী করিয়া তুলিবে। কারণ আমাকে বিষয় ভোগ করাইয়া যে অধ্যারোপিত-তৃপ্তি সুখের উপভোগ করে, তাহা বিষয়ানুরাগ-জনিত হইলেও, আমার অনুরাগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আমার প্রতি অনুরাগ না থাকিলে, আমাকে ভোগ করাইয়া কাহারও অণুমাত্র তৃপ্তি সুখও হইতে পারে না। যাহার যে পরিমাণে আমার প্রতি অনুরাগ থাকিবে, সে সেই পরিমাণেই তৃপ্তি সুখ পাইবে, অতএব আমার প্রতি অনুরাগই প্রবলতম কারণ হইল

এবং বিষয়ানুরাগও কিছু অন্তরাল স্থিত বা ব্যবহিত কারণ হইল। ভাবিয়া দেখ, পুত্র বৎসল ব্যক্তি, যে, পুত্রকে নানাবিধ দ্রব্য আহার করাইয়া তৃপ্তি সুখের উপভোগ করে, পুত্র বৎসলতা বা পুত্রানুরাগই তাহার মুখ্যতম কারণ এবং বিষয়ানুরাগ তাহার ব্যবহিত কারণ।

আবার ইহাও জানিবে যে আমার প্রতি ভক্তি বা অনুরক্তি যেমন আমার ভোগ জনিত তৃপ্তি সুখের কারণ, আবার সেই তৃপ্তি সুখও তেমন আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির কারণ। আমার প্রতি অনুরাগের দ্বারা আমাকে নানাবিধ বিষয় ভোগ করাইয়া অধ্যারোপিত তৃপ্তি সুখ ভোগ করে, আবার তাদৃশ তৃপ্তি লাভ করে বলিয়াই ক্রমে আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহারা বৃক্ষ ও বীজের ন্যায় উভয়েই উভয়ের কার্য্যও কারণ রূপে নিবদ্ধ। এতদ্দ্বারা এই ফল হইবে যে উহার বিষয়ানুরাগ ক্রমে ক্রমে খর্ব ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অনুরাগ পূর্ণ হৃদয়ে আমাকে নানাপ্রকার ভোগ্য বস্তু ভোগ করাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতে করিতে আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার সহিত ঘনিষ্ঠতার রসাস্বাদ করিবে, সেই রস এত মধুর যে এই ত্রিভুবনেও এমন কোন মধুর বা অমৃত নাই যদ্দ্বারা তাহার তুলনা করা যায়। যখন সেই অনুপম অমৃত রসের স্বাদ গ্রহণ হয়, তখন বিষয় রসের স্বাদ ক্রমে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে, সুতরাং বিষয়ানুরাগও কমিতে থাকে, এইরূপে আমার প্রতি অনুরাগ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে অবশেষে বিষয়ানুরাগ একবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়; তাহা হইলেই জীব কৃতার্থ হইল।

আবার আমার প্রসাদ আহার করিয়া এবং আমাতে সমর্পিত পুষ্প চন্দন ধূপ, গুগ্গুলাদির ঘ্রাণাদি লইয়া যে রসনা, ঘ্রাণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সুখের উপভোগ করে তদ্দ্বারাও বিষয়ানুরাগের ক্ষয় এবং আমার প্রতি অনুরাগের বৃদ্ধি হইতে থাকে, অবশেষে আমার প্রতি একাত্মতা হইয়া বিষয়ানুরাগ এককালে বিনষ্ট হয়, জীব কৃতার্থ হয়।

ভোলাদাস।—মাগো! তখন তাহা কিরূপে সম্ভবে? মা, তোকে ভোগ করাইয়া যে তৃপ্তি সুখের লাভ হয়, তাহার মূল কারণ তোর প্রতি অনুরাগ; সুতরাং তাহার বৃদ্ধি হইলে বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি হইতে পারে তাহা বুঝিলাম;—কিন্তু আপনি ভোগ করিয়া, আপনি রসনাদি চরিতার্থ করিয়া তদ্দ্বারা বিষয়ানুরাগের বৃদ্ধি ভিন্ন নিবৃত্তি কিরূপে হইতে পারে তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

জগদম্বা।—বৎস! ইহা অতি আশ্চর্য্য রহস্য; আমার প্রসাদাদির দ্বারা রসনাদি ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হয় তাহা সত্য, কিন্তু তথাপি ভাবের তারতম্যে বিপরীত ফল সাধিত হইয়া থাকে। সাধারণ ভোগ্য বস্তুর দ্বারা যখন ইন্দ্রিয় সমূহকে চরিতার্থ করে তখন, সেই সেই দ্রব্যের দ্বারা, ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করাই মুখ্যতম উদ্দেশ্য থাকে এবং সেই উদ্দেশ্যেই দ্রব্যাদির আহরণ করে, সুতরাং তদ্দ্বারা বিষয়ানুরাগানল ক্রমেই প্রজ্বলিত হইতে থাকে; কিন্তু আমার প্রতি প্রকৃতানুরাগী ভক্ত হইলে, ভোগ্য দ্রব্যের রসাস্বাদ করা তাহার উদ্দেশ্য থাকে না এবং ভোগ কালেও কেবল ভোগ্য দ্রব্যেরই আস্বাদ গ্রহণ করে তাহা নহে। সে আমারই নিমিত্ত নানাবিধ ভোগ্য-দ্রব্যের আহরণ করে, সুতরাং তাহার দ্রব্যাহরণের কারণ-বিষয়ানুরাগ নহে, কিন্তু আমার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ; অতএব তাহার দ্রব্যাহরণ করাও আমার প্রতি অনুরক্তি প্রকাশক; সুতরাং উহা বিষয়ানুরাগের নিবর্ত্তক, আমারই অর্চ্চনা বা উপাসনা বিশেষ বলিয়া গণ্য; এবং সে যে, উক্ত ভোগ্য দ্রব্যের রসাস্বাদ করে, তাহা আমার প্রসাদের রসাস্বাদের অন্তরালে অবস্থিতি করে, জম্বীরস, বিমিশ্রিত শর্করোদকের আস্বাদ কালে, যেমন মিষ্ট রসের অন্তর্গত অম্লরস থাকে, আমার প্রসাদ গ্রহণ কালেও তেমনি আমার প্রসাদমূভ রসের অন্তর্গতই দ্রব্যের রস থাকে। অবশ্যই শর্করোদক আর অম্লরসের ন্যায় আমার প্রসাদ আর ভোগ্য দ্রব্য পৃথক্ বস্তু নহে তাহা সত্য, কিন্তু ভক্ত হৃদয়ের ভাবের দ্বারা আমার প্রসাদকে সাধারণ দ্রব্য হইতে পৃথক করিয়া লয়। সে যখন ভোগ করে তখন আমার প্রসাদ বলিয়াই ভোগ করে, ভোগ্য দ্রব্যের রসাস্বাদকে প্রসাদেরই রসাস্বাদ বলিয়া মনে করে, দ্রব্যের রস তাহার অন্তর্নিহিত থাকে, সে আমার প্রসাদেরই রসাস্বাদের দ্বারা আত্মা, অন্তরিন্দ্রিয়, বাহেন্দ্রিয় এবং দেহকে চরিতার্থ মনে করে। সে যে তৃপ্তি লাভ করে, তাহাও আমার প্রসাদ গ্রহণেরই তৃপ্তি, বস্তুর রস জনিত তৃপ্তি তাহার অন্তরালে থাকে, ইহা তুমি স্বয়ংই বিশেষ রূপে অবগত আছ। অতএব এইরূপ ভোগ, বিষয়ের ভোগ হইলেও, বিষয়-ভোগমধ্যে পরিগণিত হয় না, উহা আমার প্রসাদ ভোগ বলিয়াই আমি গণ্য করিয়া থাকি। সুতরাং এইরূপ বিষয় ভোগের দ্বারা আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়া, বিষয়ানুরাগ ক্ষীণ ও বিনষ্ট হইতে থাকে।

এই রহস্য বুঝিতে পারিয়াই, আমার সুপুত্র ঋষিগণ বলিয়াছেন যে,

"অন্নং বিষ্ঠা পয়োমূত্রং যদ্দেবায়ানিবেদিতম্," যে ভক্ষ্য দ্রব্য দেবতাকে নিবেদন করা হয় না তাহা বিষ্ঠা স্বরূপে গণ্য, আর যে পেয়দ্রব্য দেবতাকে নিবেদিত না হয় তাহা মূত্র বলিয়া পরিগণিত হয়" "বিষয়াক্রুষ্ট চিত্তস্য মম্মহৌষধমুচ্যতে। সর্ব্বেন্দ্রিয়াপ্য বস্তুনাং ভগবত্যৈসমর্পণম্" "যাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিষয়ের দ্বারা সমাকৃষ্ট হয় তাহার নিমিত্ত উপযুক্ত মহৌষধ বলিতেছি,—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপভোগ্য যে কোন দ্রব্য আছে তদ্দারা জগদম্বার অর্চ্চনা করিবে, তবেই বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হইবে।" আবার ভগবদ্গীতাতেও শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে আমি রূপান্তরে বলিয়াছি; "ভুঞ্জন্তে কিল্বিষং পাপা যে পরন্ত্যাত্ম কারণাৎ" যাহারা আপনার উদর পূর্ত্তি উদ্দেশে পাকাদি করে সেই পাপ বৃত্তি পুরুষগণ সাক্ষাৎ পাপই ভোজন করিয়া থাকে। কিন্তু দেবার্থে পাকাদি করিলে তাহাকে অমৃত বলে।" "অভ্যাসেষ সমর্থোসি মৎ কর্ম্ম পরমোভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধি মবাপ্স্যসি" যদি জ্ঞানের অভ্যাসে অসমর্থ হও তবে আমার কর্ম্মপরায়ণ হও, সর্ব্বদা যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা আমার নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিলে, সেই কর্ম্ম দ্বারাই জীব বিষয়ানুরাগ হইতে বিমুক্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে। এইরূপ সর্ব্বত্রই কথিত হইয়াছে।

এইক্ষণে ভোগ্য বস্তু সমর্পণ করার প্রণালী বলা যাইতেছে।—বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যদি সর্ব্বদা আমার গুণ কীর্ত্তন এবং স্তোত্রাদি করে তবেই বাগিন্দ্রিয়ের বিষয় আমাকে সমর্পণ করা হইল। এইরূপ করিলে বাগিন্দ্রিয়ও চরিতার্থ হয় এবং বাগিন্দ্রিয়ের অনুরাগটি আমার অনুরাগে বিমিশ্রিত হইয়া অবশেষে উহা আমার অনুরাগেই পরিণত হয়, বাগিন্দ্রিয়ের অনুরাগ তখন বিনষ্ট-প্রায় ক্ষীণাবস্থ হইয়া আমার অনুরাগের অন্তরালে অবস্থিতি করে। কারণ আমার গুণালাপ বা আমার স্তব স্তোত্রাদির নিমিত্ত যে বাগিন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি হয়, তাহার মুখ্য কারণ আমার প্রতি অনুরাগ, বাগিন্দ্রিয় চরিতার্থ করার অনুরাগ তাহার গৌণতম কারণ। স্নেহ রসে পুলকিত হইয়া পুত্রকে, "বাবা" "বাছা" "ধন" প্রভৃতি স্নেহাক্ত বাক্যালাপ কালে যেমন পুত্রানুরাগই মুখ্য রূপে হৃদয় মধ্যে উদ্ভাসিত হয় এবং বাক্ প্রবৃত্তির অনুরাগ অলক্ষিত ভাবে থাকে, তাহার উপলব্ধিও হয় না; আমার স্তোত্র

করা, আমার গুণ কীর্ত্তন এবং আমার সম্বোধনাদি কালেও সেই রূপই জানিবে। এইরূপ বাক্যালাপে যে সুখ বা পরিতৃপ্তি জন্মে, তাহাতে আমার ভাব বিমিশ্রিত থাকাতে উহা বিষয় সুখ হইলেও ভগবৎ সম্বন্ধীয় তৃপ্তি সুখের মধ্যে পরিগণিত হয়, সুতরাং তদ্দ্বারা কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

ভোলাদাস।—মা, তুই যাহা বলিস, বুঝিলাম, কিন্তু সংসারে থাকিতে হইলে আরও কতশত কথা বলিতে হয়, সর্ব্বদা কেবল তোরই কথালাপ করিলে চলে না; অতএব সেই সকল কথা, কিরূপে তোকে সমর্পণ করিবে?

জগদম্বা।—ভোলাদাস! সে কথাও আমাতে সমর্পিত হইতে পারে, সংসারকে যাহারা আমার সংসার বলিয়া স্থিরতর বিশ্বাস রাখে, তাহাদের সাংসারিক কথাও আমারই কথার মধ্যে গণ্য, আমার সংসার পরিচালনের নিমিত্তই সেই সকল বাক্যালাপের পরিস্ফূর্ত্তি হয়, অতএব তাহাও আমার উপাসনাক্রিয়ারই অন্তর্গত হইবে এবং তাহাও বিষয়ানুরাগ নিবর্ত্তক হইয়া আমার প্রতি অনুরাগবর্দ্ধক হয়।

কিন্তু আমারগুণসঙ্কীর্ত্তন এবং বাক্যালাপের ও আবার বিশেষ বিশেষ প্রণালী আছে, তাহা শ্রবণ কর। বিষয়ের প্রভেদ বাক্য প্রয়োগ প্রথমে তিন ভাগে বিভক্ত। তামস বাক্য প্রয়োগ, রাজস বাক্য প্রয়োগ এবং সাত্ত্বিক বাক্য প্রয়োগ। তামস ভাব বা তামস বিষয় প্রকাশক বাক্যকে তামস বাক্য বলে। রাজস বিষয় প্রকাশক বাক্যকে রাজস বাক্য এবং সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশক বাক্যকে সাত্ত্বিক বাক্য বলে। ভয়ানকরৌদ্র, এবং বীভৎস রস সম্মিশ্রিত ভাবকে তামস ভাব বলে; শৃঙ্গার, বীর, অদ্ভুত, ও হাস্যরস সম্মিশ্রিত ভাবকে রাজস ভাব এবং করুণ আর শান্তি রস বিমিশ্রিত ভাবকে সাত্ত্বিক ভাব বলে। অতএব ভয়ানক রৌদ্র এবং বীভৎস ভাব প্রকাশক বাক্যই তামস বাক্য, শৃঙ্গার, বীর, অদ্ভুত এবং হাস্যরস প্রকাশক বাক্যকে রাজস বাক্য, আর করুণ এবং শান্তরস প্রকাশক বাক্যকে সাত্ত্বিক বাক্য বলে।

লোকের প্রকৃতিও, গুণ ভেদে প্রথমে তিন প্রকারে বিভক্ত, তৎপর তাহার এক এক প্রকারের অবান্তরেও নানাপ্রকার প্রভেদ আছে। যথা তামস, প্রকৃতি, রাজস প্রকৃতি এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতি। সত্ত্ব এবং রজ

সামান্য মাত্রায় থাকিয়া যাহাদের তমোগুণের প্রবলতা থাকে তাহাদিগকে তামস প্রকৃতি বলে, সত্ব আর তমোগুণের অল্পতা এবং রজোগুণের অত্যন্ত প্রবলতা থাকিলে রাজস প্রকৃতি বলে, আর রজ এবং তমোগুণের অত্যন্ত অল্পতা এবং সত্বগুণের প্রবলতা থাকিলে সাত্বিক প্রকৃতি বলে। ইহারই পরিমাণের তারতম্যে মানুষের অসংখ্য প্রকৃতি দেখিতে পাও।

এই প্রকৃতির প্রভেদে বিষয়াস্বাদের পার্থক্য হইয়া থাকে, একই বিষয় সকল প্রকৃতির লোকে ভাল বাসে না। যাহা রাজস প্রকৃতির প্রিয় তাহা তামস এবং সাত্বিকের অপ্রিয়, যাহা তামসের প্রিয় তাহা রাজস এবং সাত্বিকের অপ্রিয়, যাহা সাত্বিকের প্রিয় তাহা রাজস তামসের অপ্রিয়। কিন্তু তামস ব্যক্তির তামস বিষয়ই প্রিয় হইয়া থাকে। আর রাজস ব্যক্তির প্রিয় রাজস বিষয় এবং সাত্বিক বিষয় সাত্বিক ব্যক্তির প্রিয়। বৎস! আমি রূপান্তরে ভগবদ্গীতার সপ্তদশাধ্যায়ের "ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সাস্বভাবজা। সাত্বিকী রাজসী চেতি তামসী জেতিতাং শৃণু। সত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। শ্রদ্ধাময়োয়ং পুরুষোযোবচ্ছ্রদ্ধঃ সএব সঃ॥"

এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া অতি বিস্তার ক্রমে বলিয়াছি, এবং সাধারণ অনুভবের দ্বারায় ইহা বুঝিতে পার। অতএব, ভয়ানক রস, রৌদ্র রস এবং বীভৎস রস তামস প্রকৃতির প্রিয়তম হয়; শৃঙ্গার, বীর, অদ্ভুত এবং হাস্যরস রাজস প্রকৃতির প্রিয়তম; আর করুণ এবং শান্তিরস সাত্বিক প্রকৃতির প্রিয়তম, এইরূপ অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও যোজনা করিয়া লইবে। এই গেল বস্তুরহস্য, এখন অর্পণের প্রণালী শুন।

উপাসকদের মধ্যে, যে, যে গুণের প্রকৃতির, সে, সেই গুণ বিমিশ্রিত বিষয়ের দ্বারা আমার উপাসনা করিবে, কারণ সেই গুণযুক্ত বিষয়ই তাহার প্রিয়তম। প্রকৃতির বিপরীত গুণযুক্ত বিষয় হইলে তাহা অন্যের প্রিয় হইলেও তদ্দ্বারা আমার সেবা করিবে না, কারণ সেই দ্রব্য তাহার অপ্রিয়। যাহা নিজের প্রিয় বিষয় নহে তাহা অন্যের প্রিয়তম হইলেও তদ্দারা আমার সেবা করিলে কিছুমাত্র ইষ্ট ফল সাধিত হয় না, তদ্দারা বিষয়ানুরাগের কিছুমাত্র হ্রাস কিম্বা আমার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাদি কিছুই হইতে পারে না কেবল বৃথা অর্থব্যয় ও পরিশ্রম মাত্রই হয়। এই জন্যই আমার পুত্রগণ বলিয়াছেন "কালিকামাত্মবৎ পশ্যেৎ তথা সেবেত চাত্মবৎ।"

এখন, ফল কথা এই হইল যে যে ব্যক্তি তমঃ প্রকৃতিক সে বাগিন্দ্রিয়ের বিনিয়োগ কালে আমার বীভৎস রস, ভয়ানক রস এবং রৌদ্র রসের প্রকাশক যে সকল কর্ম্ম আছে তাহার কীর্ত্তন ও আলোচন করিবে এবং সেই ভাবেই স্তবস্তোত্রাদি করিবে। যে ব্যক্তি রজঃ প্রকৃতিক সে আমার শৃঙ্গাররস, বীররস ও হাস্যরস প্রকাশক কর্ম্মের কীর্ত্তন আলোচনাদি করিবে। যে ব্যক্তি সত্ত্ব প্রকৃতির তিনি আমার করুণ এবং শান্তরস প্রকাশক কর্ম্মের কীর্ত্তনাদি করিবেন। এজন্যই প্রিয় পুত্র বেদব্যাসাদি মহর্ষিগণ সকল প্রকার লোকের উপকার মানসে আমার সকল প্রকার ক্রীড়া কর্ম্মাদি লিখিয়া ইতিহাসের সহিত ৩৬ শৎ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন।

এই নিয়মের অন্যথা করিয়া ঘোর তামস প্রকৃতির মানব যদি সান্ত, করুণ-রস, ও বীরাদি রাজস রসের কীর্ত্তনাদি করিতে থাকে, তবে তাহার বাগি-ন্দ্রিয় চরিতার্থ হয় না, বাগিন্দ্রিয় জনিত তৃপ্তি সুখও পায় না, তদ্বিষয়ে অনু-রাগ ও পরিসমাপ্ত হয় না ও আপন প্রকৃতির অনুমোদিত বিষয়ের আলোচনা ও কীর্ত্তনাদির নিমিত্ত তাহার অনুরাগ থাকিয়াই গেল। সেই অনুরাগ বশ-বর্ত্তী হইয়া সে অন্য সময়ে অসদালোচনায় নিরত হইতে পারে। আর যদি সে বীভৎস রৌদ্র রসাদি প্রকাশক আমার গুণানুবাদ করে তবে তাহার বাগি-ন্দ্রিয় জনিত তৃপ্তি সুখ আর আমার গুণানুবাদের তৃপ্তিসুখ উভয়ই হইল ; এবং ঐরূপ গুণানুবাদ যদি আমার প্রতি অনুরাগ পূর্ব্বক করা হয় তবে বাগিন্দ্রিয়ের বিষয়ানুরাগও আমার অনুরাগের অন্তরালে পড়িবে। এবং বাগিন্দ্রিয়ের চরি-তার্থতা জনিত সুখ ও আমার গুণানুবাদ জনিত তৃপ্তি সুখের অভ্যন্তরে বিলীন হইয়া যাইবে। সুতরাং, উহার বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও আমার উপাসনা মধ্যে পরিগণিত হইয়া বাগিন্দ্রিয় ব্যাপারের ফল না জন্মাইয়া আমার উপাসনার ফল অর্থাৎ আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করিবে ; তখন হৃদয়ের তমোভাব ক্ষীণ হইয়া রজোভাব প্রাদুর্ভূত হইবে, তখন আবার রজঃ প্রকৃতির অনু-মোদিত শৃঙ্গার রস প্রকাশক ক্রীড়ার ও কর্ম্মের কীর্ত্তন করিবে। পরে উক্ত নিয়মানুসারেই উন্নীত হইয়া সত্ত্ব গুণে উপস্থিত হইবে, তখন আমার করুণ রস এবং শান্তরসোদ্দীপক ক্রীড়াদির কীর্ত্তন করিতে থাকিবে। পরে উক্ত নিয়মানুসারে তাহাতেও উন্নতি লাভ করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থায় উপ-স্থিত হইবে, তখন সমস্ত অনুরাগ বিনষ্ট হইয়া কেবল আমার প্রতি অহেতুক

অনুরাগ মাত্র থাকিবে; তবেই জীব কৃতার্থ হইল। এই রূপ বাগিন্দ্রিয়ের বিষয়ের দ্বারা আমার উপাসনা করিতে হয়। ক্রমশঃ।

শুভ সংবাদ।

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্;
সোপি সংসার দুঃখৌঘৈ র্বাধ্যতে ন কদাচন;
ক্ষিপ্রং তরতি ধর্ম্মাত্মোশনৈ স্তরতি সোপিচ।
ময়ি ভক্তিমতাং মুক্তি রলভ্যা পর্ব্বতাধিপ!॥"
শ্রীমদ্ভগবতী গীতা।

জগদেক সৌভাগ্যবতী মেনকার সূতিকাগৃহে জগৎপ্রসূতী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যোগীন্দ্র মোহিনীর রূপের ছটায় নগেন্দ্র দম্পতি ডুবিয়া পড়িয়াছেন, কেবল পাষাণময় হিমাচলের কন্দরগত অন্ধকারই পরাহত নহে; ভক্তিভরমন্থর ভূধররাজের হৃদয়মন্দির পর্য্যন্ত আনন্দময়ীর আনন্দ-ছটায় আলোকিত হইয়াছে; তাই আজ ভক্তকে কৃতার্থ করিতে, জগৎকে উদ্ধার করিতে, প্রাণপ্রিয় ভক্তের জন্য, যে সুধাসিঞ্চিত তত্ত্বকথা জগদম্বা নিজ মর্ম্মস্থলে অতি সঙ্গোপনে রাখিয়াছিলেন, ভক্ত, ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া, মা, প্রাণের কপাট খুলিয়া, ভক্ত হিমাচলকে তাহাও বলিয়া ফেলিয়াছেন। ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মতেজে হিমালয় তেজস্বী, তাই তিনি ব্রহ্মাদি দুর্লভ সঞ্জীবনী মন্ত্রণা ধারণা করিতে পারিয়াছেন "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্"। মা কোথায় তোমার সৌভাগ্যবান্ পিতা, আর কোথায় এই আমি ঘোরনরকার্ণবনিমগ্ন মহাপাতক অকৃতি সন্তান! তিনি যাহা শুনিয়াছেন, বুঝিয়াছেন, ধারণা করিয়াছেন তাহা শুনিবার বুঝিবার ধারণা করিবার শক্তি আমার কি আছে! তিনি ভূধর, ধরণী, এই নিখিল বিশ্বচরাচর ধারিণী, মা! তুমি আবার এই অনন্তকোটীধরণীর এক মাত্র ধারিণী। হিমাচল আবার সেই তোমাকে নিজ ঔরসে ধারণ করিয়াছেন। মা! তুমি বুঝিয়া লও, তোমার পিতাকে তুমি কি

অপরিসীম শক্তিময় উপাদানে সৃষ্টি করিয়াছ! আর আমি ক্ষুদ্র আপন পাপের ভারে আপনি ডুবিয়া পড়িতেছি, আমাকেই বা কি দিয়াছ! পর্ব্বতও তোমার সৃষ্ট, সর্ষপও তোমার সৃষ্ট, তাই বলি মা! তোমার পিতাও তোমার সৃষ্ট, আর তোমার সন্তান আমিও তোমার সৃষ্ট। হা অবিশ্বাসি মানব! আজ তোমার চক্ষে সেই হিমাচল জড় পদার্থ! যাহা হউক, মা! তোমার সে তত্ত্বকথা শুনিবার শক্তি কৈ? তোমার সে ভক্তগাথা বুঝিবার অধিকার কৈ? নারকী সন্তানের জন্য তোমার সেই প্রাণের ব্যথা ধারণা করিবার সামর্থ্য আমার কৈ? মা! তোমার ভুবনমোহন রূপের ছটায় হিমালয়ের যে দৃষ্টি ফুটিয়াছে, ঘোর-অজ্ঞান-অন্ধকারসাগরে ডুবিয়া, জন্মান্ধ আমার কি, মা! সেই দৃষ্টি ফুটিবে! ভক্ত-বৎসলের ভবজননি! ভক্তের শ্রবণপুট পেয়, হৃদয়াপটধ্যেয়, ভক্তলক্ষে তোমার সেই আশ্বাসবাণী অভয়বাণী যে, এ ভবভয়ভীত অবিশ্বাসীর পাপ হৃদয়ে স্থান পায় না! বল মা! কোন্ পুণ্যে তোমার ঐ ব্রহ্মমুখ-বিনিঃসৃত ব্রহ্মবাণী বিশ্বাস করিবার বল পাই! ইচ্ছাময়ি আনন্দময়ি, মৃত্যুময়ি মা! তুমি একবার সম্মুখে আসিয়া না দাঁড়াইলে, একবার ঐ করুণাময়ী অপাঙ্গলহরীর সুধাসিঞ্চনে এ ত্রিতাপদগ্ধহৃদয় শীতল না করিলে, একবার ঐ মৃত্যুঞ্জয়হৃদ্বিলাসিচিদ্ঘনানন্দরূপের তরঙ্গে এ নয়ন মন না উথলিলে সে বল যে, পাইনে মা! তোমায় না দেখিয়া তোমার কথা প্রাণ যে আমার বিশ্বাস করিতে চায় না! সত্য আমি ঘোর নারকী, মহাপাতকী; কিন্তু ছেলে হইয়া এ আব্দার টুকু কি করিতে পারি না। শুধু আবদার নয় মা! সত্য, সত্য, সত্য, ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, তুই যদি তোর কথা বুঝিবার অধিকার না দিস্, কার সাধ্য ঐ যোগীজন চিন্তিত তত্ত্ব নিজবুদ্ধিবলে আয়ত্ত করিতে পারে? তাই বলি একবার তুই দেখা দিয়ে, বিশ্বাসের বল দিয়ে যা মা! নইলে আমি গেলাম গেলাম, ডুবিয়া রসাতলে পড়িলাম। এ সময়ে মা তুই, মা হইয়া কোথায় রইলি? সকল সংসার তোর বিশ্বাসী ভক্ত, আমি ঘোর-অভক্ত ঘোর অবিশ্বাসী তাই আমার এ সর্ব্বনাশ!! কেউ তোর কোলে উঠিয়াছে, কেউ চরণতলে, আমি নরকের অধস্তলে চলিলাম, ধরাধর-নন্দিনি মা' আমায় ধর ধর, জগদ্ধাত্রি! একবার এসে কোলে কর; গণেশ জননি! একবার এসে স্তন্য দাও; অন্নপূর্ণে! একবার ক্ষুধায় অন্ন দাও।

মা তোমায় প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া এ তাপিতপ্রাণ শীতল করি! আমায় যারা বিশ্বাসী বলে, বল্‌ব কি মা! আমার চক্ষে তারাও অবিশ্বাসী। মা! তোমার যে বিশ্বাস করে, সে কি মা বই সংসারে আর কিছু বিশ্বাস করে? আমি বিরাট ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া বিশ্বাস করি; কিন্তু বিশ্বাসী ভক্ত তোমার প্রহ্লাদ, স্ফটিকস্তম্ভে কি দেখিয়াছিল! কি বিশ্বাস করিয়াছিল! সে যে মা বই আর চরাচরে কিছু দেখিত না; তাই মিথ্যাস্ফটীকস্তম্ভ ভেদ করিয়া সত্য সনাতন নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মা তুমি তাকে দেখা দিয়া কোলের ছেলে, কোলে উঠাইয়া লইয়াছিল! কৈ মা! সে বিশ্বাস কোথায় আছে? গহনবনে সিংহ ব্যাঘ্র ভুজঙ্গ ভল্লুক দেখিয়া ধ্রুব যে ঐ আমার পদ্মপলাশলোচন বলিয়া ধরিতে যাইত, আর অমনি তুমি শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে দেখা দিয়া তখনই লুকাইতে, সে বিশ্বাস কৈ মা! "আমাদের দুঃখ মোচন করিতে পদ্মপলাশলোচন বৈ আর কেহ নাই," জননী সুনীতির মুখে এই মহামন্ত্র শুনিয়া যে অটল বিশ্বাসের ভরে পঞ্চম বর্ষীয় শিশু গভীর মহানিশায় মাতৃস্নেহ ভুলিয়া একাকী বিজন বনে ধাইল; আশা তার, "পদ্মপলাশলোচনকে পাইব"। সে ত না বুঝিত পদ্ম,—না বুঝিত পলাস,—না বুঝিত লোচন, না বুঝিত পদ্মপলাসলোচন। দুগ্ধ পোষ্য শিশু কেবল বুঝিয়াছিল, এ সংসার তিনি আমাদের একজন। মা! এখন শত শত বেদ বেদান্ত পুরাণতন্ত্র পড়িয়াও, কেন সে বিশ্বাস হয় না, এক পদ্মপলাশলোচন শব্দে ধ্রুবের যাহা হইয়াছিল। তুই ত মা সেই তুইই আছিস। তবে আমি কেন মা এমন হলেম? মায়ের সন্তান মা ছেড়ে এ সংসার-রণে একা এলেম, তুই মা আসিবার কালে মণিমাণিক্যহীরক রত্ন স্বর্ণাভরণে আমায় সাজাইয়া দিয়াছিলি। কুসঙ্গে পথ ভুলিয়া একে একে দস্যুর হস্তে সব হারাইলাম! রাজরাজেশ্বরীর কুমার হইয়া আসিয়াছিলাম, চিরদরিদ্রের কুলাঙ্গার সাজিয়া ফিরিয়া চলিলাম। ত্রিলোচনে! কোন লোচনে এ দৃশ্য তুই দেখিবি! এ দারিদ্র্য মোচন কবে হইবে মা! ত্রিলোচনের লোচনানন্দ পঙ্কজকুলগঞ্জিত ঐ চরণতল তোমার ও যে ভিখারী শঙ্করের সর্ব্বস্বধন! এ পাপ সংসার ছারখার করিয়া আমায় পথের ভিখারী সাজাইয়া দাও, জয় মা শ্মশানবাসিনী! শ্মশানে আমায় স্থান দাও; শ্মশানের জ্বলন্ত চিতায় অগ্নিস্তোম বিদীর্ণ করিয়া অসিধারিণী মুক্তকেশী হাসিতে হাসিতে একবার বাঁশী লইয়া ত্রিভঙ্গরূপে দাঁড়াও মা!

মা তুমি মদনদহনমনোমোহিনী তোমায় আর মদনমোহিনী বলিয়া কি সুখী হইব ? তাই বলি মদনমোহনরূপে ভুবনমোহিনী রাধিকাকে বামাঙ্গভাগিনী করিয়া, রণরঙ্গিনী একবার প্রেমতরঙ্গিণী সাজ মা ! দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া বিশ্বাস করি, "মা বই আর কিছু নাই"। অনন্তসচ্চিদানন্দসাগরে একবার উত্তালতরঙ্গ উঠাও মা, তরঙ্গের উপর তরঙ্গিণী, নিত্যনবরঙ্গিণী মা তোমার একবার অনন্তরূপিণী দেখিয়া লই, এ পাষাণময় হৃদয়ফলকে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিয়া লই, বেদবেদান্ত পুরাণতন্ত্র সব আমার সেই ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মমন্ত্র। মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়। সত্য সনাতনী মায়ের আজ্ঞা, সকলই আমার সত্যময়। শাস্ত্র অনন্তভাষায় মায়ের তত্ত্ব লিখিয়াছেন, অনন্তরূপিণী মা আমার অনন্তরূপে সাধককে দেখা দিয়া শাস্ত্রের গৌরবে নাচিতেছেন। অহো কি আনন্দময় লীলা খেলা ! ! সাধক ! এ সংসারে তুমিই ধন্য, তুমিই সার্থক জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলে ! ধন্য তোমার অনন্তশক্তি, যাহার বলে তুমি সেই অনন্ত শক্তির অটল সিংহাসন টলাইয়াছ, ধন্য হিমাচল। তোমারই পুণ্য ফলে মা আজ অচলরাজনন্দিনী। তাই আজ তাঁর সহস্র ধার বিনিঃসৃত স্তন পীযূষময় অভয়বাণী পাপী তাপী দীন দুঃখী অধম সন্তানকে রক্ষার জন্য সবেগে ছুটিয়াছে ; ভয় নাই, ভয় নাই, "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্"। মা ! তোমার অজস্রবাহী দয়ার প্রস্রবণ দেখিয়া অপার সমুদ্রের ভৈরব উচ্ছ্বাস স্তম্ভিত হয়, তোমার যদি এ দয়া না থাকিত, তবে কি সংসার থাকিত মা ! অনন্তনরকের কঠোর গ্রাস হইতে পাপীর কি আর পরিত্রাণ ছিল ? মা ! তোমার করুণাবলে তোমার আজ্ঞা মধ্যে অনন্ত নরকের নাম নাই; তাই পাপীর এক মাত্র আশা ও ভরসা স্থল তুমি তাই সংসারের অমোঘসিদ্ধান্ত "পুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়"। মাগো ! বলিয়াছ—"ভজতে মামনন্যভাক্" ভাগ্য দোষে আমার চক্ষে অনেক অন্ধ তাই আমি তোমার মহাবাক্য বিশ্বাসের অনধিকারী। মাগো ! বুঝিতে পারি না, অনন্যভাক্ হইয়া তোমার ভজনা করিব, কি তোমায় ভজনা করিয়া অনন্যভাক্ হইব ? আমি ত জানি, যে তোমার ভজনা করে, সেই সংসারে অনন্যভাক্ হয়। তারানামের প্রেমের বলে যাদের নয়নতারা ঝরিতে থাকে, তারা ত তারামগ্ন নয়নতারায়, তারা বৈ এ সংসারে আর কিছু দেখিতে পায় না ! চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা আপন আলোক হারাইয়া যায়; তারা ত তখন ত্রিলোক-

তারা তারার আলোকে প্রেম পুলকে ভাসিয়া উঠে! স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ভেদ করিয়া তারাময় আলোক ছুটে, ত্রিনয়নের নয়নতারায় তারা তুমি ধরা দিয়াছ, তাই দিগম্বর ভীত; চকিত স্তম্ভিত হইয়া দশদিকে চাহিয়াছেন। আর অমনি তুমি দশদিক আলো করিয়া "কালীতারা ষোড়শী" আদি দশ-মহাবিদ্যা রূপে দশদিকে তাঁহার দেখা দিয়া নিজ দাসকে মৃত্যুঞ্জয় করিয়া লইয়াছ; সেই বলে, সেই সাহসে তিনি "সত্যং সত্যং পুনঃ স ত্যং সত্যং ধর্ম্মি ন সংশয়ঃ" বলিয়া প্রতিজ্ঞার পর প্রতিজ্ঞা করিয়া পঞ্চমুখে তোমার গুণ গাইতেছেন, সে আরাধন কৈ মা, যাতে তারাধন আমার হবে॥ তুমি যদি মা আমার হতে, তবে কি আমি কারও হতেম? আবার কি করিয়াই বা বলিব মা, তুমি, আমার নও বা আমি তোমার নই। তুমি যদি আমার নও তবে তুমি কার; আর আমি যদি তোমার নই, তবে আমিই বা কে? মা! আমার মত মহানারকী সন্তান আছে বলিয়াই ত তুমি নরনরক-নিস্তারিণী। তাই বড় আবদার করিয়া বলি মা, তুমি আমার মা না হইলে আর কার হইবে মা; জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, এই বিশাল বিশ্বকক্ষে প্রতি অণু পরমাণু মধ্যে নিত্য চৈতন্য রূপিণী তুমি চমকিতেছ। তাই জগৎ প্রকাশিত হইতেছে। আবার অনন্ত চন্দ্র, সূর্য্যময় কারুকার্য্যখচিত এই বিরাট অম্বরে তুমি দিগাম্বরী সাজিয়াছ, তাই তোমার অনন্ত অঞ্চল ধরিয়া, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ঝুলিয়া ঝুলিয়া খেলিতেছে। তাই বলি মা, তুমি চিরদিনই আমার, আমি চিরদিনই তোমার। কেবল, তোমায় আমি না দেখিয়া আমায় আমি না চিনিয়া এ অন্ধতামসী মহানিশায় দিশাহারা হইয়াছি। সাধকের হৃদয়াকাশে তুমিই কেবল স্থির কামিনী। তুমি যদি আপন আলোকে আপন পথে ভ্রান্ত বালককে টানিয়া না লও, তবে কার সাধ্য তোমার আজ্ঞার একটী অক্ষর পড়িতে পারে? কার সাধ্য আপন আবদারে এ মায়া অঞ্চল অপসারণ করিয়া তোমার স্তন্যের একটী ধার শোষণ করিতে পারে? লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সুসন্তান অবিশ্রান্ত তোমার জন্য তোমার পথে ধাইতেছে। ব্রহ্মাদি তৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত তোমার স্নেহময় আকর্ষণে আকৃষ্ট, নিখিল চরাচরের গতাগতিতে পথ ত অতি প্রশস্ত হইয়াছে; কিন্তু দেখ মা দেখ, আমি অন্ধ, লক্ষ্যভ্রষ্ট। নবনীরদ-গঞ্জন অঞ্জনবরণী একবার তুমি দেখা দাও, সেই অঞ্জনের কিরণ রেখায় এ চক্ষু একবার যদি রঞ্জিত হয় তখন ভব সমুদ্রের সাধ্য কি যে, তাহার

ভাণ্ডারের জল দিয়া সে অঞ্জন সে ধুইতে পারে? আমি একবার সেই অঞ্জন রঞ্জিত নয়নে তোমার ঐ ভৈরবহৃদিরঞ্জিনী মূর্ত্তি দেখিয়া লই, তার পর আমার সাধ্য থাকে, ধরিয়া রাখিব না হয় তুমি দূরে পলাইও। যদি পালাইবার স্থান থাকে।। স্বর্গে তুমি, নরকে তুমি, অন্তরে তুমি, বাহিরে তুমি, পালাইবে কোথা মা? নরকের ভীষণ করুণার মধ্যেও ভব যন্ত্রণাহারিণী মা তুমি আছ বলিয়াই ক্ষীণকণ্ঠ পাপী নরকেও তোমার নাম করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করে। শত শত নারকীর পবিত্র কণ্ঠে যখন মা মা ধ্বনি উঠিয়া যমলোক স্তম্ভিত করে, তখন কোথায় নরক, কোথায় স্বর্গ, কোথায় বৈকুণ্ঠ, কোথায় কৈবল্য, কোথায় কৈলাস, মা তোমার নামের গুণে প্রেমের গুণে সব তখন এক হইয়া উঠে। তারার নামের ভয়ে যমের যমদণ্ড কাঁপিতে থাকে, নারকী সন্তান তখন আর নারকী থাকে না; প্রাণের কপাট খুলে, মা, মা বলে, বাহুতুলে মায়ের কোলে উঠে; ভীত, চকিত, স্তম্ভিত সংসার নিস্পন্দ নয়নে দেখিতে থাকে, আনন্দময়ীর নামের গুণে নরকের নিরানন্দও "ত্রাহি ত্রাহি" করিয়া দূরে পালায়। তখন "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মা অনন্যভাক্" তোমার এই জ্বলন্ত মহামন্ত্র মনে করিয়া অকৃতি সন্তানকৃতী হইয়া, নয়নজলে অঞ্জলি পূরিয়া, তোমার চরণ বিধৌত করে। জননীর করুণাজালে, সন্তানের নয়ন জলে এক হইয়া, জগৎ সংসার ডুবাইয়া ফেলে; সেই জলে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতে থাকে "জয় জননি জগদম্বার দয়ার জয়, ভয়াবহ সংসারে সেই অভয়া জননীর জয়।"

মনু সংহিতা।

১ম ভাগ ৯ম সংখ্যায় আমরা শূদ্রাদি জাতি অনধিকারী কেন এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া অপরিহার্য্য প্রবন্ধ প্রকাশের অনুরোধে এত দিন পর্য্যন্ত আর তদুত্তরে অবকাশ পাই নাই। অদ্য তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে অধ্যয়ন কাহাকে বলে ও অধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা বিস্তার মতে আলোচনা করিয়াছি; দেখাইয়াছি যে, বর্ত্ত-

মানে অধ্যয়ন শব্দে যে ভাবে অর্থ গ্রহিত হয় পূর্ব্বে সে ভাবে গ্রহিত হইত না, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থে গ্রহণ করা হইত; এবং অধ্যয়নের উদ্দেশ্যও যে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল তাহাও আমরা যথাসাধ্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। আমরা এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা বুঝিয়াছি যে, অধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা। যিনি যতটুকু অধ্যয়ন করিবেন তিনি ততটুকুই কার্য্যে পরিণত করিবেন, যাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন না তাহা কদাপি অধ্যয়ন করিবেন না; ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃত আদেশ। শাস্ত্র আদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আরও বলিয়াছেন যে, বৃথা অধ্যয়নকারী ইহ এবং পরকালে উভয়এই অশেষ দুঃখভাগী হইয়া থাকে। সুতরাং, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকারীত্ব অনধিকারীত্ব লইয়া নানা প্রকার বিধি ব্যবস্থা করিলেন। এই সমস্ত বিধি ব্যবস্থা সম্প্রাদায় বিশেষের উপর পক্ষপাতি হইয়া প্রনয়ন করেন নাই বরং একান্ত দয়া পরবশ হইয়া অশেষ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক জীবগণের প্রকৃত কল্যাণ কামনায় এরূপ করিয়া গিয়াছেন। মূর্খ আমরা, তাহাই না জানিয়া না শুনিয়া না বুঝিয়া ঈশ্বর কল্প ঋষিদের উপর অযথা দোষারোপ করিতে সাহসী হই।

এইরূপে শাস্ত্র অধিকারীত্ব অনধিকারীত্ব বিচার করিতে গিয়া অধিকারীকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন মনুষ্যের আত্মা চারিটি আবরণে আবৃত, এই প্রত্যেক আবরণের নাম একটি একটি কোষ। এইরূপ কোষচতুষ্টয়াচ্ছাদিত নিত্য-বুদ্ধ মুক্ত, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার চৈতন্য-মাত্র আত্মা এই জীবদেহে বিরাজিত থাকেন। মনুষ্য এই আবরণ চতুষ্টয় জন্য আপনার প্রকৃত স্বরূপ সন্দর্শনে বঞ্চিত হইয়া থাকে। প্রকৃত স্বরূপোপলব্ধি করিতে হইলে নানাবিধসুগমোপায় দ্বারা এই আবরণ চতুষ্টয় উন্মোচন করিতে হইবে। অধঃস্রোতস্বিনী বৃত্তি সমূহের ক্ষমতার হ্রাস করিয়া উর্দ্ধস্রোতস্বিনী বৃত্তি সকলের চর্চ্চার দ্বারা আমাদের যাবতীয় শক্তি আত্মার উন্নতির অনুকূলে ছাড়িয়া দিতে হইবে। কি কি উপায় দ্বারা এই আবরণ চতুষ্টয় হইতে বিনির্মুক্ত হওয়া যায় তাহাই শাস্ত্রে বহুতর পন্থায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং, এই আবরণোন্মুক্ত হইবার উপায় সংগ্রহের জন্যই বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়নের আবশ্যক।

আত্মা যে চারিটি কোষের দ্বারা আবৃত তাহার প্রথমটির নাম অন্নময়

কোষ, দ্বিতীয়টির নাম মনময় কোষ, তৃতীয়টির নাম বিজ্ঞানময় কোষ, এবং চতুর্থটির নাম আনন্দময় কোষ। আত্মস্থ হইতে হইলে অর্থাৎ প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ক্রমশঃ এই চারিটি আবরণ উন্মুক্ত করিয়া স্বরূপে অবস্থিতি করিতে হইবে। যিনি যতটুক আবরণোন্মুক্ত হইতে পারিয়াছেন, তিনি ততটুকু আত্মজ্ঞানী হইতে সক্ষম হইয়াছেন। যিনি কেবল মাত্র অন্নময় কোষে আপনাকে আবদ্ধ ভাবিয়া কার্য্য করেন অর্থাৎ যিনি আপনার আমিত্বকে এই স্থূল দেহ হইতে উঠাইয়া লইতে পারেন নাই, তিনিই শূদ্র পদবাচ্য; আর যিনি অন্নময় কোষ হইতে নিজের আমিত্ব উঠাইয়া লইয়া মনময় কোষে অবস্থিতি করিতেছেন তিনি বৈশ্যপদ বাচ্য; যিনি নিজের আমিত্বকে মনময় কোষ হইতে উঠাইয়া লইয়া বিজ্ঞান ময় কোষে অবস্থিতি করিয়া থাকেন তিনিই ক্ষত্রিয় পদবাচ্য এবং যিনি এই কোষত্রয় অতিক্রম করিয়া কেবল আনন্দময় কোষে বিরাজ করেন তাঁহাকেই শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং যিনি অন্নময় কোষ হইতে আপনার আমিত্ব উঠাইয়া লইয়া মনময় কোষে উপনিত হইতে পারেন নাই তাঁহার মনময় কোষের অনুষ্ঠানাদি জানিবার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ, অন্নময় কোষে আত্মা জড়িত থাকায় দেহাভিমান স্বতঃই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দেহাভিমানীর আত্মজ্ঞান লাভ নিতান্তই অসম্ভব। এইরূপ যিনি মনময় কোষ হইতে আপানার আমিত্ব উঠাইয়া বিজ্ঞানময় কোষে উপস্থিত হইতে সক্ষম হন নাই তাঁহার বিজ্ঞানময় কোষের অনুষ্ঠানাদি জানিবার কোন প্রয়োজনই নাই, এইরূপেই আনন্দময় কোষ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। অথচ বেদ ও দর্শনাদি শাস্ত্রে আত্মাকে কিরূপে নিম্নতম অন্নময় কোষ হইতে সর্ব্বোচ্চ আনন্দময় কোষে উঠিতে হয় তাহারই উপায় এবং ঐ সকল বিষয়ের চিন্তা এবং অনুভূতি মুলক প্রক্রিয়া এবং অনুষ্টানের প্রয়োজনীয় মন্ত্র তন্ত্রাদি সকল লিখিত আছে। সুতরাং, যাহার যেটুকু উপকারে আসিবে না, তাহার, সেই সম্বন্ধে লিখিত মন্ত্রাদি পাঠে অথবা তাহার কোনরূপ অবৈধ অনুষ্ঠানে, ফল দেখা যায় না। বরং অনধিকারীর এই অবৈধ অধ্যয়ন জনিত যে যে বিষময় ফল ঘটিবার সম্ভব যাহা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি তাহাই ঘটিবে মাত্র। শূদ্র যখন কেবলমাত্র অন্নময় কোষেরই অধিকারী তখন তাহারা যদি কোন উচ্চকোষের বিহিত অনুষ্ঠান করিতে যান তাহা হইলে তাহার কোন উপকার না হইয়া সমুহ ক্ষতি

হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। কারণ, আমাদের শাস্ত্রোক্ত আত্মদৃষ্টি লাভের জন্য প্রাণায়ামাদি যে সকল অনুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা কোনরূপ বাহ্যিক প্রক্রিয়া নহে, উহা বিবিধ দেহাবৃত আত্মাকে বন্ধনোমুক্ত করিবার নিমিত্ত দেহাশ্রিত আত্মার শক্তি সমূহকে আত্মার বন্ধনোমুক্ত রূপ উন্নতির অনুকূলে সংস্থাপন করিবার প্রণালী বিশেষ। অর্থাৎ পঞ্চ বায়ু, দ্বাদশেন্দ্রিয় ও অহঙ্কারাদি যাহা কিছু সমস্তই এরূপ আয়ত্ব করিতে হইবে যাহাতে সকলেই, আত্মার বন্ধনোমুক্ত হইবার পথে, কোন বাধা না জন্মাইয়া বরং সাহায্য করিতে উদ্যোগী হয়। সুতরাং যদি প্রকৃত অধিকারানুসারেবৈধ অনুষ্ঠান দ্বারা সে পথে অগ্রসর না হওয়া যায় তাহা হইলে দেহের ও মনের নানারূপ বিশৃঙ্খলা হইয়া সর্ব্বনাশ হইবার বিশেষ সম্ভব। সেই জন্যই সর্ব্বদা ঋষিরা অধিকারী নির্ণয় করিয়া যাহার যতটুকু প্রয়োজন তাহাকে ততটুকুই অধ্যয়ন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। এবং পাছে দুর্ব্বল মানব অবৈধ অনুষ্ঠান দ্বারা নিজের সর্ব্বনাশের পথ সহজে উন্মুক্ত করিয়া দেয়, এই জন্য অনধিকার চর্চ্চায় বিশেষ শাস্তির বিধান করিয়া গিয়াছেন। এরূপ প্রকৃত কল্যাণার্থীদেরও যদি আমরা অযথা নিন্দবাদ ও ভৎর্সনা করিয়া কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করি তাহা হইলে আমাদের ন্যায় নীচ অধম জাতি জগতে বিদ্যমান আছে কিনা সন্দেহ।

অনেকে বলিয়া থাকেন, যে, যদি পূর্ব্বকালীন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের প্রণিত শাস্ত্রাদি শূদ্রাদিগণকে "অধ্যয়ন" করিতে অনুমতি করিতেন তাহা হইলে শূদ্রেরা এত ধর্ম্মহীন মুর্খ হইত না। কেন না এখন দেখা যায় অতি বর্ব্বর জাতিদিগকে অল্পে অল্পে শিক্ষা দিলে সময়ে তাহারাও জ্ঞান লাভে সমর্থ্য হইয়া থাকে। যেমন অধুনায়েচ্ছাধিকারে সর্ব্বজাতি নির্ব্বিশেষে সমান শিক্ষা (বিলাতি) দেওয়ায় শূদ্রেরাও বিলাতি শিক্ষায় ব্রাহ্মণের সমকক্ষ এমন কি অনেক স্থলে উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইত্যাদি।

যাঁহারা আমাদের এই মনুসংহিতা শীর্ষক প্রবন্ধটি আদ্যপান্ত পাঠ করিয়া আসিতেছেন আমাদের বিশ্বাস তাঁহারা কদাচ এ ভ্রমে পড়িবেন না। কেননা, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে বর্ত্তমানের শিক্ষা অথবা অধ্যয়নের যেরূপ প্রণালী ও উদ্দেশ্য পুরাকালে সেরূপ ছিল না। তখন কেবল আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের জন্যই অধ্যয়নের অথবা শিক্ষাদির প্রথা ছিল। এখন যেরূপ উদ্দেশ্যে শিক্ষা ও অধ্যয়ন প্রচলিত এরূপ উদ্দেশে ও প্রণালীতে আচণ্ডাল সর্ব্বজাতি অনায়াসে বেদ হইতে তন্ত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিতে পারেন। শাস্ত্র তাহাতে কোন আপত্তিই করিবেন না। শাস্ত্র কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতিপ্রার্থীদিগের জন্য এত অধিকারীর বিচার করিয়াছেন। আবার এমনও অনেকে বলেন যে ব্রাহ্মণেরা নিজ প্রভুত্ব হানির ভয়ে ভীষণ কটোর আজ্ঞায় শূদ্রাদি জাতিদের বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে নিষেধ করিয়াছেন এবং যদি কেহ তাঁহাদের আজ্ঞা অবহেলা করিয়া শাস্ত্রাদি অধ্য-

য়ন করিত তাহা হইলে তাঁহারা নানাবিধ অত্যাচার দ্বারা উহাদের শাসন করিতেন। কেবল শূদ্রদের ক্রীতদাসের ন্যায় রাখিবার জন্য এবং তাহাদিগকে আপনার কার্য্যে লাগাইয়া স্বার্থসিদ্ধির মানসে এরূপ জঘন্য ব্যবহার করিতেন। যেখানে ক্ষত্রিয় রাজা, বৈশ্য বানিজ্যশীল ধনী, শূদ্রেরাও যে সাংসারিক সম্বন্ধে অতি অল্প ক্ষমতাবান ছিল তাহাও বোধ হয় না, কারণ গুহক চণ্ডাল জাতীয় হইয়াও বহুধন-জন-পারিষদে পরিবেষ্টিত ছিল, সেখানে স্বল্প সংখ্যক বনবাসী ফল মুল আহারী দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিসের বলে এত ভীষণ অত্যাচার করিতে সক্ষম হইত, ইহাও এক অদ্ভুত রহস্য বটে। লক্ষ লক্ষ সৈন্যের অধিপতি প্রবলপরাক্রান্ত রাজা সকলত এই অত্যাচারী মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণগণকে চূর্ণ বিচূর্ণিত করিতে সক্ষম হইতেন। তখন রাজগণ বর্ব্বর অথবা গণ্ডমূর্খ ছিলেন না, অধিকাংশ রাজাই বুদ্ধি ও জ্ঞানে সুসোভিত ছিলেন, জনকাদি রাজর্ষিগণ তাহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। তবে কেন দরিদ্র ব্রাহ্মণেরা আধিপত্য করিত।

আর ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত যে বেদাদি যাবতীয় শাস্ত্র ব্রাহ্মণদের দ্বারা রচিত। কোন শূদ্রই একখানিও শাস্ত্র রচনা করেন নাই। ইহা যদি সত্য হয় তবে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, ব্রাহ্মণেরাই কেন শাস্ত্র লিখিতে সক্ষম হইলেন? শূদ্রেরাও কেন তাঁহাদের মনমত শাস্ত্র রচনা করিয়া ব্রাহ্মণদের সেই শাস্ত্রাধ্যয়নে নিষেধ বিধি করিলেন না? সকল জাতি যখন একই ঈশ্বরের সৃষ্ট তখন মনুষ্য মাত্রেরই বুদ্ধি বৃত্তি একরূপ হওয়াত উচিত, কিন্তু তাহা না হইয়া এরূপ বিভিন্নতা হয় কেন? তবেই স্বীকার করিতে হয় যে ব্রাহ্মণেরা কোন পূর্ব্বার্জ্জিত ক্ষমতা বলে অথবা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে সাধারণাপেক্ষা বিশেষ বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। যদি বলেন ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা অধ্যাত্ম চর্চ্চা করিতেন বলিয়াই এত আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়াছিলেন। শূদ্রেরাও কেন অধ্যাত্ম চর্চ্চা করিতেন না? আধ্যাত্মিক উন্নতি অতি সঙ্গোপনে হৃদয়ের মধ্যে করিতে হয়। ব্রাহ্মণেরা না হয় বাহিরে তাহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে দেখিলে অত্যাচার করিতেন। অন্তরের মধ্যে ত আর তাঁহারা প্রবেশ করিতেন না। অন্তর্জ্জগতে উন্নতির বাধা জন্মাইতে কাহারও সাধ্য নাই। তবে কেন শূদ্রেরা এত হীন হইল?

আর দেখুন ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদিগকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে দিতেন না বলিয়া অত্যাচারী কি করিয়া হইলেন? তাহাদের যত্নে ও সাধনার অর্জ্জিত সম্পত্তি তাঁহারা যদি অপাত্রে প্রদান করিতে ইচ্ছুক না হন অথবা সেই সমস্ত যত্নে অর্জ্জিত সম্পত্তি অন্যায় রূপে অন্য কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে দেখিলে অন্যায় ব্যবহারকারীকে শাসন করিতেন, এই বলিয়া "অনুদার" হইতে পারেন অত্যাচারী হইলেন কিরূপে? চোরকে যদি শাসন করা কর্ত্তব্য কার্য্য হয় ব্রাহ্মণের অমূল্য জ্ঞান রত্নের অপহরণ ও অপব্যবহারকারীকে শাসন করাও সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। ক্রমশঃ
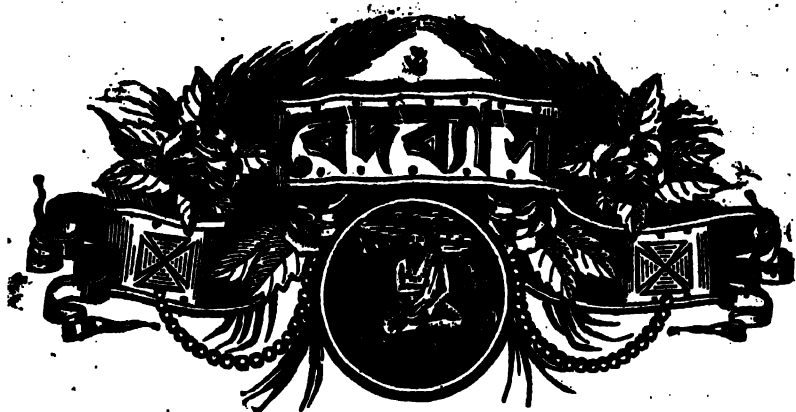
২য় ভাগ। ১২৯৪ সাল। ৩য় খণ্ড।

পাপ।

পাপ ত্রিবিধ, বাচনিক, কায়িক ও মানসিক।

পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব, পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধ প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাৎ চতুর্ব্বিধং॥

মনু।

অর্থাৎ

অপ্রিয়ভাষণ, অসত্যকথন, পরোক্ষে অন্যের নিন্দাঘোষণ, এবং নিরর্থক বাচালতা, এই কয়টী বাচনিক পাপ। টীকাকার "অসম্বদ্ধ প্রলাপশ্চ" এই পদের একটু সূক্ষ্ম অর্থ করিয়াছেন। "সত্যস্যাপি রাজদেশ পৌর-বার্ত্তাদের্নিষ্প্রয়োজনং বর্ণনং।" অর্থাৎ অমুক দেশের রাজা বড় বিজ্ঞ, অমুক দেশ বড় উর্ব্বর, অমুক দেশের লোক বড় সাহসী প্রভৃতি কথা সত্য হইলেও নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং, ঐ সব কথায় সময় অতিবাহিত করিলে বাচনিক পাপ করা হয়। গ্লাডষ্টোন বড় বক্তা, বিস্‌মার্ক্ বড় চতুর, এবার ইটালীর বড় বিপদ দেখিতেছি, প্রভৃতি যে সমস্ত খোস গল্প এখন প্রতি বৈঠক খানাকে অলঙ্কৃত করে, তাহাদের অধিকাংশই সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারে বাচনিক পাপ। যে সকল বিবরণ শ্রবণে বা কীর্ত্তনে ধর্ম্মবুদ্ধি উদ্দীপিত হয়, ও অধর্ম্মবুদ্ধি প্রশমিত হয়, কেবল সেই সমস্ত বিবরণ অথবা প্রসঙ্গই আলোচনা করা উচিত। নতুবা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কয় পুত্র ও কয় কন্যা, টমসন সাহেব তাঁহার স্ত্রীকে ভাল বাসেন কি না, পেজ সাহেব

কাছারীতে নিদ্রা যান কি না, প্রভৃতি প্রসঙ্গে আমাদের ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষ কোন প্রকার বর্গই সংসাধিত হয় না। সুতরাং, ঐরূপ অনাবশ্যক প্রসঙ্গ (Gossiping) পাপ মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য।

শারীর পাপ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,

"অদত্তানাং উপাদানং হিংসাচৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতং॥"

মনু।

অর্থাৎ

কায়িক পাপ তিন প্রকার; যথা অন্যায় পূর্ব্বক পরস্বাপহরণ, (যে কোন ভাবে) অশাস্ত্রীয় পশুহত্যা, এবং পরদার।

এইরূপে মানসিক পাপও ত্রিবিধ

পরদ্রব্যেষভিধানং মনসানিষ্ট চিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং॥

মনু।

অর্থাৎ

(১) কিরূপে অন্যায়পূর্ব্বক পরস্বাপহরণ করিব, (২) কিরূপে ব্রহ্ম-হত্যা, পরদার সুরাপান প্রভৃতি নিষিদ্ধাচরণ করিব, (৩) "পরলোক মিথ্যা" "আত্মা নাই, দেহই আছে" প্রভৃতি ভ্রান্ত মতে বিশ্বাস ও ধারণা এই তিন প্রকার মানসিক কর্ম্মকে মানসিক পাপ বলা যায়।

এই যে তিন প্রকার পাপের কথা উল্লিখিত হইল, ইহাদের মধ্যে বাচনিক পাপের শাস্তি বাচনিক, কায়িক পাপের শাস্তি কায়িক ও মানসিক পাপের শাস্তি মানসিক হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বাচনিক পাপে আসক্ত, তাহার স্বর অত্যন্ত কর্কশ ও শ্রুতিকটু হয়। কায়িক পাপের ফল কায়িক পীড়া, অঙ্গবৈকল্য ও অঙ্গবিকৃতি। মানসিক পাপের ফল মানসিক যাতনা ও মনোবিকার।

মানসং মনসৈবায়মুপভুঙক্তে শুভাশুভং।
বাচা বাচাকৃতং কর্ম্ম কায়েনৈব চ কায়িকং॥

"মানসিক শুভাশুভ কর্ম্মের ফল মনেই ভোগ করিতে হয়। এইরূপে বাক্যজ ও কায়জ কর্ম্মের ফল বাক্যে ও কায়ে প্রকটিত হয়।"

জড় জগতে কারণের সহিত কার্য্যের যেরূপ নিত্য সম্বন্ধ, নৈতিক

জগতে পাপের সহিত পাপোচিত শাস্তির সেইরূপ নিত্য সম্বন্ধ। পরদার প্রভৃতি কায়িক পাপের ফল প্রত্যহ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। যত দিন লম্পট, যৌবনের সীমা অতিক্রম না করে, তত দিন সে তাহার পাপের ফল ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, এবং তাহার বেশভূষাদির আধিক্য বশতঃ অন্যেও তাহার দুর্দশা দেখিতে পায় না। কিন্তু যৌবন সুলভ সামর্থ্যের একটু হ্রাস হইলেই লাম্পট্য বিষ নিজ বীভৎসতার পরিচয় প্রদান করে। অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণতা, শিরোঘুর্ণন, হস্তকম্পন, প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া আসিয়া ঐ লম্পটের শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাচনিক পাপের ফল ও কায়িক ফলের ন্যায় অবশ্যম্ভাবী। তুমি অন্যের নিন্দা করিয়া তাহার অনিষ্ট করিলে; কিন্তু একবার ভাবিলে না যে পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। পরের নিন্দা করায়, তোমার জিহ্বার যে কলুষতা জন্মিল, উহাতে যে তোমার কত সময়ে কত অপকার হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। অন্যের প্রতি কটু কাটব্য প্রয়োগ করিয়া তুমি তাহাদের অশেষ ক্লেশোৎপাদন করিলে; কিন্তু তোমার জিহ্বা ও স্বর কর্কশতা দোষে কলুষিত হওয়ায় তোমার যে কি অপকার হইল তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে না। আমার এক বন্ধু একটী স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা বালকদিগকে তিরস্কার করিতেন। এইরূপ করাতে তাহার জিহ্বা কর্কশ ও রূঢ় কথায় এরূপ অভ্যস্ত হইল, যে তিনি চেষ্টা করিয়াও কর্কশ ভাষা হইতে আপনাকে নিবৃত্ত করিতে পারিতেন না। তাঁহার পিতা, মাতা, বন্ধু, স্বজন সকলেই একে একে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তিনি ভৃত্য পাইতেন না, দাসী পাইতেন না, এমন কি ধোপা নাপিত ও তাহার দুষ্প্রাপ্য হইল। সর্ব্বশেষে তাহার পত্নী মনোদুঃখে আত্ম হত্যা করিলেন। কি আশ্চর্য্য তুমি অন্যের নিন্দা করিতেছ, মিথ্যা কহিতেছ, কর্কশ ভাষায় অন্যের প্রতি কটু কাটব্য প্রয়োগ করিতেছ এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিয়া কত রাজা কত উজীর মারিতেছ; কিন্তু একবার বুঝিয়া দেখিতেছ না, যে ঐ সমস্ত কুকার্য্য দ্বারা কি ভয়ানক বিষ অলক্ষিত ভাবে তোমার দেহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। একবার গ্লাডষ্টোন একজন বীণাবাদককে ক্রিকেট খেলিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বীণাবাদক উত্তর করিলেন—"আমি ক্রীকেট খেলিলে আমার বার্ষিক ৫০,০০০ হাজার টাকা ক্ষতি হইবে। আমি একণে বীণা বাজাইয়া

৫০,০০০ হাজার টাকা উপার্জ্জন করি। ক্রীকেট খেলিলে আমার হস্তের এই বীণানৈপুণ্য থাকিবে না।" হস্ত সম্বন্ধে যে কথা জিহ্বা সম্বন্ধেও তাহাই। যে সর্ব্বদা কু কথা কয়, সে আপন স্ত্রী পুত্রকেও মিষ্ট সম্ভাষণ করিতে পারে না। জিহ্বা যন্ত্রের সদ্ব্যবহার আর তাহার আয়ত্ত থাকে না। আহা এই জিহ্বার সদ্ব্যবহারে পশু পক্ষী মুগ্ধ হয়। যে দুর্বৃত্ত অন্য কিছু মানে না, তাহাকেও জিহ্বার সদ্ব্যবহার দ্বারা বশ করা যায়। এই জিহ্বা সর্ব্বদা সৎ প্রসঙ্গে রত থাকুক, সর্ব্বদা সুবাক্য কহুক, সর্ব্বদা সুপুস্তক পাঠ করুক, সর্ব্বদা দেব দ্বিজে স্তুতি করুক। তাহা হইলে তুমি ইহকালে সর্ব্বলোকের প্রিয় হইবে এবং পরকালেও অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবে। পরন্তু এই মহাযন্ত্রের কুব্যবহারে তোমার নিজের ও অন্যের কেবল দুঃখ রাশি পরিবর্দ্ধিত হইবে। যাহাতে তোমার নিজের ও অন্যের দুঃখ বর্দ্ধিত হয় তাহা যে পাপ তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকিতে পারে না।'

এইরূপে যখন আমরা কোন দুশ্চিন্তা করি, তখন আমরা এই বলিয়া আপনাকে আপনি প্রবোধ দেই—"যে ইহাতে আর দোষ কি? আমরা ত আর কাহারও কোনও অনিষ্ট করিতেছি না।" আমরা কাহার অনিষ্ট করিতেছিনা সত্য, কিন্তু আমরা আমাদের নিজ নিজ সুমহৎ অমঙ্গল সংসাধন করিতেছি। আমাদের মনও একটী সুবিন্যস্ত, সুরচিত বাদ্যযন্ত্র সদৃশ। অতি সাবধানে অতি সন্তর্পণে ইহার তাল মান লয় রক্ষা করিতে হয়; যদি ইহাতে যাহা ইচ্ছা তাহাই বাজাও, তাহা হইলে ইহার অপূর্ব্ব কোমলতা অভাবনীয় মাধুরী প্রভৃতি সমস্ত সদ্গুণ হারাইবে। যে পবিত্র মৃদঙ্গে হরিসঙ্কীর্ত্তন নিনাদিত হইবে, তাহাতে যদি সদা সর্ব্বদা বারবিলাসিনীর নর্ত্তনোচিত আড্ খেম্‌টা বাজান যায় তাহা হইলে তাহার কি দশা হয়? অতএব সাবধান, পবিত্র ব্যবহার দ্বারা পবিত্র বস্তুর পবিত্রতা রক্ষা কর। পবিত্র গঙ্গোদকে দেবতার পদধৌত কর। উহা লইয়া কুক্কুর বিড়ালকে অভিষিক্ত করিবে কেন? বাচনিক কায়িক ও মানসিক পাপে পরজন্মে কি কি শাস্তি তাহাও হিন্দুর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্॥

অর্থাৎ

কায়িক পাপে মনুষ্য স্থাবর যোনি প্রাপ্ত হয়। বাচনিক পাপে মনুষ্য

পশুপক্ষী যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। এবং মানসিক পাপে মনুষ্য অন্ত্যজাতিতে অর্থাৎ চণ্ডালাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করে।

ইহার মধ্যে এক গূঢ় নৈতিক রহস্য আছে। যেন কর্ম্মফল প্রদাতা ঈশ্বর শারীর পাপাসক্ত ব্যক্তিকে বলিতেছেন।—"হে মনুষ্য তোমাকে দেহযন্ত্ররূপ যে অধিকার প্রদান করিয়াছিলাম, তাহার তুমি অপব্যবহার করিয়াছ। সুতরাং তুমি আর ঐ অধিকার লাভ করিবার উপযুক্ত নহ। অতএব তোমাকে ঐ অধিকার হইতে চ্যুত করিলাম। এ জন্মে তোমার একটা শরীর থাকিবে, কিন্তু তাহা লইয়া তুমি সুকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম কিছুই করিতে পারিবে না। তুমি বৃক্ষযোনিতে জন্মলাভ করিবে।"

এইরূপে যে ব্যক্তি বাচনিক পাপে আসক্ত ছিল তাহাকে যেন ঈশ্বর বলিতেছেন—"হে দুর্ভাগ্য মনুষ্য! তোমাকে যে মোহন বাক্যযন্ত্রের অধিকারী করিয়াছিলাম তুমি সে যন্ত্রের অত্যন্ত অপব্যবহার করিয়াছ। এবার আর তোমাকে ঐ যন্ত্রের অধিকারী করা হইবে না। তোমার শরীর থাকিবে, তুমি সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম প্রভৃতির অধিকারী থাকিবে, কিন্তু তোমার জিহ্বা বাক্য নিঃসারণে অশক্ত হইবে, অর্থাৎ তুমি তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম লাভ করিবে।" যে মানসিক পাপে পাপী তাহাকে যেন ঈশ্বর বলিতেছেন—"হে দুর্ব্বৃত্ত! তোমাকে মনরূপ যে সুমহৎ অধিকার দিয়াছিলাম, তাহার তুমি কি কুব্যবহার করিয়াছ। এ জন্মে তোমার কর্ম্মে ও বাক্যে অধিকার থাকিবে; কিন্তু তোমাকে আর মনস্বিতা দিব না। অর্থাৎ তুমি চণ্ডালাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করিবে।"

দেখুন আমরা ইন্দ্রিয় দেহ মন প্রভৃতি যে সমস্ত অধিকার ভোগ করিতেছি, সুব্যবহার করিলে আমরা ঐ সমস্ত পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারিব। নতুবা ঈশ্বর আমাদিগকে ঐ সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন।

এক্ষণে পাপ পুণ্য সম্বন্ধে দুই তিনটী জটিল ও অত্যাবশ্যক প্রশ্নের অবতারণা করা যাইতেছে।

১ম। পাপ কাহাকে বলে? পাপের লক্ষণ যাহা যাহা ইংরেজীতে নির্দ্ধারিত আছে, তাহার যথাযথ বিচার করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র বুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে একরূপ দুঃসাধ্য। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম পাপ কাহাকে বলে? আপনি তাহাতে উত্তর করিলেন—"Categorical imperative "অথবা" The greatest evil of the greatest number.'

আপনার উত্তর আমার প্রশ্নের অপেক্ষা কঠিন। যৎকালে আমার ভ্রাতা কথামালা পড়িতেন, তৎকালে কথামালার একখানি অর্দ্ধপুস্তক আমার হস্তে পড়িয়াছিল। তাহাতে দেখিয়াছিলাম।

বাঘ—অর্থে শার্দ্দূল

হাড়—অর্থে অস্থি ইত্যাদি

ইংরাজী দর্শনের সমস্যা আমাদের পক্ষে অনেক সময়ে ঐরূপ।

মিথ্যা কথা কহা উচিত কি না, ইহা জানিতে হইলে যদি আমাকে সমস্ত পৃথিবীর কথা জানিতে হয়, তাহা হইলে বড়ই বিপদ। এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারগণের উপদেশ অতি সহজ, এবং উহা সহজেই প্রতিপাল্য।

বিহিত কর্ম্মজন্যো ধর্ম্মঃ। নিষিদ্ধ কর্ম্ম জন্যস্ত ধর্ম্মঃ।"

অর্থাৎ "শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতিতে যাহার পক্ষে যে কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহা করাই পুণ্য ও শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম করাই পাপ।" এই উপদেশ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কি না, তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই উপদেশের এক মহদ্‌গুণ এই যে ইহা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। পাপের তালিকা মনুর একাদশ অধ্যায়ের ৫৫-৭১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২য়। পাপের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? খ্রীষ্টানেরা এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন না। অক্সফোর্ড মিসনের জেম্‌স সাহেবের সঙ্গে একবার এ বিষয়ে আমার আলাপ হইয়াছিল। তাহাতে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন "আমরা এ কথায় উত্তর দিতে পারি না।" সাধারণ খ্রীষ্টানেরা শয়তানকে পাপের স্রষ্টা বলেন। কিন্তু ইহা নিতান্ত অগ্রাহ্য কথা। কেন না সৃষ্টিকর্ত্তা এক জন ইহা খ্রীষ্টানেরা নিজেই বারম্বার স্বীকার করিয়া থাকেন। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে পাপের সৃষ্টি এইরূপে বর্ণিত আছে।

"ধর্ম্মগুনোগুনো ধর্ম্মপথোহস্য পৃষ্ঠং।"

"পরাভুতেরধর্ম্মস্ত তমসশ্চাপি পশ্চিমঃ॥"

ভাগবত

"ব্রহ্মা যে বিরাট পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বিরাট পুরুষের বক্ষ দেশ ধর্ম্ম ও পৃষ্ঠ দেশ অধর্ম্ম দ্বারা নির্ম্মিত। যে অধর্ম্ম পরাভবের কারণ এবং যাহা অবিদ্যাময়, তাহা বিরাট পুরুষের পৃষ্ঠদেশ।" ধর্ম্মের পশ্চাভাগে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সম্মুখে ধর্ম্ম ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ আমার বোধ হয় এই। পাপ ও পুণ্য এই দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু নহে। ইহার একটীর

সহিত অন্যটী এমন গ্রথিত আছে যে উহারা উভয়ে পরস্পর পরস্পরের নিত্য সহচর। দেবোচিত প্রণয়ের সহিত পাশব কামের নিত্য সম্বন্ধ এ তত্ত্বের দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা যে সমস্ত পাপ দেখিতে পাই, তাহাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে সঙ্গে এক একটী পুণ্য কার্য্যও দেখিতে পাইব। এবং ঐরূপে পুণ্যের সহিত পাপের নিত্য সম্বন্ধ সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অমিশ্র পাপ ও অমিশ্র পুণ্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে দেখিতে পাইবেন না। আবার অন্ত দৃষ্টিতে পাপ পুণ্য বলিয়া কোন বস্তু নাই। উদ্দেশ্যও অবস্থা ভেদে পাপ পুণ্যের বিচার হইয়া থাকে।

৩য়। পুণ্যময় ঈশ্বর পাপের সৃষ্টি করিয়াছেন কেন? ইংরাজী শাস্ত্রে এ প্রশ্নের উত্তর নাই। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে পাপ, সৃষ্টির এক প্রধান উপকরণ। পুত্রোৎপাদন ব্যতীত সৃষ্টি রক্ষা হয় না। কিন্তু পুত্রোৎপাদনের জন্য কাম প্রভৃতি পাপ রিপুর প্রয়োজন। ব্রহ্মা সৃষ্টির জন্য প্রথমে সনক, সনন্দ, সনাতন সনৎকুমার এই চারি জনকে সৃষ্টি করেন। ইহারা অত্যন্ত পবিত্র স্বভাব ছিলেন! ব্রহ্মা ইহাদিগকে সৃষ্টি বিস্তার করিতে বলিলেন।

তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ
তন্নৈচ্ছন্ মোক্ষধর্ম্মাণো বাসুদেব পরায়ণাঃ। ভাগবত।

"ব্রহ্মা তাহাদিগকে প্রজা সৃজন করিতে বলিলেন। কিন্তু তাহারা মোক্ষধর্ম্মী ও কৃষ্ণপরায়ণ ছিলেন। এজন্য প্রজা সৃজনে তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না।" অবিদ্যা, অহঙ্কার, মোহ, প্রভৃতি পাপ প্রবৃত্তি না থাকিলে সৃষ্টি চলে না। যাহার মোহ নাই সে কি কখন আত্মজীবন বা পুত্র কন্যাদির জীবনের জন্য যত্নবান্ হইতে পারে। ফলতঃ সৃষ্টির জন্য পুণ্যের (সত্ব গুণের) যেরূপ প্রয়োজন, পাপের ও (তমোগুণের) সেইরূপ প্রয়োজন। সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সমাবেশ ব্যতিরেকে সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদিত হয় না। পাপ থাকুক, কিন্তু পাপের প্রশ্রয় দেওয়া নিষিদ্ধ। ঐ বিরাট পুরুষের ন্যায়, তোমারও পৃষ্ঠ দেশে পাপ আশ্রয় গ্রহণ করুক। পাপ উহার কার্য্য করুক। তুমি উহার প্রতি নয়ন মন অর্পণ করিও না। ধর্ম্মের দিকেই তোমার দৃষ্টি থাকুক। পাপের প্রয়োজন যত টুকু, তুমি ততটুকুর সাহায্য লইয়া অবশিষ্টের প্রতি তুমি অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রদর্শন কর। পাপ অথবা তমোগুণ একেবারে পরিহার

করা অসম্ভব। যতক্ষণ ব্রহ্মা কেবল সত্ত্ব গুণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ততক্ষণ সৃষ্টি কার্য্য বন্ধ ছিল। সত্ত্বের সহিত তমঃ মিশ্রিত হওয়ায় সৃষ্টি সঙ্ঘটিত হইল। আরও এক কথা। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সৃষ্টি ও সংহার একই সূত্রে গ্রথিত। যদি সৃষ্টির সময়ে সময়েই পাপ না থাকিত, তাহা হইলে পরে কখনই সৃষ্টির সংহার হইত না। সংহারের জন্য সৃষ্টির প্রথম হইতেই সৃষ্টির সহিত পাপ অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে।

৪র্থ। খ্রীষ্টানেরা বলেন যে তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা পাপকে বড় ভয় করেন। তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করেন। হিন্দুরা ধন ধান্যাদির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, কিন্তু পাপ মুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করে না।” ইহা মিথ্যা কথা, নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রার্থনা দেখিলেই বুঝা যাইবে; যে হিন্দুরা পাপ ভীত।

ক। “পাপোঽহং পাপ কর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপ সম্ভবঃ
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্ব পাপ হরো হরি।”

খ। দুর্গতাং স্ত্রায়সে বিষ্ণো যে স্মরন্তি সকৃৎ সকৃৎ।
সোঽহয়ং দেবাতি দুর্ব্বৃত্তঃ ত্রাহিমাং শোক সাগরাৎ॥

বাহুল্য ভয়ে আর অধিক শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল না।

সাধু-দর্শন।

(২য় ভাগ ১ম সংখ্যার পর।)

(এবার হইতে স্বামীজী আমাদিগকে কথাবার্ত্তার ছলে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলে বাঙ্গালায় তাহার সারমাত্র প্রকাশ করিব)।

স্বামীজী। আপনি যাহা বলিলেন তাহা বড়ই সত্য। কেবল বাঙ্গলা দেশেই যে এরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহা নহে ভারতের সর্ব্বস্থানেই প্রায় এইরূপঅবস্থা দেখা যায়। আমাদের আশ্রমের নিয়মানুসারে সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণে বিধি আছে, সুতরাং ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বদেশেই আমাদের যাইতে হয়। অধুনা হিন্দু সমাজের যে কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে ভাবিলে শরীর অবসন্ন হইয়া যায়। আমরা কিছুদিন পূর্ব্বেই যে সমস্ত স্থানে সন্ন্যাসী বলিয়া বহু সমাদরে আদৃত হইয়াছি সেই সমস্ত স্থানেই আবার এখন

সন্ন্যাসী মাত্রকেই ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে। সে প্রকার রুচিই যেন আর নাই। যেদেশে সাধু সজ্জনগণ সম্যক প্রকারে সম্মানিত না হন সেদেশের ধ্বংশ অতি সন্নিকট। আর যে আপনি কর্ণেল আলকাটের কথা বলিলেন, ঐ ব্যক্তিই আমার নিকট কিছু দিন অতিত হইল আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার অনেক আলোচনা হয়। তাহাতে আমি অনেক নুতন কথা ও নুতন আশা শুনিতে পাইয়াছি। বাঙ্গলা দেশে এই আলকাট সাহেবের চেলা কিরূপ বাড়িতেছে?

আমি। প্রথমে যখন আলকাট সাহেব ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন তখন শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহার উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া বড়ই উৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং দলে দলে অলকাটের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর সেরূপ আগ্রহ দেখা যায় না। বাঙ্গালীর সকল কার্য্যেরই গতি এইরূপ। কিন্তু সাহেবের উদ্যম কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। আমাদের উভয়ের এইরূপ বার্ত্তালাপ হইতেছে এই সময় একজন ভদ্র বেশধারী হিন্দুস্থানী উপস্থিত হইয়া বন্দনা পূর্ব্বক বলিলেন, "স্বামীজী মহারাজ! রাণি মা আপনাকে প্রণাম জানাইয়া আপনার শারীরিক সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন।"

স্বামীজী। রাণি মাইকো হামারা আশীর্ব্বাদ দেকর কহো। (আমাকে লক্ষ্য করিয়া) ইয়ে বাঙ্গালী বাবু হামারা বড়ে প্রেমিক হায়, রাণিজীকোভি ইয়ে বাঙ্গালীকে সাৎ প্রেম করনে হোগা।"

আগন্তুক পুনরায় বন্দনা করিয়া এই সংবাদ লইয়া চলিয়া গেল। আমি স্বামীজীর অদ্ভুতরূপ বাক্য শুনিয়া অবাক হইলাম। মনে মনে করিলাম যে রাণিমা না জানি স্বামীজীর এ কথা শুনিয়া কতই লজ্জিত হইবেন। একজন রাজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোককে বলা হইল "বাঙ্গালীকে সাৎ প্রেম" করিতে হইবে। আমাদের পাপ মন, তাহাই বক্র ভাবই মনে আসিল; কিন্তু স্বামীজী অকপট ও নির্ভিক হৃদয়ে কেমন মধুমাখা ভাবে অনুরাগের সহিত কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন। পবিত্র বাক্যের পবিত্র ব্যবহার দেখিয়া হৃদয়ে কত আনন্দ হইল। আর হতভাগ্য বাঙ্গালী এই "প্রেম" শব্দের কি অপব্যবহারই করিয়া থাকে। আমি এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় স্বামী বলিতে লাগিলেন,—ইহাকে (রাণিকে) আপনি জানেন না। ইনি দক্ষিণ দেশের শ্রী—রাজার স্ত্রী, এখন বিধবা, পরম ধার্ম্মিকা, আলাপে আপনি বড়ই সুখী হইবেন। রাণিমা প্রায়ই

আমার নিকট আসিয়া থাকেন; সুতরাং আপনার সহিত একদিন দেখা হইবে। স্বামীর কথা শেষ হইবামাত্র একজন দীনবেশধারী অতি শান্ত মূর্ত্তি হিন্দুস্থানী আসিয়া দাঁড়াইল। অমনি স্বামীজী আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন; বাবু! এই ব্যক্তি আমার অত্যন্ত প্রেমিক। ইহাঁর সহিত "বহুৎ বহুৎ" প্রেম করিতে হইবে। আমি সাধনাবস্থার প্রচণ্ড শীতের সময় বিবস্ত্রে অনাহারে যখন গঙ্গাতীরে শয়ন করিয়া থাকিতাম, এই ব্যক্তিই তখন অতীব অনুরাগের সহিত আমার নানারূপ সেবা শুশ্রূষা করিতেন। উনি আমার ধর্ম্ম পথের পরম সহায়, সুতরাং আমার পরম মিত্র। অভ্যাগত ব্যক্তি সসম্ভ্রমে কিছু অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া পড়িল এবং সজল নয়নে স্বামীজীর প্রতি অবলোকন করিয়া নিজ জীবনের অসারত্ব ব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। স্বামীজী! এই ত হিন্দু সমাজের অবস্থা, এ অবস্থায় কি করিয়া আত্মরক্ষা করিব? এখনই ত একরূপ আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি, সুতরাং আত্মজ্ঞান কি উপায়ে পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারি তাহার উপায় বলিয়া না দিলে আমাদের ন্যায় অগতির গতি নাই।

স্বামীজীর সকল কথাতেই হাঁসি, হাঁসিয়া বলিলেন,—ভয় নাই, সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ লাভ ও সাধুগ্রন্থাদি অধ্যয়ন দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা লাভে যত্নশীল হও। চিত্তের একাগ্রতা হইলে সমস্তই সম্ভব জানিবে। কিন্তু চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রপাঠ ব্যতিত অন্য উপায় নাই। যোগীই বল, পরমহংসই বল, সকলকেই প্রথমে সাধুসঙ্গরূপ পবিত্র সেতু পার হইতে হইয়াছে। সাধুর বেশধারী অভ্যাগত ব্যক্তিমাত্রকেই সাদরে সৎকার করিবে। অনেক ভণ্ড সাধুরবেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে, সুতরাং সাবধানের সহিত সাধুবেশধারী পথিকগণকে সৎকার করা কর্ত্তব্য। ভণ্ড সন্দেহ করিয়া অতিথি সৎকারে বিরত হইও না। যদি কখন ভণ্ডের দ্বারা বঞ্চিতও হও তথাপিও অথিতি সৎকারে বিরত হইবে না; কারণ, সাধুভক্তি থাকিলে একদিন না একদিন তোমার গৃহে প্রকৃত সাধুর সমাগম হইতে পারিবে। কিন্তু তুমি যদি সাধুবেশধারী মাত্রকেই ভণ্ড বলিয়া তাড়াইয়া দাও তবে হয়ত একদিন প্রকৃত সাধুকেও চিনিতে না পারিয়া ভণ্ড জ্ঞানে বিদূরিত করিবে। সাধুদিগের সঙ্গে ক্ষণকাল সহবাস না করিলে কিছুতেই তাঁহাদের চিনিতে পারা যায় না। তাই বলিলাম, সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই

যথাসাধ্য সৎকার করিয়া তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিবে। যদি তোমার অকপট সেবা দ্বারা এইরূপ অজ্ঞাত সারেও কোন একজন প্রকৃত সাধুর সন্তোষভাজন হইতে পার, তাহা হইলে তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে। বহু জন্ম তপস্যার দ্বারাও তুমি যাহা না করিতে পারিবে সাধুর কৃপা হইলে স্বল্প কাল মধ্যে তাহা সম্পন্ন হইয়া যাইবে। সুতরাং সাধু সেবায় কদাপি অবহেলা করিও না।

সাধু সহবাসে মহাত্ম্য আমি একমুখে বর্ণন করিতে অক্ষম। একমাত্র সাধু সহবাসে পশুও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। সেই জন্য ঋষিগণ শাস্ত্রে নানাভাবে সাধু সহবাস এবং সাধুদিগের আচরিত পথের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ এই অধর্ম্ম-প্রধান কলিযুগে দুর্ব্বল মানবের অধঃস্রোতস্বিনী বৃত্তির আধিক্য বশতঃ চিত্তের একাগ্রতা লাভ একরূপ অসম্ভব। শাস্ত্রোক্ত প্রকৃত অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের একাগ্রত লাভ করিতে হইলে দুর্দ্দমনীয় বৃত্তি সমূহকে নিরোধ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতি করিতে হইবে। (প্রাণাদিবৃত্তি, মানসবৃত্তি, অভিমান বৃত্তি, বুদ্ধি-বৃত্তি, প্রকৃতি-বৃত্তি এই পঞ্চপ্রকার বৃত্তি নিরোধ করিয়া স্বরূপে অবস্থান করার নাম প্রকৃতবৃত্তি নিরোধ) সুতরাং এরূপ কঠোরতম তপস্যা এ কলিযুগের সাধনবিহীন সংসারির একান্ত অসম্ভব। কিন্তু এক সাধু সহবাস দ্বারা সাধুমহাত্ম্যে ক্রমে সকল প্রকার নিরোধশক্তি আপনাপনি উপজিত হইতে থাকে এবং সময়ে ঈপ্সিত ফল লাভে সমর্থ হওয়া যায়। শাস্ত্র বারম্বার এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

আমি। সাধুবেশধারী দেখিলেই কি তাহাকে সাধুজ্ঞানে পূজা করিব? তাহাতে কি ভণ্ডের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না?

স্বামী। সাধুর লক্ষণ দেখিয়া সাধু চিনিতে শিক্ষা করিবে। শাস্ত্রে অতি বিশদরূপে সাধুর লক্ষণ বর্ণিত রহিয়াছে। অদ্য আমি তাহারই কথঞ্চিৎ আপনাকে বলিব। ক্রমশঃ।

কর্ত্তব্য জ্ঞান।

মানবগণ যখন যে অবস্থায় থাকুক না কেন, যদি আপন আপন কর্ত্তব্য বোধ থাকে, যদি কর্ত্তব্য পালনের অধিকার উপার্জ্জন করিতে বা সেই অধিকার স্থির রাখিতে চেষ্টা থাকে, আপনার উপর কোন ভার অর্পিত আছে অনুক্ষণ ইহাই পর্য্যালোচনা করিয়া যদি তদনুসারে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকে, তবে আর সংসারে কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় না। ধর্ম্ম-বিপ্লব, সমাজবিপ্লব, রাজ্যবিপ্লব প্রভৃতি লোলুপ রাক্ষসগণ মুখব্যাদান করিয়া সামাজিকগণকে আর গ্রাস করিতে পারে না। এই কর্ত্তব্যজ্ঞান বা তদনু-সারে কার্য্য করা যদি সংসারে প্রচারিত হইত, তবে এতদিন ধরাধাম স্বর্গের উজ্জল জ্যোতিঃ ধারণ করিত, পাপস্রোত এতদিন শুষ্ক হইত। দুই একটী উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। কর্ত্তব্যজ্ঞান শব্দটী দুই কথায় বলা হইল, তদনুসারে কার্য্য করা উচিত ইহাও সহজে বলা গেল, কিন্ত ব্যাপার বড় গুরুতর। কোন্ সম্প্রদায়ের কি কর্ত্তব্য, কিরূপে তাহার অনুষ্ঠান করিবে, তাহা স্থির করা তরল মতির পক্ষে কঠিন ব্যাপার। এরূপ অনেক সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়িক আছেন যাঁহারা নিজের কর্ত্তব্য বিষয় কি, কোন্ অধিকারে নিজে অবস্থিত আছেন, আদৌ তাহার অনুসন্ধান রাখেন না, গতানুগতিকের ন্যায় কেবল কালস্রোতে ভাসিতেছেন, ঘট নাচক্রে যেখানে উপস্থিত করায় সেই স্থানেই অম্পদ দাঁড়াইতেছেন।

যে বিষয়ের অবতারণা করিব বলিয়া এত কথা বলিলাম সংক্ষেপতঃ তাহার পরিচয় দিতেছি। আজ কাল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া চারিদিকে একটা হৈহৈ রৈরৈ পড়িয়াগিয়াছে। শিশুর মুখে, যুবার মুখে, প্রৌঢ়ের মুখে ধর্ম্মকথা বই আর কথা নাই। চারিদিক দেখে শুনে বুড়োরা এখন ধর্ম্মকথা ছাড়িয়া দিয়াছেন। কেনই বা না দিবেন, অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ হয়ত প্রপৌত্র বালককে ক্রোড়ে করিয়া "সাতে ভবতু" শিখাইতে বসিলেন, তিনি জানেন না যে প্রপৌত্র তাহার চৌদ্দ পুরুষের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ হইয়া বসিয়াছে। "সাতে ভবতু সুপ্রীতা" ত অতি লঘুতর বিষয় কতশত কূটস্থ চৈতন্য কত অধ্যাসবাদ, কত মনোবিজ্ঞান জড়বিজ্ঞান তাহার বিরাট শরীরের সাড়ে তিন কোটী নাড়ীর প্রত্যেক শোণিত বিন্দুতে মিশিয়া গিয়াছে।

জুবিলির সময় যেমন কলিকাতার সৌধ শ্রেণী আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল, প্রপৌত্রের শরীরও এখন তদ্রূপ নানাজাতীয় চৈতন্যমালায় বেষ্টিত। শঙ্করাচার্য্যের কূটস্থ চৈতন্য, কপিলের নিগুর্ণ পুরুষ, রামানুজের বিশিষ্ট-দ্বৈত, কত চৈতন্যের নাম করিব, তাহার শরীরের থাকে থাকে ঝুলিতেছে। ঋষিগণ-শাস্ত্রকারগণ প্রভৃতির উপদিষ্ট চৈতন্য, এখন চিত্তমধ্যে প্রকৃতরূপে জাগরূক হয় না, উহা কেবল বাহিরে বাহিরে থাকে, কেবল বকবাদের অনুকূল হইয়া একরূপ তোতাপাখি সাজায়। চৈতন্য হৃদয়ে ধারণা করিতে হইলে সদ্‌গুরুর অনুসরণ করিতে হইলে, তদুপদিষ্টমার্গে পদচারণ করিতে হইবে।

আমাদের সমাজের ভিত্তি বসিয়া গিয়াছে, স্তম্ভে ঘুণ লাগিয়াছে, কেবল বাহিরে থপ্‌ থপে চুণকাম করা, পচা কুম্‌ড়ার ন্যায় একেবারে অন্তঃসার বিহীন হইয়াছে। আর সময় নাই, এখন সমাজের কল্যাণকাঙ্ক্ষীদের উচিত অকপটভাবে মনের ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক, সামাজিক বিশৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়া, উপযুক্ত নায়ক বা চিকিৎসকের নিকট আনুপূর্ব্বীক রোগের বিবরণ বিজ্ঞাপন করেন। নতুবা তুলা রাশিস্থ বহ্নির ন্যায় সমাজ বিপ্লব ধীরে ধীরে একেবারে সমস্ত ভস্মসাৎ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, চৈতন্যহৃদয়ে ধারণ করিতে গেলে সদ্‌গুরুর অনুসরণ করিতে হয়, এই সদ্‌গুরুগণই আমাদের সমাজনায়ক বা ধন্বন্তরি চিকিৎসক। কিন্তু ভাগ্যদোষে এই সম্প্রদায়েরই লোক গতানুগতিকের ন্যায় কালস্রোতে বা ঘটনা-স্রোতে ভাসিতেছেন, এই সম্প্রদায়ের (গুরু সম্প্রদায়ের) অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সমাজবন্ধন ধর্ম্মবন্ধন্ ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া একরূপ অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে। যেদিন হইতে গুরু-সম্প্রদায় বিলাসি হইয়া কর্ত্তব্য বোধ হারাইয়াছেন পাঠকগণ নিশ্চয় জানিবেন সেইক্ষণেই সামাজিক রোগের সূত্রপাত।

সমাজের শীর্ষ স্থানীয় গুরু সম্প্রদায়ের অবনতিতেই আমাদের এত দুর্দ্দশা সংসাধিত হইয়াছে। গুরুর বলেই সমাজের বল। শাস্ত্র গুরুর মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন,—"গিরে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌরুষ্টে নকশ্চন" গুরু ক্রুদ্ধ হইলে আর নিস্তার নাই, দেখিলেন ঈশ্বর অপেক্ষা গুরুদের সামর্থ্য অধিক। নগুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ,—পরমার্থ বল, বা তপস্যা বল গুরুদেবের উপর কিছুই নহে! পাণিনির তাহাই

অপার বিস্তৃত সমুদ্রে পতিত হইয়া চিৎকার করিয়া বলে গুরুদেব রক্ষাকর আজ সমাজতরী বিশাল সাগরের উত্তালতরঙ্গে ভাসমানা, আর নিস্তার নাই, প্রতিকূল বায়ু (বৈধর্ম্মিদের ফাঁদ) যেরূপ বহিতেছে, তাহাতে অচিরাৎ কর্ণধারহীন তরী জলমগ্ন হইবে, গুরুদেব! আর নিস্তার নাই আর কতদিন নিদ্রিত থাকিবেন, জাগ্রত হউন, সমাজতরী রক্ষা করুণ।

নৌকার মাঝি হইতে হইলে কর্ণের (হাইলের) কাঁটা কি ভাবে ঘুরাইতে হয় প্রবল তরঙ্গে কি ভাবে নৌকা সোজা রাখিতে হয় তাহা শিখিতে হয়, উৎসাহ বাক্যে দাঁড়িদের হৃদয় উচ্ছসিত করিতে হয়, ছেলে বেলা হইতে মাঝিগিরি শিক্ষা করিলে পরিণামে একজন ভাল নাবিক হইতে পারে। এত গেল সামান্য মাঝি মাল্লা নৌকার কথা; আমাদের প্রস্তাবিত নৌকার মাঝির (গুরুদেবের) কালক্রমে কিছুই শিক্ষা করিতে হয় না, কেনই বা হইবে নৌকাচালনের ভার এখন দুরস্থ পদাতিক পথিকের উপর ন্যস্ত। তাঁহারা নৌকার নিকটেও না থাকিয়া দূর হইতে কেমন সুন্দর নৌকা চালাইতেছেন। অকুতোভয়ে বীরের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন, কেনই বা ভয় নিজের নহে মহাজনের মালের দাবি দাওয়া নাই, তবে আর ভয় কি? সজোরে ভেরী বাজাও, সামাজিক দাঁড়িগণ জোরে দাঁড় টানিবে নৌকাখানি একবার বাম ভাগে একবার দক্ষিণভাগে বা যে দিকে হয় চলিয়া যাউক, পদ্মার ঘোলায় পড়ুক তাহাতে ক্ষতিকার?

তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, শাস্ত্রকারদিগের ইহাতে কোন দোষ আছে। যে শাস্ত্রে গুরুদেবের উল্লেখ আছে তাহাতেই দেখিবেন তাঁহার শিক্ষার বিষয়, কর্ত্তব্য নির্ণয়, অধিকার প্রভৃতি সমস্তই অতি বিশদভাবে উপদিষ্ট আছে। সদ্‌গুরুর লক্ষণ কথা;

> শান্তোদান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
> শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবেশবান্॥
> আশ্রমী ধ্যান নিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্র বিশারদঃ।
> নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥
> উদ্ধর্ত্তুঞ্চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
> তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরু রুচ্যতে॥

অর্থাৎ

যে ব্যক্তি শান্ত দান্ত, অর্থাৎ যিনি অন্তরিন্দ্রিয়কে ও বহিরেন্দ্রিয়

চক্ষুরাদিকে জয় করিয়াছেন, যিনি কুলাচার রত, বিনয়ি, পবিত্রবেশ (শুভ্র বস্ত্রাদি) ধারি, পবিত্রাচার সম্পন্ন, সৎকার্য্য দ্বারা যশস্বী, পবিত্র, কার্য্যকুশল, সুবুদ্ধি, বর্ণাশ্রমবিহিত ঈশ্বরারাধনায় রত, স্তুতিনিন্দায় অচলচেতাঃ, সেই দিব্য পুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে। গুরুদেবের লক্ষণ অনেক স্থানে অনেক রূপ লিখিত আছে সমস্ত দেখাইতে হইলে প্রবন্ধটী অতি দীর্ঘ হইবে বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল। সংক্ষেপত ইহাই বলা যাইতে পারে যে গুরুদেব বলিলে যেমন একটী স্বর্গীয় পুরুষের ভাব এখনও লোকের মনে উদয় হয় ঠিক সেই ভাবটী যাহাতে রক্ষা পায় গুরুদেবের অবশ্য তাহা করা কর্ত্তব্য। গুরুদেব! মস্তকের সহস্রার পথে আপনার স্থান, আপনি শিষ্য নয়নে লোকাতীত দিব্য পুরুষের ন্যায়, সেই দেখা-দেখি সামাজিকের চক্ষেও ভাসমান; অতি গুরুতর ভার আপনার উপর অর্পিত রহিয়াছে, পাঠশালার গুরুমহাশয়ের অক্ষরের যেরূপ ছাঁচ, যেমন ছাত্রবৃন্দেরও ঠিক সেইরূপ অক্ষর হয়, যেমন শিক্ষকের জ্ঞান জ্যোতিঃ শিষ্যের হৃদয়ে চালিত হইতে থাকে, তদ্রূপ আপনার চরিত্র সমস্ত সমাজে অঙ্কিত হইবে, আপনি সকল কার্য্যের আদর্শ। শিষ্যের চরিত্র, সামাজিক গঠন সমস্তই আপনার দেখাদেখি হইবে। শিষ্যগণ যদি ধার্ম্মিক হয় সেটী আপনার সদুপদেশের ফল, যদি অসাধুচেতাঃ পাপী হয় সেটীও আপনার দোষ, অবশ্যই আপনি সেই পাপের ভাগী হইবেন; "তদ্বত শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুরাপ্নোতিনিশ্চিতং"; আপনি যে ভাবে চালাইয়াছেন শিষ্যগণ বা সমাজতরী সেই ভাবেই চলিতেছে, গুণ দোষের ভার সমস্তই আপনার উপর। আপনি নিদ্রিত থাকিলে চলিবে না; নিদ্রার কিরূপ ফল স্বচক্ষে অবলোকন করিতেছেন। এখন আর সে দিন নাই, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবেই হউক, বৈদেশিক সম্মিলনেই হউক, ঘটনাচক্রে বা কাল ক্রোড়েই হউক সামাজিকগণের মনোভাব এখন রূপান্তরিত হইয়াছে। কাজেই বলিতে কি গুরুদেব একরূপ উপহাসের পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। হায় কি দুর্দ্দিন, কি ভীষণ কাল, যে গুরুদেবের নাম শ্রবণ করিলে চিত্ত যেন এক অনির্ব্বচনীয় রসে পরিপ্লুত হইত, শরীর ভক্তি ভাবে রোমাঞ্চিত হইত, ক্ষণকালের জন্য পাপ সংসার যেন অদৃশ্য হইয়া পড়িত, সেই মাহাত্মার নামে আজ কত কথাই শুনা যায়। কত ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, হাসি, ঠাট্টা গুরুর উপর চলিতেছে। এ দোষ

কাহার ? গুরুদেবের না শিষ্যের ? আমি বলিব, শত সহস্র লক্ষ অনন্ত বার বলিব, অগ্রে গুরুর দোষ; পশ্চাৎ শিষ্যের। শিষ্য বিধর্ম্মি, অত্যাচারি, দুর্ম্মতি হইল, তখন গুরুদেব গর্ভস্রাব, পাষণ্ড ইত্যাদি কত শত মধুর বাক্য মিষ্ট ভৎসনা করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যে সময়শিষ্যের চিত্ত কুপথগামি হইতে প্রস্তুত হইয়াছে, তখন গুরুদেব কোথায় ? শিষ্যগণের চিত্তবৃত্তি কিরূপ হইতেছে, যে বীজ মন্ত্র কর্ণে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কতদূর অগ্রসর হইতে পারিতেছে, উন্নত উপদেশ দিবার সময় হইয়াছে কিনা এ সমস্ত কর্ত্তব্য বিষয়ের কি অনুসন্ধান হইয়া থাকে ? প্রতিবর্ষে বার্ষিক গ্রহণের সময় কি স্বেচ্ছায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে ? কখনই নহে তাহা হইলে সমাজের দশা কখনই এরূপ হইত না। গুরু-দেবও উপহাসের পাত্র হইতেন না। ভারতবর্ষ কোন দিন ধর্ম্মহীন হইবে না, ধার্ম্মিকের মান, সাধুর প্রতিষ্ঠা কোন দিন অন্তর্হিত হইবে না। আপনি নিজের কর্ত্তব্যজ্ঞানান্ধ হইয়া সমাজের নায়ক হউন, দেখিবেন আপনি (গুরুদেব) মাথায় থাকিবেন, সমাজ আপনার চির-পদানত।

আর এক সম্প্রদায়ের (পুরোহিত সম্প্রদায়ের) কথা বারান্তরে প্রকাশ করিব। ধর্ম্মপ্রচারকগণ আপনারা যতই না কেন চেষ্টা করুন যত দিন গুরু পুরোহিত স্ব স্ব পদের অধিকারী হইয়া আপনাপন কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর না হইবেন তত দিন ধর্ম্মপ্রচার বাহিরে বাহিরে ভাসিয়া বেড়া-ইবে। যদি হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার ইচ্ছা থাকে তবে সর্ব্বাগ্রে গুরু পুরোহিত-গণকে শিক্ষিত করিতে সচেষ্ট হউন, দেখিবেন পঞ্চম বর্ষীয় বালক বালিকা হইতে শত বর্ষের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত ধর্ম্মভাবে মাতিবে, সমাজের এ বিপ্লব আর স্থান পাইবে না।

গুরুদেবের কর্ত্তব্য ও পৌরহিত্য আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিব।

নবমী পূজা।

(গত মাসের পর।)

ভোলাদাস। মা গো! তোর একটা কথায় যে অত্যন্ত চিন্তিত হই-লাম! মা; তুই এইক্ষণে বলিলি যে আদিরস ঘটিত তোর যে সকল ক্রীড়া ও কর্ম্মাদি আছে তাহা রজোগুণ প্রকৃতির লোকের কীর্ত্তনীয়, কিন্তু তন্ত্র শাস্ত্রে তোর ঐরূপ যে সকল ক্রীড়া কর্ম্মাদির কথা আছে, এবং শ্রুতিও তন্ত্রকে আদর্শ করিয়া কোন কোন পুরাণ শাস্ত্রে যে তোর ঐরূপ ক্রীড়া কর্ম্মাদি আছে তাহা কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রকৃতি লোকেরই আলোচনীয়, এবং কীর্ত্তনীয়, এখন কোন্‌টা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব?

জগদম্বা বৎস! স্থির হও, শাস্ত্রে কখনও মিথ্যা কথা থাকে না, সমস্তই সত্য। আদিরসের ন্যায় প্রতীয়মান যে সকল বিষয় তন্ত্রে এবং তন্ত্রানুসারি-পুরাণাদিতে আছে তাহা আদিরস নহে, সেই সকল ক্রীড়া কর্ম্মাদিও আদিরস প্রকাশক নহে, তাহা শান্ত রস প্রকাশক। যাহারা নিতান্ত অন্ধ, নিতান্ত জড়বুদ্ধি তাহারা উহার কিছুই না বুঝিতে পারিয়া কেহ শৃঙ্গার রস, কেহ বীভৎস রস, কেহ ভয়ানক রসাদির বিষয় বলিয়া অবলোকন করে; কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রান্তি। এখন হস্তেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া প্রণালী শ্রবণ কর।

হস্ত এবং পদেন্দ্রিয়ের দ্বারা দুই প্রকার ক্রিয়া হইয়া থাকে। এক,—স্বতঃপ্রবৃত্তা-ক্রিয়া, দ্বিতীয়,—পরতঃ প্রবৃত্তা-ক্রিয়া। কেবল হস্ত এবং পদেন্দ্রিয়ের পরিচালনাদি জনিত তৃপ্তি লাভার্থে যে হস্ত পদের ক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহা হস্ত পদের স্বতঃপ্রবৃত্তা-ক্রিয়া। আর অন্য ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-চরিতার্থ-তার নিমিত্ত যে হস্ত পদের ক্রিয়া করা হয়, তাহাই পরতঃপ্রবৃত্তাক্রিয়া। প্রথম জাতীয় ক্রিয়ার উদাহরণ,—কেবল আমোদের নিমিত্ত; অন্যের সহিত নিযুদ্ধ করা অর্থাৎ হাতাহাতী ও বলপ্রকাশ করা, এবং কেবল আমোদের নিমিত্ত পদচালন, অটন, এবং ধাবনাদি করণ। এইরূপ ক্রিয়া কেবল হস্ত আর চরণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিলাভার্থেই হয়, এ নিমিত্ত ইহা স্বতঃ প্রবৃত্তা ক্রিয়া। ২য় প্রকার ক্রিয়ার উদাহরণ,—পূর্ব্বোক্ত রূপ ক্রিয়া ব্যতীত, হস্ত পদের যত প্রকার ক্রিয়া হয় তৎসমস্তই পরতঃপ্রবৃত্তা ক্রিয়া। সচরাচর হস্ত পদের যে ক্রিয়া হইয়া থাকে তৎসমস্তই পরতঃপ্রবৃত্তা ক্রিয়া। রসনা; চক্ষু,

কর্ণ, নাসিকাদির পরিতৃপ্তির নিমিত্তই প্রত্যেক মনুষ্য সর্ব্বদা হস্ত পদের পরিচালনা করিতেছে, অতএব যে সকল ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতার নিমিত্ত হস্ত পদের ক্রিয়া হইবে, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিটা যদি পূর্ব্বোক্ত মতে আমার উপাসনার্থে বিকসিত হয়, তবে হস্ত পদের সেই সকল ক্রিয়াও আমার উপাসনারই অন্তর্গত, আর ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি যদি আত্মার্থে বিকসিত হয়, তবে হস্ত পদের সেই ক্রিয়া গুলিও আত্মার্থেই পরিগণিত হইবে। এতএব সেই সকল ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ের সমর্পণ প্রণালী বলিলেই হস্ত পদের বিষয় সমর্পণ প্রণালী বলা হইবে, সুতরাং পৃথকভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। তৎপর স্বার্থ-প্রবৃত্তা ক্রিয়া যাহা হয় তাহা অতি সামান্য, তদ্দ্বারা কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, সুতরাং তদ্বিষয়ে বাক্য বিস্তার করা অনাবশ্যক। এখন উপস্থেন্দ্রিয়ানুরাগ নিবৃত্তির উপায় বলিতেছি।

সৃষ্টির সময়ে সৃষ্টি বিস্তার আমারই অভিপ্রেত, তাহা পূর্ব্বেই (   ) বলিয়াছি, সুতরাং "যথা সময়ে ঋতুচর্য্যা করিলে আমারই অভিমত কার্য্য করা হইল," এই কথায় সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া ঋতুচর্য্যা করিবে। তাহা হইলে উহার ইন্দ্রিয়জনিত পরিতৃপ্তিটা, আমার অভিমত ক্রিয়া বলিয়া যে পরিতৃপ্তি জন্মিবে, তাহারই অন্তরালে অভিনিবিষ্ট হইবে। ক্রমে সেই সুখেরই প্রবলতা হইয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার সুখ ক্ষীণ ও অনুপলব্ধ হইবে। এবং ঐন্দ্রিয়িক সুখের অনুরাগও আমার প্রতি অনুরাগের অন্তর্নিহিত হইয়া পড়িবে। অবশেষে কেবল আমার অনুরাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া ইন্দ্রিয়ানুরাগ এক কালে বিনিবৃত্ত হইবে। এতদ্ব্যতীত ঐ ইন্দ্রিয় বাসনা নিবৃত্তির আর একপ্রকার উপায় পরিকল্পিত আছে, যাহা আমি তন্ত্রাদি শাস্ত্রে বীরাচার প্রসঙ্গে বলিয়াছি; তাহা অতীব গুরুতর বিষয়, এবং অতীব উচ্চতম লোকের অনুষ্ঠেয়। সাধারণ লোকে তাহার গূঢ় রহস্যে দন্তবেধ করিতেও পারে না, সুতরাং সেই অনুষ্ঠান করিতেও পারে না। তাহারা ছাগলের ন্যায় রিপু চরিতার্থ করিয়া বীরাচারী হয়। সুতরাং সে বিষয় এখন বলিব না; তুমি শীঘ্রই অন্যস্থানে তাহা শুনিতে পাইবে। এখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় নিবেদনের প্রণালী শুন।

নয়নেন্দ্রিয়ের দর্শনীয় সমস্ত বিষয়ের সহিত, যদি আমার ভাব এবং আমার অনুরাগ বিমিশ্রিত থাকে তবেই নয়নের বিষয় আমাতে সমর্পিত হইয়া দর্শনানুরাগ নিবৃত্ত হয় এবং আমার অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। তাহার

এই প্রণালী,—লোকে যে নানা প্রকার দৃশ্য ভাল বাসিয়া থাকে, রঙ্গ বিরঙ্গের গৃহ, উদ্যান ও শয্যাসনাদি দেখিতে ভাল বাসে, বিচিত্র পরিচ্ছদ, বিচিত্র ভূষণাদি দেখিতে ভাল বাসে, রূপ লাবণ্যাদিযুক্ত বিচিত্র আকৃতি দেখিতে ভাল বাসে এবং আরও কত কি ভাল বাসিয়া থাকে তৎসমস্তই আমাতে সমর্পিত হইতে পারে। আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া আমার নিমিত্ত বিচিত্র মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে, আমার পূজার্থে দর্শনার্থে, এবং আঘ্রাণার্থে মনোরম উদ্যান প্রস্তুত করিয়া সেই গৃহ এবং সেই উদ্যানাদিকে যথাভিমত পরিসজ্জিত করিলে, তাহা আমি অন্য কোন খানে তুলিয়া লইয়া যাই না, কিম্বা "ইহা আমার; ইহা রাম দাসের নহে; রামদাস যেন ইহা কোন রূপে ব্যবহার করে না" এই রূপও বিজ্ঞাপনাদি দিই না, সুতরাং উহা আমার নিমিত্ত বিরচিত ও আমার সামগ্রী হইলেও উহা সন্দর্শন করিয়া কর্ত্তার নিজ গৃহ এবং নিজের বিচিত্র উদ্যানাদি দর্শনেরই পরিতৃপ্তি হইবে, এবং সে যখন আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত তখন আমার হইলেই তাহার নিজবৎ বোধ হইবে, সে আমার সুখে সুখী হইবে। নানাপ্রকার বস্ত্র, ভূষণ, ও গন্ধ, পুষ্প, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী মাল্যাদি দ্বারাও আমাকেই সাজাইয়া তাহার মধুরতা নয়নসাৎ করিবে, এবং আমারই পরম দর্শনীয় এক এক আকৃতির প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে নয়নেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবে। তাহা হইলেই ক্ষণস্থায়ী মাতা পিতা ও পুত্র ভার্য্যাদিতে অনুরক্ত ব্যক্তি যেমন তাহাদিগকে মনোমত সাজাইয়া তাহাদের রূপ লাবণ্যাদি সন্দর্শন করিয়া অপরিমিত চাক্ষুষ আনন্দের অনুভব করে, এবং তদ্দ্বারাই নিজের সজ্জিত হওয়ার স্পৃহা চরিতার্থ হয়, সেইরূপ পরিতৃপ্তি লাভ হইবে। আমার প্রতি একান্ত অনুরক্তি নিবন্ধন আমাকে সাজাইলেই, আমার রূপ মাধুর্য্য দেখিলেই যেন তাহার নিজের সজ্জীকৃত হওয়ার সুখ, নিজেরই রূপ লাবণ্য দর্শন করার পরিতৃপ্তি, লাভ করিতে পারিবে, সুতরাং নিজের ভোগ স্পৃহাও চরিতার্থ হইবে।

এইরূপ সন্দর্শনে যদিচ পার্থিব রূপই পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি উহাতে আমার ভাব সম্মিলিত থাকাতে উহা আমার সেই অলৌকিক রূপ এবং কৈলাসপুরী ও কৈলাসের উদ্যান দর্শনের সমান ফল হইবে। অর্থাৎ উহাতে পার্থিব রূপাদির ভাব অন্তরালে রাখিয়া আমার ভাবই সম্মুখে

উপস্থিত হইবে, সুতরাং উহা পার্থিব রূপ দেখার মধ্যে পরিগণিত না হইয়া আমার রূপ দর্শন গণ্য হইবে। পার্থিব রূপ দর্শনের পরিতৃপ্তি সুখও আমার রূপ সন্দর্শন জনিত সুখের অন্তরালে অভিনিবিষ্ট হইবে এবং পার্থিব রূপ দর্শনের অনুরাগও আমার প্রতি অনুরাগের অভ্যন্তরে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। এই গেল সাধারণ নিয়ম, এখন ইহার বিশেষ বিশেষ নিয়মও বলা যাইতেছে। ভোলাদাস! বাগিন্দ্রিয়ের বিষয় যেমন গুণ ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়ও তেমন প্রথমতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। তামসদৃশ্য, রাজসদৃশ্য এবং সাত্বিক দৃশ্য। যেরূপ দৃশ্য নয়নগোচর হইলে বিবেক বৈরাগ্যাদি সাত্বিক প্রবৃত্তি পরিদীপনা হয় এবং নয়নের শীতবর্য্যতা হয়, তাহাই সাত্বিক দৃশ্য। শান্ত কারুণ্য রসের যেরূপ দৃশ্য দেখিলে হৃদয়ে অভিমান, ক্রোধ ও দম্ভাদির ভাব পরিদীপিত হইয়া বীর রসাদির পরিস্ফূর্ত্তি হয় এবং যে দৃশ্য নয়নের উত্তেজনা কারক তাহাই রাজস দৃশ্য। যে দৃশ্য নয়নসাৎ হইলে বিহ্বলতা এবং প্রমাদাদির ভাব উদ্দীপিত হয় এবং বীভৎসাদি রসের আবির্ভাব হয়, আর চক্ষুরিন্দ্রিয়ের শিথিলতা সম্পাদন করে তাহা তামস দৃশ্য। এই ত্রিবিধ দৃশ্যের মধ্যে যে যে প্রকৃতির লোক সে সেইরূপ দৃশ্যের দ্বারাই আমার পরিচর্য্যা করিবে। তামস প্রকৃতির লোক তামস দৃশ্যের দ্বারা রাজস প্রকৃতির লোক রাজসদৃশ্যের দ্বারা এবং সাত্বিক প্রকৃতির লোক সাত্বিক দৃশ্যের দ্বারা আমার পরিচর্য্যা করিবে। কারণ যে যে প্রকৃতির লোক সে সেই প্রকৃতির বিষয়ই অধিকতর ভাল বাসে, বিপরীত প্রকৃতির বস্তু কেহই ভাল মনে করে না। যাহা ভাল বাসে না তাহা আমাকে দিলে ক্ষতি ভিন্ন যে কোন উপকার নাই, তাহা পূর্ব্বেই ( ) বলিয়াছি, যে বিষয় বা বস্তু যাহার প্রিয়তম তদ্দারাই আমার পরিচর্য্যা করিবে তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইতে পারে ইহাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি ( )।

ভোলাদাস। মাগো! যদি সমস্ত প্রকার দৃশ্যাবলীর দ্বারা তোমারই পরিচর্য্যা করিল তবে তাহার স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার এবং নিজের কি উপায় হইবে, পরিচ্ছদ ও ভূষণাদি দ্বারা তাহাদের রূপ লাবণ্যাদি বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে না কি? যদি করে তবেই বিষয়াসক্তি হইল, সুতরাং আত্মাভিমান আসিয়া আক্রমণ করিল তবে আর তোর সংসার তোর কর্ম্ম বলিয়া মনে করা যায় না। আর স্ত্রী পুত্রাদিকে ভূষণাচ্ছাদনাদি দ্বারা পালন না করিলেই বা কিরূপে সংসারাশ্রমে থাকা যায়?

জগদম্বা।—তাহা অবশ্যই করিবে, কিন্তু তাহাতেও ভাব বিমিশ্রিত থাকিলে, ঐরূপ কার্য্য দ্বারা অণুমাত্র অনিষ্ট হইতে পারে না। বৎস! আমি এমন সুকৌশল করিয়া রাখিয়াছি যে, মানব ইচ্ছা করিলে সমস্ত কার্য্যই আমার সংস্রব রাখিয়া নিষ্পন্ন করিতে পারে। আমি এইরূপ বিধি করিয়াছি যে "পবিত্রবাসাঃ পূতাত্মা শুক্ল যজ্ঞোপবীতকঃ। শুক্লোষ্ণিষো বদ্ধ শিখোভূত্বা সর্ব্বং সমাচরেৎ" ইহার অর্থ এই যে, ভগবদ্বিষয়ে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালেই সুপরিষ্কৃত এবং ধৌত বসন যুগল পরিধান করিবে, অভ্যঙ্গ স্নানাদি দ্বারা দেহটিকে অতি পরিষ্কৃত রাখিবে, শুক্ল যজ্ঞোপবীত এবং সুপরিষ্কৃত উষ্ণীষ ধারণ করিবে, কেশকলাপ উত্তমরূপে বিবদ্ধ করিবে এবং চন্দনাদি দ্বারা বিচিত্র তিলক করিবে, তৎপর দেব কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে।" অতএব আমার দৈনন্দিন কার্য্যের অনুরোধেই তাহাকে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ গ্রহণ এবং বেশ ভূষাও করিতে হইল। অতএব আমার উপাসনাতেও নিজের সুপরিচ্ছদ এবং সুবেশাদির সুখ ভোগও হইতে পারে, অথচ উহা আমার উপাসনার অঙ্গীভূত হইল বলিয়া আমার উপাসনার মধ্যেই পরিগণিত হইবে এবং আমার প্রিয় কার্য্য বলিয়া তাহাতে যে তৃপ্তি সুখের অনুভূতি হয় তাহাও আমার পূজা জনিত তৃপ্তি সুখের অন্তরালে অভিনিবিষ্ট হইবে এবং তাদৃশ বেশভূষাদির অনুরাগও আমার প্রতি অনুরাগের অন্তরেই নিবিষ্ট হইবে; কারণ, ঐরূপ বেশ ভূষাদি করার মূলই আমার প্রতি অনুরাগ। অতএব ঐ রূপ কর্ম্ম যত করিবে ততই বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি হইয়া আমার প্রতি অনুরাগের বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। তৎপর সস্ত্রীক হইয়া যখন ধর্ম্মাচরণের বিধি আছে, তখন স্ত্রীরও তদনুযায়ী পরিচ্ছদ ও বেশভূষাদি করিতে হইবে। পুত্র কন্যাদিকেও আমার ভৃত্য সেবকাদি মনে করিয়া, তাহাদের শিশু অবস্থা হইলেও, আমার উপাসনার ও কর্ম্মাদিতে অধিকারী করিয়া রাখিতে হয়, তবেই তাহাদিগকেও যথোচিত পরিচ্ছদ ও বেশভূষাদি পরাইতে হইল, অথচ ইহা আমার নিমিত্তই হইতেছে বলিয়া নিজের কোন দায়িত্বজনক হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আমার সংসার ও আমার পরিবার বিবেচনায় যদি পুত্র কলত্রাদি বেশ ভূষাদি করে তাহাতেও কোন দোষ হইতে পারে না ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কিন্তু ইহার মধ্যে আরও কথা আছে তাহাও বলা যাইতেছে,—এই যে

স্ত্রী পুত্রাদি এবং নিজের পরিচ্ছদ ও বেশ ভূষাদি করার কথা বলিলাম ইহা ও আমার পরিচ্ছদ ও ভূষণাদি এবং তাহার নিজের প্রকৃতি এত দুয়ের সমজাতীয় হওয়া চাই। অর্থাৎ যাহার তামশ প্রকৃতি সে আমাকেও তামস দৃশ্যাবলীরদ্বারা পরিচর্য্যা করিবে, এবং স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার সহ নিজেও তামস দৃশ্যেরই পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিবে। যে রাজস প্রকৃতির লোক সে আমাকে, এবং স্ত্রীপুত্রাদির সহিত নিজেকেও রাজস দৃশ্যাবলীর দ্বারা রঞ্জিত করিবে, আর যিনি সত্ব প্রকৃতিক তিনি সাত্বিক দৃশ্যতাযুক্ত পরিচ্ছদাদি দ্বারাই আমাকে এবং নিজকে ও স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার বর্গকে সজ্জিত করিবে ইহার অন্যথা হইলেই বিপরীত ফল হইবে। ফলে আপন প্রকৃতির অনুমোদিত পরিচ্ছদাদি, লোকে স্বতঃই গ্রহণ করিয়া থাকে। শাস্ত্রে এই জন্যই আমার এক এক প্রকার পূজাতে এক এক প্রকার পরিচ্ছদাদি গ্রহণের বিধি আছে।

ভোলাদাস। মা! আর একটি সন্দেহ উপস্থিত হইল, এইটি না বলিলে তৃপ্ত হইতে পারি না, মাগো! তুই বলিয়াছিস সমস্ত দৃশ্যাবলীর দ্বারা তোরই পরিচর্য্যা করিতে হইবে, তাহা হইলেই দর্শনেন্দ্রিয়ের অনুরাগ নিবৃত্তি হইয়া মা তোর প্রতি অনুরাগ জন্মিবে; কিন্তু, মা, তুই যে প্রণালী বলিলি, তাহাতে কেবল তোর পূজার অঙ্গস্বরূপ দৃশ্যাবলী সমর্পণের উপায় বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু মা! সংসারি লোকের নয়ন সকলদিকেই বিধাবিত হয়, গ্রাম নগর, পল্লী প্রভৃতিতে কত অসখ্য দৃশ্যাবলী দেখিয়া নানা প্রকার তৃপ্তি লাভ করে, এবং তাহার প্রতি অনুরাগও হয়, সেইগুলি তোকে সমর্পণ করার উপায়কি?

জগদম্বা। বৎস! তুমি উদ্বিগ্ন হইও না, আমার শরণাপন্ন পুত্রের কোন প্রকারে কোন বিপদ হইতে পারে না, আমি সমস্ত বিষয়েরই যথাযথ উপায় বিধান করিয়াছি, তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়েরও বিশেষ উপায় অবধারিত আছে তাহা বলা যাইতেছে। প্রথমে আমার ইদানীন্তন অন্যতম প্রিয়পুত্র কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য কি বলিয়াছেন শুন,—

(গাওরা,—তিওট)

" সুগম সাধন বলি তোরে, ওরে! আমার মূঢ়মন! সাধরে।
যখন যাহাতে সুখে থাক, মন! তাতেই ভাব মারে॥

যদি না থাকিতে পার মন! চিন্তামণি পুরে।
চরাচরে শ্যামা মায়েরে সকলে সঞ্চরে ॥
স্থলে অনলে শূন্যে আছে মা মোর সলিলে সমীরে।
ব্রহ্মাণ্ড রূপিণী শ্যামা, মায়ে জাননারে ॥
ঘটে আছে পটে আছে, মা মোর সকল শরীরে।
কামিনীর কটাক্ষে আছে, তেঁই জগতের মন হরে ॥
কমলাকান্তের মন ভয় করেছ কারে।
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত নিধি ঘটেছে তোমারে ॥"

আমার কমলাকান্ত যাহা বলিয়াছে তাহাই সত্য, আমি সর্ব্বভূতময়ী, সমস্ত বস্তুতেই আমি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আছি, অতএব যেখানে অতিশয় দর্শনীয়তা ও সৌন্দর্য্যাদি দ্বারা চিত্ত সমাকৃষ্ট হয়, সেইখানেই আমার অস্তিত্ব স্মরণ করিয়া উহা আমারই সৌন্দর্য্য বলিয়া মনোনিবেশ করিবে, তবেই উহা বিষয়ের সৌন্দর্য্য না হইয়া আমার সৌন্দর্য্য মধ্যে পরিগণিত হইবে। এবং সেই দর্শনের ফলও আমার মূর্ত্তি সৌন্দর্য্য দর্শনের ফলের ন্যায়ই হইবে, ইহা করিলেই সমস্ত দৃশ্যাবলী আমাতে সমর্পণ করা হইল। এই কথা হয়ত পরেও আর একবার বিস্তার ক্রমে বলা যাইতে পারে, অতএব এখন (অতি সংক্ষেপেই বলিলাম, এখন ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিষয় সমর্পণের প্রণালী শুন,—

গুণ প্রভেদে গন্ধ ও তিন ভাগে বিভক্ত; তামস গন্ধ, রাজস গন্ধ এবং সাত্ত্বিক গন্ধ। যে গন্ধের দ্বারা হৃদয়ে শান্ত রস এবং ভক্তি বিবেকাদি সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির পরিদীপনা হয় এবং যে ঘ্রাণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নিকট লঘুতর বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ঘ্রাণ। যে গন্ধ অত্যন্ত সাঙ্কেতিক এবং আদি রসাদির সন্দীপক তাহা রাজস গন্ধ, আর যে গন্ধ অবসাদক ও বীভৎস রসাদির উদ্দীপক তাহা তামস গন্ধ। এই তিন জাতীয় গন্ধযুক্ত পুষ্পাদি দ্রব্যের দ্বারা তিন জাতীয় লোকে আমার পরিচর্য্যা করিবে। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক সাত্ত্বিক গন্ধযুক্ত দ্রব্যের দ্বারা, রাজস প্রকৃতির লোক রাজস গন্ধযুক্ত দ্রব্যের দ্বারা, এবং তামস প্রকৃতির লোক তামস গন্ধযুক্ত দ্রব্যের দ্বারা সেবা করিবে। কারণ, আপন প্রকৃতির অনুমোদিত গন্ধই সকলের প্রিয়তম হইয়া থাকে। প্রিয়তম দ্রব্যের দ্বারা আমার সেবা করিলেই বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি হইয়া আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয় ইহা পূর্ব্বেই বার২ বলিয়াছি। আপন প্রিয় গন্ধ দ্রব্যের দ্বারা

আমার পরিচর্য্যা করিলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আপ্যায়ন জনিত যে সুখ বোধ হয়, তাহা আমার ভোগ জনিত তৃপ্তি সুখের অন্তরালে পড়িয়া যায় এবং গন্ধ দ্রব্যে ভোগের অনুরাগও আমার অনুরাগের অন্তর্নিহিত হয়। এখন শ্রবণের বিষয় বলা যাইতেছে।

বাক্য যে তিন প্রকারে বিভক্ত এবং এক এক জাতীয় বাক্য এক এক প্রকৃতির লোকের প্রিয়, তাহাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাক্যের ন্যায় গান ও বাদ্যও তিন ভাগে বিভক্ত। যে রাগ রাগিণী ও স্বর তালগ্রামযুক্ত গাণ বাদ্য ভক্তি বিবেকাদি এবং শান্ত করুণ রসের পরিদীপক তাহা সাত্বিক গান বাদ্য, এবং যাহা আদি রসাদিও দন্তাদি রজোবৃত্তির পরিদীপক করে, তাহা রাজস গান বাদ্য, আর যাহা বীভৎস রসাদির উদ্দীপন করে তাহা তামস গান বাদ্য। এই সকল গান বাদ্যাদির মধ্যে এক এক রূপ গীত বাদ্য এক এক প্রকার প্রকৃতির লোকের প্রিয়তম হইয়া থাকে! তন্মধ্যে যেরূপ গান বাদ্য যাহার অধিকতর প্রীতিকর হয় সে সেই জাতীয় গান বাদ্যের সহিত, ভিন্ন ভিন্ন রসোদ্দীপক আমার ক্রীড়া কলাপের যোজনা করিয়া গান বাদ্যাদি করিবে এবং অন্যের নিকট শুনিতে গেলেও ঐরূপ গীত বাদ্যাদিই শুনিবে। তাহা হইলেই আমার ভাবে গদ্‌গদ হইয়া তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়ও চরিতার্থ হইবে। আমার উপাসনা করাও হইবে। সেইরূপ গীত বাদ্যাদি শ্রবণ করা গীত বাদ্য শ্রবণের মধ্যে পরিগণিত না হইয়া আমরা গুণ শ্রবণের মধ্যেই গণ্য হইবে; গীত বাদ্য শ্রবণের তৃপ্তিও আমার গুণ শ্রবণের তৃপ্তির অভ্যন্তরে নিবিষ্ট হইবে, এবং গান বাদ্যের অনুরাগও আমার অনুরাগে দ্বারা সমাবৃত হইবে, ইহার প্রণালী পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয় শুন।

শয্যাসনাদির মৃদু কোমলাদি স্পর্শ এবং গ্রীষ্মাদি কালভেদে জল, বায়ু, রৌদ্রাদির শীতোষ্ণাদি স্পর্শ অনুভব করিয়া মানব তৃপ্তি সুখের উপভোগ করে। তন্মধ্যে আমার পূজার অঙ্গীভূত নানাবিধ সুকোমল আসনাদির বিধি আছে, আমার পরিতুষ্টি সাধন মানসে সর্ব্বদাই ঐরূপ আসন ব্যবহার করিতে পারে, তদ্দ্বারা আসন বসনের সুকোমল স্পর্শের অনুভূতি হয় অথচ তাহা আমার নিমিত্ত করা হয় বলিয়া পূর্ব্বোক্ত মতে বিষয়াকর্ষক না হইয়া আমার প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধকই হয়। তৎপর আমাকেও নানারূপ কার্য্যাসনাদি অর্পণ করার বিধি আছে। তাহা করিলে, আপন পুত্র

কন্তাদি পরিবারগণের উত্তম শয্যাসনাদি ব্যবহারে যেমন নিজের শয্যা-সনাদি ভোগ সুখের অনুভূত হয়, আমার প্রতি বিশেষ অনুরাগ থাকিলেও সেইরূপ পরিতৃপ্তি হইতে পারে, আমাকে ভোগ করাইলেই যেন নিজের স্পর্শনেন্দ্রিয়রও চরিতার্থ সুখ হয়। তদ্দ্বারা নিজের ভোগানুরাগ নিবৃত্ত হইয়া আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। তৎপর অভ্যস্ত শীতোষ্ণাদি সময়ে যখন রৌদ্র, অগ্নি, জল বায়ু প্রভৃতির সুখকর স্পর্শানুভব করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করে তখন তাহা আমার প্রসাদ বা অনুগ্রহ চিহ্ন বলিয়া ভোগ করিবে। প্রচণ্ড আতপ জ্বালায় যখন জীব লোক পরিপীড়িত হয়, তখন আমিই মাতৃ ভাব প্রকাশ করিয়া সুশীতল সলিল এবং কমনীয় সমীরণের অন্তরালে থাকিয়া সকলকে শান্তি প্রদান করে, তখন তাহা আমার প্রসাদ বা অনুগ্রহ চিহ্ন বলিয়া ভোগ করিবে। আবার দুরন্ত শীতের দ্বারা যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখনও আমিই রৌদ্রাজলের অন্তর্নিহিতা থাকিয়া সমস্ত জীবকে রক্ষা করিয়া থাকি। এইজন্য দেব দেব আমাকে বলিয়াছেন, "ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোপি গগণং ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশ রমণী কালি সকলম্। * * *।" এই সত্য তত্ত্ব সম্বরণ করিলে হৃদয় ভক্তি রসে আপ্লুত হইয়া উঠিবে, তখন স্পর্শ সুখ ভুলিয়া গিয়া আমার ভক্তি সুখেরই আস্বাদ করিতে থাকিবে। সুতরাং তদ্দ্বারাও বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি হইয়া আমার অনুরাগ পরিবর্দ্ধিত হইবে। এইরূপে স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয় আমাকে সমর্পণ করিতে হয়। অতঃপর রসনেন্দ্রিয়ানুরাগ নিবৃত্তির উপায় বলিতেছি।

সত্ত্বাদি গুণ ভেদে আহারও প্রথম ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক আহার, রাজস আহার, এবং তামস আহার। এই ত্রিবিধ আহার ত্রিবিধ প্রকৃতিক লোকের প্রিয় ইহা শ্রীমান্ অর্জ্জুনকেও আমি কথান্তরে বলিয়াছিলাম, "আহারস্বপি সর্ব্বস্ব ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। * * * আয়ুঃসত্ত্ববলারোগঃ সুখপ্রীতি-বিবর্দ্ধনাঃ। কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ বিদাহিনঃ আহারারাজসস্যেষ্টা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ। যাতয়ামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ। উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ * * * ত্রিবিধ লোকের প্রকৃতি ভেদে ত্রিবিধ আহার প্রিয় হইয়া থাকে। যে দ্রব্য আহারের দ্বারা আয়ু, চিত্তের স্থৈর্য্য বল, আরোগ্য, অকৃত্তিম সুখ এবং প্রীতি বিবর্দ্ধন

হয়, যাহা রসযুক্ত এবং স্নেহ প্রধান, যে দ্রব্য আহার করিলে তাহার ক্রিয়া অধিক কাল পর্য্যন্ত শরীরে স্থায়ী হয় আর যাহা হৃদ্য, কোন প্রকার বিকট এবং উগ্র গন্ধযুক্ত নহে) ঈদৃশ দ্রব্য সকল সাত্বিক, এবং ইহা সাত্বিক লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। আর যে সকল দ্রব্য কটু অম্ল লবণ রসযুক্ত এবং তীক্ষ্ণ ও রুক্ষতা কারক, উত্তাপ বর্দ্ধক উহা রাজস আহার, এবং রাজস প্রকৃতির প্রিয় হইয়া থাকে, ঐ সকল আহারে দ্বারা দুঃখ শোক ও নানাপ্রকার ব্যাধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্দ্ধ পক্ক ও বিরসতা প্রাপ্ত (যাহার প্রকৃত স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে) এবং পূতি গন্ধ যুক্ত পর্য্যুষিত উচ্ছিষ্ট এবং আমীষাদি আহার, সকল তামস প্রকৃতির লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিরামিষ হবিষ্যাহার এবং হবিষ্যের যোগ্য যে সকল ফল মুলাদি তাহাই সাত্বিক আহার এবং সাত্বিক প্রকৃতির প্রিয়, পবিত্র মৎস্য মাংসাদি সম্বলিত যে আহার তাহা রাজস এবং রাজস প্রকৃতির লোকের প্রিয়। তন্মধ্যে যে সাত্বিক প্রকৃতির মানব সে আমাকে নিরামিষ হবিষ্য ফল মূলাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে, যে রাজস সে বিহিত মৎসংমাম, এবং অন্যান্য রাজসভোগ প্রদান করিবে; আর যে তামস সে তামস ভোগের দ্বারাই আমার সেবা করিবে, এবং অবশেষে প্রসাদ গ্রহণ করিবে। এই রূপ করিলে তাহার রসনেন্দ্রিয়ের স্পৃহানিবৃত্তি হইয়া আমার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ হইবে, ইহার প্রণালী বিস্তার পূর্ব্বক বলিয়াছি, আর দ্বিরুক্তির আবশ্যক নাই।

এইরূপে আপনাপন প্রকৃতির অনুমোদিত সমস্ত প্রকার ভোগ্য বিষয়ের দ্বারা আমার পরিচর্য্যা করিতে হয়। এই জন্যই শাস্ত্রেতে আমার উপহারাদি সম্বন্ধে নানা প্রকার বিধি নিষেধ আছে। কোন্ খানে কোন্ বস্তু দিতে বিধি আছে, আবার কোন্ খানে তাহারই নিষেধ আছে, কোন রূপ আচরণ করিতে একবার বিধি আছে, আর একস্থানে আবার তাহারই নিষেধ আছে, তাহার মুখ্য কারণই, লোকের প্রকৃতি ভেদ নিবন্ধন অধিকার ভেদ, তবে অবশ্যই এ বিষয়ে আরও ১১টি কারণ না আছে তাহা নহে, তাহাও বোধ হয় স্থানান্তরে তুমি জানিতে পারিবে। হতবুদ্ধি মূর্খগণ ইহা বুঝিতে না পারিয়া মিছামিছী শাস্ত্রের দোষারোপ করে।

পাগল।

মদভরে মাতোয়ারা, কপালে তোলা নয়নতারা পাগলের বুকভরা ধন পাগলী তুই কে রে? আজ দল পেয়েছি, বল পেয়েছি, আর ত কাকেও ভয় করি না; পাগলামীর গ্লানি গঞ্জনা লজ্জা লাঞ্ছনা আর ত হৃদয়ে স্থান পায় না, আজ প্রাণের কবাট খুলিয়া দিয়া বাহু তুলিয়া গগণ ছড়াইয়া গান ধরিব—"লোকে আমায় পাগল বলে ও পাগল বল্লে কি তায় ক্ষতি হবে? লোকের কথা, কথার কথা, লোক কি আমার সঙ্গে যাবে।" তুই যদি মা পাগল হয়েছিস্, আমার তবে লজ্জা কি? পাগলীর ছেলে পাগল হবে এ আবার আশ্চর্য্য কি? তবে এই টুকু লোকে বল্‌তে পারে—মাতৃদোষে পাগল হলো। আচ্ছা মা তাই হলেম্, লোকের সঙ্গে বিবাদ করা গোল যোগ বই কিছুই নয়, তাই নিরুপায়ে তোমার পায়ে জিজ্ঞাসি যা মনে হয়—তুমিই একবার বল, তোমার চরণতলে ও কি? আ! সর্ব্বনাশ সর্ব্ব-নাশ!! হও তুমি সর্ব্বান্তর্যামিনী, হও তুমি বহ্ন মাতৃকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কিন্তু আমার এ প্রশ্নের উত্তর করা তোমার বাবার মাথাতেও কুলাইয়া উঠিবে কি না সন্দেহ। বাপান্ত করিলাম বলিয়া রাগ করিও না। তোমার বাপ্‌ও নাই তার অন্তও নাই, আর যদি বল আছে—তবেত সে পাহাড়ে বাপের পাথুরে মাথায় এ প্রশ্নের উত্তর হবেই না, সত্য কথাই বলেছি তাতে আর রাগ কি? সে যাহোক্ তোমার বাপান্ত ছেড়ে দিয়ে একবার আমার বাপান্ত করি এস, সত্য করিয়া বল দেখি তোমার চরণ তলে হৃদয় ঢেলে জীবন্ত মরণে মরে আছেন ওই ভাল মানুষ দেবতাটি কে? কি বলিবে বল মা; উনি কি তোমার ছেলে না বাবা? অথবা তোমার ছেলের বাবা? নিশ্চয় করিয়া, না পারিবে তুমি বলিতে, না পারিবেন উনি বলিতে, না পারিব আমি বলিতে। শেষ কথাটি তুমি বলিতে পারিবে, কিন্তু তবুও বলিবে না—তাই পাগল, প্রাণের দায়ে অস্থির হইয়া বলিয়াছে—কোথা—যে এসব আসে কোথায় যায়, ও তা ভাবতে গেলে মাথা ঘোরে ভাবনা শেষে ভাবনা পায়,—তাই বল্ পাগলী দয়া করে—পাগলটা তোর কেবা হয়—বলমা পাগল কি তোর চির কালের পাগল; অথবা যে দিন তোর চরণতলে আপনা ভুলে হৃদয় ঢেলে জীবন্ত শব সাজিয়াছেন, সেই দিন হতে পাগল?

পাগলি! তোমার দয়ার বলে এমন সাদা সিধে দেবতাটিকে ছাই ভস্ম মাখিয়ে পাগল সাজাইয়াছ—মা! তুমি নিজে সাজিয়াছ, সাজিতে শিখিয়াছ তাই সাজাইতে পারিয়াছ—এমন সাজা কবে সাজাবি, যে দিন এই রাজা প্রজা পরিপূর্ণ পাপ সংসারের সকল সাজা ঘুচে যাবে—কবে সেই আনন্দময় শ্মশানে শুয়ে আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে আনন্দময়ীর চরণ নিয়ে আনন্দের খেলা করিব, আনন্দে অধীর হয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলিব—মা সংসার পাগলের খেলা। ব্রহ্মা বিষ্ণু পাগলীর চেলা, যে বুঝে পাগলের খেলা, খেলা সঙ্গে তার— মাতৃ দোষে পাগল হয়ে, পিতৃ দোষে চরণ পেয়ে, আত্ম দোষে নেচে গেয়ে, সংসারের পার পায়—তাই জোর করে মা আবার বলি পাগলীর ছেলে কেনা নয়? যার বাবা পাগলা, মা পাগলী, সেও কখন ভাল হয়! আর যারা বাবা মায়ের ধার ধারে না, ভুঁই ফোড়া নাম জাকাতে চায়, তেমন ছেলে থাকার চেয়ে ক্ষতি কি, মা! গোল্লায় যাওয়ায়। ওরে ভাই পরকে পাগল বলা কেবল পাগলামী বই আর কিছুই নয়—ভবের এই বাজী দেখে, রাজী থেকে, পাজী কেবল পাগল না হয়, না হলে ভাই মানুষ যারা পাগল তারা এ কথা জেন নিশ্চয়।

ছেলেটা কালকে হলো আজকেই মলো, বাবার মরণ বহুদিন হয়, তবু হায় আমি থাকব, রাজা হব, এর চেয়ে পাজি আবার কে হয়।

যদি কেউ বলে তোমায়, কি কর হায়, নিকটে যে মরণ সময়; তুমি তায় রেগে আগুন, করিবে খুন, কেন না সে অমঙ্গল কয়, মরি কি বুদ্ধির ঘটা, অমঙ্গলটা বুঝে উঠলে মরণ নয়, তা এ ভবে সব অমঙ্গল, মরণ কেবল মহা মঙ্গল, তার আর নাই ক্ষয়। তাইতে দেখ জীবন ত্যেজে, মরে আছে, পাগলীর চরণ করে আশ্রয়, পাগলের রাজা যে জন, জীবন মরণ ও পদ পেলে সব সমান হয়।

২য় ভাগ। ১২৯৪ সাল। ৪র্থ খণ্ড।

"মায়া।"

মধুর মধুযামিনী, সুস্নিগ্ধমলয় বাতে শরীরক্লান্তি অপনোদিত হইতেছে, মন প্রফুল্লিত, প্রাণ শীতল। মল্লিকা ও মালতীযূথ বিকসিত হইয়া দশদিক্ আমোদিত করিতেছে। চন্দ্রিকা অতি নির্ম্মল। প্রকৃতি অতি বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত। সমস্তই রমণীয় ও স্ফূর্ত্তিময়। প্রতি আননে উৎসাহের রেখা বিভাসিত; এমন সুখময় সুসময়ে বিশ্বনাথের রঙ্গপুর সন্দর্শনে কৌতূহল জন্মিল। ক্রমে কৌতূহলে প্রমোদিত হইয়া, বিকসিত চম্পক-দাম পরিশোভিত বিশাল বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইলাম। চতুর্দ্দিগ্ নিরীক্ষণ করিয়া কৌতূহলের তর্পণ সাধন হইল। ক্ষণকাল পরে ভাবান্তর সজ্ঘটিত হইয়া, রঙ্গপুরের নানা রঙ্ অনুভূত হইতে লাগিল। কোথাও হরিৎ কোথাও শ্বেত, কোথাও নীল কোথাও পীত। মল্লিকাগুচ্ছের কোন বৃন্তে বিকসিত মল্লিকাযূথ কৌমুদীসহ হাস্যবিকাস করিতেছে, মধ্যে মধ্যে মধুকরগণ পরিহাসার্থ ঝঙ্কার করিতেছে। পার্শ্বে, শুষ্ক নীরস কুসুমের প্রতি তাহার আর দৃষ্টি নাই। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সুচতুর ভ্রমর তাহার মধুর ভিখারী ছিল। একবৃন্তে একটী কুসুম সৌরভ সম্পন্ন ও বিকসিত, অন্য কুসুম শুষ্ক, পতিত ও গলিত। বসন্ত প্রভাবে কোন বৃক্ষে নবীন প্রবালমাল উদ্গত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। কোন বৃক্ষ পত্রবিহীন

কোন বিটপ শুষ্ক, কোন বিটপ সরস। নীড়ে বা কোটরে, অচির-জাত পক্ষি-শাবক জনক জননীর পক্ষপুট সমাচ্ছাদিত। কোথাও ডিম্ব মধ্যে কলল-সমাবেশ। কোন পশু নিরাপদস্থান অন্বেষণ করিতেছে, কোন জন্তু বিহারার্থ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। কেহ আহারে, বিমুখ হইয়া, নিদ্রার ক্রোড়ে উপবেশন করিতেছে, কেহ আহারের জন্য ব্যতিব্যস্ত। কোন মানব উৎফুল্ল হৃদয়ে বন্ধুসহ প্রেমালাপ তৎপর, কেহ বা আলাপ পরাঙ্মুখ, কেহ বা তাল লয় সুসঙ্গত মধুর গানে, শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহর পরিতৃপ্তি করিতেছে, কেহ বা প্রিয়-বিনাশে রোরুদ্যমান। কোথায় জন্মোৎসবে পরিজন আমোদসাগরে সন্তরণ করিতেছে। কোথাও প্রতি-বেশিগণ সমবেত হইয়া, শবসহ শ্মশানে গমন করিতেছে। কেহ ক্ষুধার নিবৃত্তি সাধন করিতে না পারিয়া, অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। কেহ সুখাদ্য ভোজনে অবহেলা ও অনাদর প্রকাশ করিতে প্রস্তুত। কেহ নিদ্রিত কেহ জাগরিত। ঐ যে নক্ষত্রজাল পরিবেষ্টিত স্নিগ্ধজ্যোতিঃ চন্দ্রমার বিমল মরীচিমালায়, জগৎ হাসিতেছিল, ক্ষণকাল পরে আর সে দৃশ্য নাই। বায়ু কোণে বিতস্তি পরিমাণ মেঘ খণ্ড, ক্রমে বিপুলতা ধারণ করিয়া, আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল, জগৎ তমোময়। ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা বিস্ফুরিত হইতেছে, কাদম্বিনী গভীর গর্জ্জনে সকলের অন্তরে আতঙ্ক জন্মাইয়া ধরাতল সিঞ্চন করিল। আবার কোথায় সে সমস্ত অপসারিত হইয়া, নির্ম্মল আকাশের প্রকাশ। যে পথ প্রান্তর পরিশুষ্ক ছিল, তাহা এখন পঙ্কিল। এইরূপ যতই নিরীক্ষণ করি, নিরীক্ষণ করিয়া অন্তরে অন্তরে চিন্তা করি, দেখি, জগৎ, জগৎ নহে, যেন ইন্দ্রজাল। ইন্দ্রজালে যেমন অঘটন ঘটিত হয়, অসম্ভব সম্ভাবিত হয়, এ স্থলেও তাহাই। ঐন্দ্রজালিক ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া, সক-লের বিস্ময় জন্মায়, অথচ দর্শকগণের সেই মিথ্যাকাণ্ডে প্রচুর আমোদ জন্মিতে থাকে। আবার যখন ইচ্ছা হয় ঐন্দ্রজালিক, ইন্দ্রজালের উপ-সংহার করিয়া নির্লিপ্ত হয়। এই বিশাল ইন্দ্রজালেরও এক অনন্তশক্তি—ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল-প্রভাবে, উৎপত্তি, স্থিতি ও নিরোধ সম্পাদন করি-তেছে। উহাই মায়া। ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল-ব্যবসায়ে নিযুক্ত সুতরাং ঐন্দ্রজালিক আখ্যায় আখ্যাত। পরম ঐন্দ্রজালিকও মায়ী, মায়াময়, মহামায় ও মহামায়ী প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত। আমরা যখন ইন্দ্র-

জাল দর্শন করি, দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হই, তখন প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া তথ্য জ্ঞানে, তাহাতে আসক্ত হই। যখন বিরাগভরে উহার বাহিরে থাকি তখন বুঝি উহা মিথ্যা। মায়ার কার্য্যও তদনুরূপ। আসক্তভাবে বিচরণ কর, মায়াপাশে বদ্ধ হইবে, দেখিবে "আমার" "আমার" অথবা "আমি" "আমি"। বিরাগভরে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার কর, বুঝিতে পাইবে "আমার" "আমার" নহে। বালক ইন্দ্রজাল পরিদর্শনে বিস্মিত হইয়া, আপ্ত সমীপে বিনয় নম্র সহকারে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, কারুণিক আপ্তজন আহ্লাদের সহিত, উহার প্রকৃতি বর্ণন করিয়া বুঝাইয়া দিল, উহা সত্য নহে মিথ্যা; বালক বুঝিল, শিখিল, তদবধি স্থির করিল, ইন্দ্রজাল মিথ্যা মিথ্যা। মায়া, মহামায়ার অপূর্ব্ব কৌশলে সর্ব্বতঃ বিস্তৃতা। মায়ার অদ্ভুত লীলায় মুগ্ধ হইয়া, যে আসক্ত হইতেছে, তাহাকে তাহা হইতে বিনিবৃত্ত হইবার জন্য, মায়াধীনকে মায়াপাশ ছেদন করিবার জন্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি-মহামায় আপ্তপুরুষের জ্ঞানময় নির্ম্মল, নিষ্পাপ, পরম পবিত্র হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া, জানাইয়া দিলেন "নাসিত্বং সংসারী" "তত্ত্বমসি"। এই মহাবাক্যে যে প্রবুদ্ধ হইল সে বুঝিল জগৎ মায়াময়, মিথ্যা। একমাত্র পরব্রহ্ম সত্য। প্রবুদ্ধ ব্যক্তি সততই দেখে, জগতের কোথাও হাসিরাশি, কোথাও কান্না, সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি আশ্চর্য্য কার্য্যকলাপ সঙ্ঘটিত হইতেছে। উহা আমোদজনক, কিন্তু আসক্তি ঘটিলে বড়ই বিষম, পদে পদে বন্ধন। আসক্ত ব্যক্তি সুতরাং বদ্ধ; এবং বিরক্ত,—মুক্ত। বিরক্ত যে দিগ্ নিরীক্ষণ করেন কেবল দেখেন মায়া—ইন্দ্রজাল। অঘটন পটীয়সী মায়ার প্রকৃতি, অতি সঙ্ক্ষেপে দুই চারিটী কথায় বলিয়া এখন মায়াবাদ সম্বন্ধে কিছু, আলোচনা করা যাইতেছে। মায়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে কেহ লিখিয়া, বা বলিয়া, শেষ করিতে পারে না; জগৎতত্ত্ব যিনি পর্য্যালোচনা করেন, পর্য্যালোচনা করিয়া চিন্তার গভীরতলে নিমগ্ন হন, তিনি প্রতিপদে, প্রতি পরমাণুতে, মায়ার বিচিত্র লীলা দেখিয়া মুগ্ধ হন। এবং কার্য্যকলাপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে।

ময়াবাদ বৈদিক। সুতরাং স্বকপোল কল্পিত নহে। অনেকে ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রচারিত বলিয়া, প্রতিপক্ষে দুই এক কথা বলিয়াছেন, তাহা অসার ও বিদ্বেষ মূলক। সেই লেখাগুলি দেখিলেই উহা প্রতীতি

হইতে পারে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, শঙ্করাবতার। নিরোধ করা তমো-গুণের কার্য্য, তমোমল অপসারণ করিয়া সত্ত্বের বিকাশ জন্য তমোনাশক শিব উপাস্য। নাস্তিকগণ প্রায় প্রবল হইয়া পবিত্র আর্য্যধাম নিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেই তমোরাশি বিনাশ জন্য শঙ্করাবতার। সুতরাং তাঁহার প্রতিপক্ষে একদল লোক ছিল, ইহা সহজেই অনুমতি হইতেছে। সেই নাস্তিক-ত্রাস শঙ্করাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা যৌক্তিক ও সত্য; বিশেষতঃ ধারাবাহিক আচার্য্য পরম্পরার উপদেশ বিভাসিত এবং গুরুর অনুমোদিত। সেইজন্যই শঙ্করভাষ্যের এত গৌরব ও শ্রদ্ধা। দ্বৈতবাদিগণের মধ্যে রামানুজ প্রমুখ কতিপয় অধস্তন, পণ্ডিত শঙ্করভাষ্যের প্রতিকূলতাচরণ করিতে গিয়াও উহার নিকটে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই নিস্তেজ হইয়া প্রান্তে অবস্থান করিতেছেন। তাদৃশ লোকের দুই একজন মায়াবাদকে অবৈদিক বলিয়া লোকের মনে অশ্রদ্ধা জন্মা-ইতে চেষ্টা করিয়া নিজেরাই অশ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিয়াছেন। কারণ, সত্যের জয় চিরকালই প্রবল হইয়া উঠে। মায়ামুগ্ধেরা যাহাই বলুন্ না কেন, মহামায়া ভিন্ন, মায়াপাশচ্ছেদন করিবার উপয়ান্তর নাই।

"মায়াবাদ অবৈদিক" এই কথা কোথায় আছে তাহার অনুসন্ধান করা যাউক। নাই নাই করিয়াও আর্য্যশাস্ত্র প্রচুর রহিয়াছে। বহুবিধ শাস্ত্র থাকিলে তাহার মধ্যে যদি কোন মত দ্বৈধ থাকে, তবে শাস্ত্র-সাঙ্কর্য্য ঘটিয়া অনেকের মনে অশ্রদ্ধা বা সংশয় জন্মিতে পারে, এজন্য দয়ালু শাস্ত্রকারগণ শ্রুত্যনুমোদিত অংশ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন এবং বেদ বিরুদ্ধাংশ পরিত্যজ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে অনুশাসন করিয়াছেন। শ্রুতিই প্রমাণ, শ্রুতিই শরণ। শাস্ত্রকার স্পষ্টাক্ষরে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, উহা গ্রাহ্য বা উহার কিয়দংশ গ্রাহ্য। যথা—

"অক্ষপাদ প্রণীতেচ কাণাদে সাঙ্খ্যযোগয়োঃ।
ত্যজ্যঃ শ্রুতি বিরুদ্ধোংশঃ শ্রুত্যৈক শরণৈর্নৃভিঃ॥"
জৈমিনীয়ে বৈয়াসে চ বিরুদ্ধাংশো ন কশ্চন।

ইত্যাদি পরাশর বচনে দেখা যাইতেছে, জৈমিনি ও ব্যাস শ্রুতিদ্বয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা একান্ত উপাদেয়, পরঃ তাঁহারাই মহাজন, তৎপ্রদর্শিত-পথে বিচরণ করিলে পার পাওয়া যাইবে। জৈমিনি ও ব্যাস ভিন্ন, ন্যায়

সাংখ্য পাতঞ্জলাদির শ্রুতিবিরুদ্ধাংশ পরিত্যাজ্য। যাহা আগম ও সদাচারযুক্ত তাহাই উপাসনীয়। *

এখন যদি মায়াবাদ বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন কোন শাস্ত্রে না থাকে, তবে উহাতে কথঞ্চিৎ অশ্রদ্ধা জন্মিবে বিচিত্র কি? এবং উহা শঙ্করাচার্য্যের স্বকপোল কল্পিত বলিয়া অনেকে গ্রাহ্য করিতেও না পারেন; বস্তুতঃ তাহা নহে। পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে ব্যাস-বাক্যে কোন শ্রুতিবিরুদ্ধ কথা নাই। ব্যাস বেদান্ত দর্শনকে, মূল-বেদান্ত অনুধ্যান করিয়া সঙ্কলন ও রচনা করেন। উহা সূত্রাকারে বিরচিত, সূত্রগুলি অল্লাক্ষরে গ্রথিত। সুতরাং সূত্র তাৎপর্য্য গুরুমুখে অবস্থান করিয়া কার্য্যকালে বহির্গত হয়। শঙ্করাচার্য্য ধারাবাহিক আচার্য্য পরম্পরায় উপদেশ বলে বলিষ্ঠ হইয়া গুরু হৃদয়-কন্দর হইতে ভাষ্যরত্ন উদ্ধার করিয়াছেন এবং উহা তীক্ষ্ণ ও নির্ম্মল করিয়া ধরাধামে প্রচার করিয়াছেন, নাস্তিকগণ তাহার জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া রাত্রিঞ্চরের ন্যায় পলায়িত বা লুক্কায়িত হইয়াছে। যাহা হউক, মায়াবাদ যদি শ্রুতিতে থাকে এবং ব্যাস সূত্রে গ্রথিত হইয়া থাকে, তবে অবশ্য উহা বৈদিক যুক্তিযুক্ত এবং শিষ্টানুমোদিত, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বেদ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ ভাগেই উপনিসদ্ বা বেদান্ত ভাগ রহিয়াছে। মন্ত্র ভাগ সংহিতা বলিয়া পরিচিত এবং অনেক স্থলে বেদ বলিলে যেমন ঐ সংহিতা ভাগ বুঝাইয়া থাকে, কারণ, বেদান্ত ভাগ উপনিষদ্ প্রভৃতি ভিন্ন আখ্যায়ে আখ্যাত হয়। তাহা বলিয়া মন্ত্রভাগ বেদ, ব্রাহ্মণ ভাগ বেদ নহে, ইহা মূর্খের বা ম্লেচ্ছের বিবেচনা। জৈমিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন "মন্ত্র ব্রাহ্মণ-সমষ্টির্ব্বেদঃ"। এইরূপে আপস্তম্বাদি প্রাচীন স্মৃতি বাক্যেও আছে। সুতরাং সংহিতাভাগ, ব্রাহ্মণ-ভাগ, উপনিষদ্ ভাগ যাহা বল সমস্তই বেদ। কার্য্য সৌকর্য্যার্থে মন্ত্র,

---

* এতদ্দারায় ইহা বুঝিতে হইবে না যে, ভগবান্ কপিল ও পতঞ্জলি বেদ জানিতেন না। তবে যে সব বেদ বিরুদ্ধ কথা আছে, তাহা অভ্যুপগম ও প্রৌঢ়ীবাদের দ্বারায় বলা হইয়াছে, ইহা তত্তৎ স্থানেই আছে, সুতরাং কোন বিরোধ নাই। বাস্তবিক সকল আর্য্য শাস্ত্রই এক ও বিরোধবিহীন। বে—সং

ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ প্রভৃতি একই বেদ; খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। কোন গ্রন্থের প্রথম দুই অধ্যায়ই সেই গ্রন্থ, আর শেষ দুই অধ্যায় সেই গ্রন্থ নহে, ইহা একান্ত অর্ব্বাচীনের বচন। মায়াবাদের শ্রুতির উভয়ভাগেই রহিয়াছে। যথা—

"বিশ্বাহি "মায়া" অবসিস্বধাবন্।"

সামবেদ কৌথুমী শাখা।

দ্যোরিবাসী

বিশ্বাহি "মায়া" অবস্বধাবঃ „ „

ঋগ্বেদ আশ্বলায়ন শাখা।

মন্ত্র কাণ্ডের এই দুই স্থল ভিন্ন অন্যত্রও আছে, এতদ্ভিন্ন উপনিষদ্ ভাগ দেখা যাইতেছে। মায়াবাদ উপনিষদ্ ভাগে বিশেষ রহিয়াছে, পরং উহাই মায়াবাদের মূল মন্ত্র। বেদান্ত মায়াবাদের অবতারণা করিয়াছেন, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং মায়াবাদ বৈদিক।

ইন্দ্র মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে॥ বৃহদারণ্যক।

এই শ্রুতি সম্পূর্ণরূপে মায়াবাদ স্থাপন করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন শ্বেতাশ্বতরে রহিয়াছে।

"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।

তস্যাবয়ব ভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥"

শ্রুত্যন্তরে পরমেশ্বরকে মহমায়, এই বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে।

"সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি মহামায়ঞ্চ তদ্ব্রহ্ম।"

অতএব মায়াবাদ শ্রুতির অস্থিগত, সুতরাং বৈদিক এবং উহা ভারতাদি প্রাচীন প্রামাণিক শাস্ত্রেও অনুস্যূত হইয়াছে।

"দৈবীহ্যেষাগুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

ভগবদ্গীতা।

এখন দেখা যাইতেছে, শ্রুতি, স্মৃতি ও ভারতাদি শাস্ত্রে মায়াবাদ রহিয়াছে, অতএব মায়াবাদ শ্রৌত, মায়াবাদ স্মার্ত্ত।

এখন স্থিররূপে বলা যাইতে পারে যে, পদ্মপুরাণ মায়াবাদকে অবৈদিক বলিয়া শঙ্করাচার্য্যকে কটাক্ষতঃ গোপনে গ্লানি করিতে বসিয়াছেন, উহা পদ্মপুরাণের কলঙ্ক। পদ্মপুরাণকে অক্ষত রাখিতে হইলে বলিতে হয় উহা

প্রক্ষেপ। কোন গোঁড়া দ্বৈতবাদি কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়া শঙ্করভাষ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যকালে তাহাই অনাদৃত হইয়া ভাষ্যরত্নের বিমল জ্যোতি চতুর্দ্দিগে বিকীর্ণ হইয়াছে। পাঠক-বর্গের অবগতির জন্য পদ্মপুরাণের সেই বচন তুলিয়া দিতেছি।

পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীর প্রতি ঈশ্বরবাক্য।

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণ মাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥
প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্।
মচ্ছক্ত্যা বেশিতৈর্ব্বিপ্রৈঃ সংপ্রোক্তানি ততঃ পরম্॥
কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ।
গোতমেন তথান্যায়ং সাঙ্খ্যন্তু কপিলেনচ॥
দ্বিজন্মনা জৈমিনিনা পূর্ব্ববেদমপার্থতঃ।
নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতংশাস্ত্রং মহত্তরম্॥
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাক মতিগর্হিতম্।
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনাবুদ্ধরূপিণা॥
বৌদ্ধশাস্ত্র মসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্।
মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মেবচ॥
ময়ৈব কথিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা।
অপার্থং শ্রুতি বাক্যানাং দর্শয়ল্লোঁক গর্হিতম্॥
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্ব মত্র চ প্রতিপাদ্যতে।
ব্রহ্মণোস্য পরং রূপং নির্গুণং দর্শিতম্ ময়া॥
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে।
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদ মবৈদিকম্॥
ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশকারণাৎ॥"

প্রায় শাস্ত্রেরই নিন্দা, ইহাতে বর্ণিত আছে। পরব্রহ্ম নির্গুণ, এই কথাও ইহার লেখায় বিনিন্দিত। মায়াবাদকে বিশেষরূপে আক্রমণ করিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি মায়াবাদ অসৎ শাস্ত্র নহে, মায়া-বাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ নহে এবং মায়াবাদ অবৈদিক নহে। উহাতে শ্রুতির অপার্থ নাই, ধারাবাহিক আচার্য্য পরম্পরার বিমল উপদেশ। উহা গুরুর

অনুমোদিত। তবে কেন বলিব না, পদ্মপুরাণ প্রক্ষেপ দোষে দূষিত হইয়াছে। আরও দেখা যাইতেছে “ময়ৈব কথিতং দেবি!” এই বাক্যাংশে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে,—মায়াবাদ প্রচারিত হইবার বহু পরে এই বচন রচিত হইয়াছে, নচেৎ “কথিত” পদ থাকিত না। বলার সময়ের অনেক পূর্ব্বে মায়াবাদ প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া উহা পরে ঈর্ষাময়ী লেখনী প্রসূত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, মায়াবাদ বৈদিক ইহা দেখান হইল। এখন আর একটী কথা বলিয়া প্রস্তাব শেষ করা যাইতেছে।

অনেকে দ্বৈতবাদী মায়াবাদকে বৈদিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, যেমন শাণ্ডিল্য সূত্রে স্বপ্নেশ্বরাদি সুতরাং মায়াবাদ বৈদিক। তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে “মায়া” এই কথাটি ব্যাস সূত্রে নাই বলিয়া উহা ব্যাসের অভিপ্রেত নহে বলিতে চাহেন, তাহাও সঙ্গত বোধ হয় না। কারণ ২য় অধ্যায়ের প্রথম পাদে “সর্ব্বোপেতাচ তদ্দর্শনাৎ।” এই সূত্রে সর্ব্বোপেতা মায়া ভিন্ন আর কিছু নহে।

“সর্ব্বোপেতা মায়া শক্তিমতো ব্রহ্মণঃ, ইত্যাদি টীকা। এই সূত্র ভিন্ন “প্রকৃতিশ্চ”—একটী সূত্র আছে। পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে, মায়া ও প্রকৃতি একই কথা। মায়ার নামান্তর প্রকৃতি। সুতরাং কি দিয়া বলিব যে উহা ব্যাসের অভিপ্রেত নহে, যখন প্রত্যক্ষ শ্রুতিতে রহিয়াছে, তখন ব্যাসের অনভিপ্রেত নহে, ইহা একরূপ নিশ্চয়।

মায়াবাদ বৈদিক, সুতরাং শিষ্টানুমোদিত। লোকে ঈর্ষা কষায়িত-লোচনে যাহা দেখুন, তাহা কখনই প্রচারিত হয় না। সুতরাং গ্রাহ্য হয় না। এখন এই মায়াময় সংসারের ভিতরে ভিতরে বিচরণ করিয়া মায়ার সীমা যাহাতে অতিক্রম করা যায়, তাহার জন্য সতত মহামায়ার নির্ম্মল মধুময় চরণসরোজের ছায়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করা মতিমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যাহার যেমন শক্তি, যাহার যেমন জুটিয়া উঠে, তাহার তেমন ভাবেই আরাধনে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

"অথ যজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়ঃ।"*

নমস্তে রুদ্র মন্যব উতোত ইষবে নমঃ।
বাহুভ্যা মুত তে নমঃ ॥ ১ ॥

যাতে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া ন স্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভি চাকশীহি ॥ ২ ॥

যামিষুং গিরিশন্তহস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মাহিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥ ৩ ॥

সরলার্থ। হে রুদ্র! তোমার ক্রোধকে নমস্কার। তোমার বাণকে নমস্কার। এবং তোমার বাহুযুগলকে নমস্কার ॥ ১ ॥

ভাবার্থ। যিনি পাপিগণকে, দুঃখ দিয়া ক্রন্দন করান,—ঈদৃশ পরাৎপর পরমেশ্বরকে রুদ্র কহে। প্রাণিগণ যে পাপ ফলে, দুঃখ পায়, সে স্থলে রুদ্র, কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ এই ত্রিবিধ কারক হইয়া, প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

ক্রোধ কর্ত্তা, দুঃখ (বাণ) কর্ম্ম, এবং দুঃখ সাধন শারীর চেষ্টা-যুক্ত বাহুযুগল করণ। বাহুদ্বয়, ক্রোধজনিত কার্য্যের প্রধান সহায়. এইজন্য পাদাদির উল্লেখ না করিয়া কেবল ইহারই উল্লেখ হইয়াছে। বস্তুতঃ "দেখিও কাকে যেন দধি না খায়' এবাক্যে, কাক শব্দ, কেবল কাককে না বুঝাইয়া, দধি ভক্ষক সকল প্রাণির বোধক, তদ্রূপ এই বেদের বাহু শব্দ কেবল, হস্তেন্দ্রিয় না বুঝাইয়া, ক্রোধ জনিত যে দুঃখ বাণ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই দুঃখ-বাণের সাধন, সকল ইন্দ্রিয়কেই বুঝাইবে। ফলিতার্থ, ক্রোধ উপস্থিত হইলে, ইন্দ্রিয় সকল বিচলিত হয়। ইন্দ্রিয় বিচলিত হইয়াই দুঃখকে আনয়ন করে। উপাসক, এস্থলে ক্রোধকে রুদ্রের অন্যতম স্বরূপ বলিয়া দেখিতেছেন, দুঃখকে রুদ্রদেবের অন্যতম অস্ত্র বাণ দেখিতেছেন এবং দুঃখ সাধন ইন্দ্রিয় সকলকেও রুদ্রদেবেরই বাহু বলিয়া ভাবনা করিতেছেন। বস্তুতঃ

---

* এই প্রবন্ধটী আমরা যথাযথ প্রকাশ করিলাম। বেদের এরূপ রূপক বর্ণনা, সকল হিন্দুর ভাল লাগিবে কি না, বলিতে পারি না। বেদের এই সমস্ত বিষয় যাহাতে, ভালরূপ আলোচনা হয়, তজ্জন্যই আমরা এ প্রবন্ধটী যেরূপ পাইলাম, সেইরূপই সন্নিবেশিত করিলাম। বে, সং।

অনুভব করিয়া দেখ, সমস্তই সত্য; বাক্যের সজ্জাতে রূপক থাকিলেও অর্থেতে পূর্ণ সত্যতা বিরাজিত রহিয়াছে।

সরলার্থ। হে রুদ্র! তোমার শরীর মঙ্গলরূপ। তোমার শরীর সৌম্য দর্শন। তোমার শরীর পুণ্যফল প্রদাতৃ। হে গিরিশন্ত! তুমি, তোমার ঈদৃশ মঙ্গলময় শরীর দ্বারা, আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর॥ ২॥

ভাবার্থ। রুদ্র শব্দ নানার্থ। যিনি দুঃখ বিনাশন অর্থাৎ শিব বা মঙ্গল রূপ, তাঁহাকেও রুদ্র কহে। এ মন্ত্রে যিনি মঙ্গলরূপিশিব, সেই রুদ্রদেবের নিকট উপাসক প্রার্থনা করিতেছেন। যিনি শিব, তিনি রুদ্র; সুতরাং সৌম্য-দর্শন। এই সৌম্যদর্শনের দর্শন, পুণ্যের প্রথম ফল; দ্বিতীয় ফল চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তি, সেইটি এই সৌম্যদর্শন-শিব-দর্শনান্তর ভাবি। যিনি কৈলাসে অবস্থিত হইয়া, সর্ব্বত্র প্রাণিগণের, সুখ বিস্তার করেন, তাঁহাকে "গিরিশন্ত" কহে। যেমন পুরীবাষ্প (গ্যাস) তাহার আকরে (গ্যাস আফিসে) থাকিয়া নলের ভিতর দিয়া সর্ব্বত্র নগরময় আলোক বিস্তার করিতেছে, তদ্রূপ আমাদের ঈশ্বরও গিরিতে (কৈলাসে) থাকিয়া প্রাণিগণের সুষুম্না নাড়ির ভিতর দিয়া, সর্ব্বত্র শরীরময় সুখজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছেন! অথবা, বাক্যে অবস্থিত হইয়া, যিনি সুখ বিস্তার করেন, তাঁহাকে গিরিশন্ত কহে। বাক্য বলিতে বেদ-বাক্য। বেদবাক্যে অর্থরূপে নিত্য অবস্থিত। অর্থস্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য, তাঁহার অবস্থিতি বেদ-বাক্যে নিত্য সম্বন্ধে, সেই সম্বন্ধ বাচ্যবাচক ভাব। বাচ্য ঈশ্বর বাচক বেদ শব্দ। সম্বন্ধ নিত্য, যখন তখন সম্বন্ধিও নিত্য। এখানে সম্বন্ধি দুই, ঈশ্বর ও বেদ। ইহারা উভয়েই নিত্য। ঈশ্বর উপলক্ষণ মাত্র, ঈ অর্থ-শব্দে, ঈশ্বরের বিধি নিষেধও বুঝিবে। সুতরাং যিনি বেদ শব্দে অর্থরূপে অবস্থিত হইয়া, সেই নিজ স্বরূপ বেদার্থ দ্বারা, মানবগণের কল্যাণ বিস্তার করিতেছেন, তিনি "গিরিশন্ত।" অথবা 'গিরি' বলিতে মেঘ; যিনি মেঘের মধ্যে থাকিয়া, বৃষ্টি দ্বারা জগতের কল্যাণ বিস্তার করিতেছেন, তিনি "গিরিশন্ত" অথবা যিনি গিরি নিবাসী অথচ সর্ব্বজ্ঞ—সকল স্থানের সংবাদ অবগত হইয়া থাকেন, তিনি "গিরিশন্ত"। "মঙ্গলময় শরীর দ্বারা, আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর" বেদের এই বাক্য, ঈশ্বর যে আমাদের ন্যায় ইন্দ্রিয়াধীন নহেন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ করিল। আমরা চক্ষু দ্বারা দৃষ্টি করিয়া থাকি, কিন্তু রুদ্র বা শিব স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপ, তিনি তাঁহার শরীর দ্বারাই দর্শন করিবেন সন্দেহ কি?

সরলার্থ। হে গিরিশন্ত! অন্ত করিবার জন্য তুমি হস্তে যে বাণ ধারণ করিয়াছ; হে গিরিত্র! সেই বাণ কল্যাণ-কর কর, পুরুষ হিংসা করিও না; জগৎ হিংসা করিও না॥ ৩॥

ভাবার্থ। রুদ্রের হস্তে জগৎ অন্ত করিবার শস্ত্র আছে। মনে করিলে তিনি, সকল সময়েই অন্ত করিতে সমর্থ, তথাপি অকালে অন্ত করা তাঁহার স্বভাব নহে, যেহেতু তিনি "গিরিত্র" অর্থাৎ গিরিতে অবস্থিত হইয়া, ভূত সকলের রক্ষা কার্য্যও তিনিই করিতেছেন। ব্রাহ্মণ যেমন একই মুখ দ্বারা, অভিশাপ ও আশীর্ব্বাদ উভয়ই প্রদান করেন, তদ্রূপ রুদ্রও একই বাণ দ্বারা, অন্তও করিতেছেন এবং রক্ষাও করিতেছেন। অভিশাপোন্মুখ ব্রাহ্মণ যেমন স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অভিশাপের স্থানে আশীর্ব্বাদ দেন, তদ্রূপ রুদ্রও নাশ করিবার জন্য উদ্যত-বাণ হইয়াও স্তবে তুষ্ট হন এবং সেই রুদ্র-সন্তোষ রূপ মানবের পুণ্যে,নাশ-জনক দুরদৃষ্ট লুপ্ত হইয়া যায়, তখন সুতরাং রুদ্রকেও "আশুতোষ" হইতে হয়, তাঁহার অন্তকারি উদ্যতবাণও তখন শুভকারী হইয়া উঠে। "পুরুষ হিংসা করিও না" এখানে পুরুষ বলিতে কেবল প্রার্থয়িতার উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে বুঝাইবে। "জগৎ হিংসা করিও না" এস্থলে 'জগৎ' সাধারণকে বুঝাইতেছে। এই শেষ বাক্য, সাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষা যে, কর্ত্তব্য ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে।

শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছা বদামসি।
যথা নঃসর্ব্বমিজ্জগদয়ক্ষ্মং সুমনা অসৎ॥ ৪॥

সরলার্থ। হে গিরিশ! স্তুতিরূপিমঙ্গলবাক্যদ্বারা, তোমাকে লাভ করিবার জন্য, আমরা প্রার্থনা করিতেছি; যথা,—আমাদের সকলকেই নর-পশ্বাদি জগৎ মাত্রকেই এরূপ কর, যাহাতে নীরোগ ও স্বস্থচিত্ত হয়॥ ৪॥

ভাবার্থ। মঙ্গলবাক্য বেদ বাক্য। প্রধান উদ্দেশ্য বেদপুরুষের সন্দর্শন সেই সন্দর্শন, একমাত্র তাঁহাকে আশ্রয় না করিলে, কখনই হইতে পারে না। সেই জন্য মঙ্গলবাক্য বা বেদবাক্য অবলম্বন করাই, সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এবং বেদ বলিতেছেন যে, আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছুক, সে আদৌ আমার আদি স্বরূপ বেদ আশ্রয় করুক। আর যে বেদ আশ্রয় করিবে, সে, সাধা-রণের হিতকামী হউক।

অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যো ভিষক্।
অহীংশ্চ সর্ব্বাঞ্জম্ভয়ন্ৎ সর্ব্বাশ্চ যাতুধান্যোধরাচীঃ পরাসুব ॥ ৫ ॥

সরলার্থ। রুদ্র, আমাকে সর্ব্বাধিক বলুন। রুদ্র, অতিশয় বক্তা এবং দেবগণের হিতকারী ও প্রথম শ্রেণীর এক জন অদ্বিতীয় ভিষক্। হে রুদ্র! তুমি সর্প ব্যাঘ্রাদি হিংস্রকগণকে, বিনাশ করিয়া, অধোদেশে গমনশীল রাক্ষসীগণকে, আমাদিগের নিকট হইতে, দূর করিয়া দাও ॥ ৫ ॥

ভাবার্থ। ঈশ্বর বড় না করিলে, কেহ বড় হয় না। ঈশ্বর যদি বলেন, "তুমি বড়" তাহা হইলে তুমি সর্ব্বাধিক্য লাভ করিতে পারিবে, অন্যথা নিজ পুরুষার্থে কখনই কেহ বড় হয় না। পুরুষার্থ-বিহীন নিরক্ষর, মহা-মূর্খ, অথচ বড়লোক এরূপ ব্যক্তি, লোকে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্ত ইহার উদাহরণ বুঝিবে। রুদ্রদেবের নামোচ্চারণে রোগনাশ হয়, এই জন্য ইনি ভিষক্। বাস্তবিক কিছু খল নুড়ি লইয়া, ঔষধ প্রস্তুত করেন না। দেব শব্দ সত্ত্বগুণের প্রাধান্যদ্যোতক মাত্র; সুতরাং দেব-ভাবাপন্ন সাত্ত্বিক প্রকৃতি সর্ব্ব জীবেরই, রুদ্র হিতকারী। সর্পাদি হিংস্রক জাতি সকল তমঃ প্রকৃতি। ইহাদের বিনাশ যত শীঘ্র হইবে, ততই ইহাদের উন্নতি হইবে, সেই জন্যই বেদে ইহাদের বিনাশ কামনা শ্রুত হইয়াছে। যে সকল মায়াবিনী পাপভারে ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতেছে, তাহারাই অধোগমনশীল রাক্ষসী। ইহাদের সঙ্গ অসৎ সঙ্গ। এই অসৎসঙ্গ লোকে প্রায়শঃ অনিবার্য্য। তজ্জন্য প্রার্থনা করা হইল।

অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ।
যেচৈনং রুদ্রা অভিতোদিক্ষু
শ্রিতাঃসহস্রশোঽবৈষাং হেড় ঈমহে ॥ ৬ ॥

সরলার্থ। যে এই প্রত্যক্ষ রবিরূপী রুদ্র, এবং যে সকল কিরণরূপী অসংখ্য রুদ্র, ইঁহাকে চারিদিগে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, আমাদের অপরাধ নিমিত্ত ইঁহাদের যে ক্রোধ হইয়াছে, আমরা এক্ষণে সেই ক্রোধ ভক্তি দ্বারা নিবারণ করিতেছি। এই প্রত্যক্ষ রুদ্র, উদয়ে অত্যন্ত রক্তবর্ণ, অস্তকালে অরুণ বর্ণ এবং তদ্ভিন্ন সময়ে পিঙ্গলবর্ণ। ইনি আমাদের সর্ব্বথা মঙ্গল-রূপ ॥ ৬ ॥

ভাবার্থ। সূর্য্য, রুদ্রের অন্যতম রূপ। এইরূপ, রুদ্রের প্রত্যক্ষ, সাধারণের উপাস্য স্বরূপ। এই জন্য দ্বিজাতিগণের, ইনি আরাধ্য দেবতা। ইহাঁর কিরণ সকল, ইহাঁর অংশ বিশেষ। এইজন্য কিরণ সকলকেও রুদ্র বলা যায়। সাধারণে স্থূলচক্ষু দ্বারা, সূর্য্যকে জড় পদার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন, কিন্তু "যোসাবাদিত্যে সোহমস্মীতি" শ্রুতি দ্বারা সূর্য্যেস্থিত আত্মাই পরমাত্মা, সেই পরমাত্মা সূর্য্য হইতে ভিন্ন নহেন, তবে যে পরিধি নিয়মিত হইয়াছে, সে কেবল পৃথিবীর পরিধি দ্বারা ঔপাধিক। যেমন আকাশের পরিধি নাই, তথাপি পৃথিবী সম্বন্ধে থাকিয়া, পরিধি কল্পিত হয়। উপরে আকাশের দিগে দৃষ্টি কর, দেখিবে—আকাশ যেন একখানি সরার ন্যায় ঢাকা রহিয়াছে। বাস্তবিক কি আকাশ সরার ন্যায়? তবেত পরিধি আছে? না, ইহা প্রকৃত নহে। ইহা পৃথিবীর সম্পর্কজাত ভ্রম-ঔপাধিক। সেইরূপ সূর্য্য-আত্মা সূর্য্যমণ্ডল হইতে ভিন্ন নহেন, সূর্য্যমণ্ডলেরও পরিধি নাই। আকাশবৎ অনন্ত অসংখ্য কিরণ সমূহই সূর্য্য মণ্ডল এবং সেই সূর্য্য মণ্ডল ও পরমাত্মা, বা তৎশক্তি—বা রুদ্র একই বস্তু; এবং কিরণও এক অভিন্ন। কালপদার্থবৎ কল্পিত ভেদ বিশিষ্ট, ইনি আমাদের গায়ত্রী শক্তি। ইনি আমাদের নারায়ণ। ইহাঁরই উপাসনা করিয়া আমরা, সর্ব্ব রোগ, শোক হইতে মুক্ত হইয়া থাকি। এই প্রত্যক্ষ রুদ্র আমাদের শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী। অপরাধ করিলে, ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন। এ ক্রোধ আমাদের ন্যায় নহে। তবে, দণ্ড্য ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে হইলে, দণ্ডদাতার হৃদয়ে যে দণ্ড দিবার ইচ্ছা, এখানে সেই ইচ্ছামাত্র বুঝিতে হইবে। এই ইচ্ছা, অপরাধের জন্য হইয়া থাকে। ভক্তি দ্বারা অপরাধের শান্তি করিলে, সে ইচ্ছারও শান্তি আছে॥ সূর্য্য সম্বন্ধে আরও অনেক বক্তব্য আছে, পরে ক্রমশঃ প্রকাশ হইবে॥

অসৌ যোঽবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ।
উতৈনং গোপা অদৃশ্রন্নদৃশ্রন্নুদহার্য্যঃ সদৃষ্টো মৃড়য়াতিনঃ॥ ৭॥

সরলার্থ। যে এই আদিত্যরূপী রুদ্র, নিরন্তর উদয়াস্ত করিয়া বেড়াইতেছেন, ইনি নীলগ্রীব, ইনি বিলোহিত। ইহাঁকে গোপেরাও দেখিতেছে। ইহাঁকে উদকহারিণী অঙ্গনারাও দেখিতেছে। ইনি দৃষ্ট হইয়া আমাদের সকলকে সুখী করুন্॥ ৭॥

ভাবার্থ। এই মণ্ডলবর্ত্তী রুদ্রই পরমাত্মা। ইনিই স্বীয় কিরণ দ্বারা সৃষ্টিস্থিতি ও লয় করিতেছেন। এইরূপ আলোচনা করিলে, ইনি দৃষ্ট হন। এইরূপে ইনি যখন দৃষ্ট হন্, তখন আমরা সুখী হই। এই রুদ্রই উদয় হইয়া, তীক্ষকিরণ বিস্তার এবং অস্তদ্বারা সান্দ্রকিরণ বিস্তার করিয়া, জগৎ রক্ষা করিতেছেন। চন্দ্রমা হইতে যে কিরণ আইসে, উহা সূর্য্যের সান্দ্র কিরণ। "অত্রাহ গোরমন্বত" এই মন্ত্রে এ বিষয় স্পষ্ট আছে। বিষধারণ করিয়া ইনি, নীলগ্রীব হইয়াছেন। পৃথিবীর অর্থাৎ কি জল, কি স্থল, সর্ব্ব-স্থানেই জীবন হানি কর, বিষ বা বাষ্প আছে এবং প্রত্যহ হইতেছে, সে সমস্ত এই সূর্য্য বা রুদ্রদেব, আপন কিরণ দ্বারা, আকর্ষণ করিতেছেন, সুতরাং নীলগ্রীব বা নীলকণ্ঠ নামে অভিহিত হইলেন। এবং এই সূর্য্য-রূপী রুদ্রই, পৃথিবী, চন্দ্র, ও নক্ষত্র সকলের রঞ্জন-কারী, সুতরাং ইহাঁকে "বিলোহিত" বলা যায়, যাঁহারা জ্ঞানী, দর্শন-চক্ষুঃ, তাঁহারা ইহাঁকে নীলগ্রীব বা নীলকণ্ঠ দেখিতে পান, কিন্তু ইহাঁর বিলোহিত ভাব, সাধারণেই দেখিতে পাইতেছে। এমন কি, যাহারা অতি মূর্খ, চাষা-গোয়ালা এবং কক্ষ-ধৃতা কুম্ভা জলানয়নকারিণী সামান্য অঙ্গনাগণও ইহাঁর বিলোহিত মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দিত হইয়া থাকে। অতএব এই রুদ্রদেবের রূপ সকলেই দেখিতেছে। এই জন্যই সকলে আনন্দিত হইতেছে। আনন্দ ইহাঁর দর্শন বিনা হয় না। যিনিই সজীব, তিনিই সানন্দ এবং যিনিই সানন্দ, তিনিই ইহাঁর যে কোনরূপ হউক্ না কেন দেখিতেছেন বা দেখিয়াছেন। ধূমের সহিত বহ্নির যেমন সাধনাভাব সম্বন্ধ, তদ্রূপ আনন্দের সহিত রুদ্র দর্শনেরও সাধনাভাব সম্বন্ধ। মুখ বিকাসাদি যেমন আনন্দের চিহ্ন, চৈতন্যের অব-স্থিতি যেমন আনন্দের চিহ্ন, তদ্রূপ আনন্দও রুদ্র দর্শনের চিহ্ন এবং আত্মো-ন্নতি বা ধর্ম্মোন্নতিও রুদ্র দর্শনের চিহ্ন বুঝিতে হইবে।

নমোঽস্তু নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীঢুষে।

অথো যে অস্য সত্বনোঽহং তেভ্যোঽকরং নমঃ ॥ ৮ ॥

সরলার্থ। অনন্তচক্ষুঃ, সেক্তা, নীলগ্রীবকে নমস্কার করি। এবং যেসকল প্রাণিরা ইহাঁর ভৃত্য আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি ॥ ৮ ॥

ভাবার্থ। অনন্তচক্ষুঃ বা সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের পর্য্যায় শব্দ। রুদ্র ইন্দ্ররূপী। ইহাঁকে দেবাদিদেব মহাদেব ইন্দ্র বলিয়া ব্যবহার করিতে পার। পর্জ্জন্য

সেক্তা, বা বরুণদেব একই পর্য্যায়। রুদ্র আমাদের সেক্তা। অতএব ইহাঁকে পর্জ্জন্যাদি শব্দেও ব্যবহার করিতে পার। সুতরাং এই ইন্দ্র, সূর্য্য, বা রুদ্রদেবের অনুগত ভূতগণ এখানে তাঁহার উপাসক ভক্তগণ। কেহ কেহ "মেষ, বৃষ প্রভৃতি দ্বাদশ রাশিকে কহেন। রুদ্র, আমাদের ন্যায় চক্ষুর্ব্বিশিষ্ট না হইলেও জড়পদার্থ নহেন, কিন্তু তাঁহার অনন্তদৃষ্টি,—এই জন্যই তিনি 'সহস্রাক্ষ ইন্দ্র' নামে অভিহিত। যদি এরূপ, তবে জড়পদার্থবৎ একরূপ নিয়মিত তাপই প্রদান করেন কেন? না, সে কথাও বলিতে পার না, কেন না ইনি যেমন তাপপ্রদ সেইরূপ আবার জলপ্রদ, অতএব ইহাঁকে সেক্তা বা পর্জ্জন্য বা বরুণদেব বলিয়া জানিবে।

জন্মান্তর। *

দুর্লভ মানবদেহ লাভ করিয়া, ধর্ম্মের উপাসনা ও অধর্ম্মের পরিহার করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদিও নিরবশেষে ধর্ম্মোপাসনা ও অধর্ম্ম পরিহার করা সংসারীর পক্ষে একান্ত দুর্ঘট, তথাপি যতদূর পারা যায়, তৎপক্ষে যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মই আমাদিগের পরম মিত্র ও অধর্ম্মই আমাদিগের পরম শত্রু।

ধর্ম্মোবিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধার্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি।
ধর্ম্মেণ পাপমপনুদন্তি ধর্ম্মেণ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি॥
তৈত্তিরীয়শ্রুতি॥

ধর্ম্ম সমস্ত জগতের গৌরবস্বরূপ, ধর্ম্মিষ্ঠ লোকের নিকটেই প্রজাগণ উপগত হয়। ধর্ম্ম দ্বারা পাপের অপনোদন হয়। ধর্ম্মবলে সমস্ত বস্তুই প্রতিষ্ঠিত। এই নিমিত্ত ধর্ম্মই পরম পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ধর্ম্মের পরিণাম ইষ্টসিদ্ধি ও অধর্ম্মের পরিণাম অনিষ্ট প্রাপ্তি।

---

* পূর্ব্বস্থলীর প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের প্রবন্ধ সাদরে যথাযথ প্রকাশ করিলাম। বে, সং।

ধর্ম্মাদ্বিবৰ্দ্ধতে হ্যায়ুরাজ্যং পুত্রসুখাদিচ।
অধর্ম্মাদ্ব্যাধি শোকাদি ইত্যাদি ॥

দেবীপুরাণ॥

ধর্ম্মহেতুক আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। এবং রাজ্য, পুত্র ও সুখাদি উৎপত্তি হয়। অধর্ম্মহেতুক ব্যাধি শোকাদি হইয়া থাকে।

আমরা জন্মান্তরে, যে সকল ধর্ম্মাধর্ম্মের জনক ধর্ম্ম করিয়াছি, তাহারাই ইষ্ট ও অনিষ্ট ফলরূপে পরিণত হয়। বর্ত্তমান জন্মে যে কিছু ধর্ম্মাধর্ম্মের অর্জ্জন করি, তাহার ফল জন্মান্তরে উৎপন্ন হয়।

মহর্ষি মনু লিখিয়াছেন যথা—

ধর্ম্মংশনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকমিব মৃত্তিকাঃ।
পরলোক সাহায্যার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্ ॥
নামুত্রহিসহায়ার্থং পিতা মাতাচ তিষ্ঠতি।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥
একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোহনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এবচ দুষ্কৃতম্ ॥
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখাবান্ধবাযান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥
তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্ ॥
ধর্ম্মপ্রধানঃ পুরুষং তপসা হৃতকল্মষম্।
পরলোকং নয়ত্যাশু ভাস্বন্তং স্বশরীরিণম্ ॥

যেমন উই নামে প্রসিদ্ধ পিপীলিকাগণ, অল্পে অল্পে বল্মীক অর্থাৎ স্বীয় বাসস্থান রূপ মৃত্তিকাকূট সঞ্চয় করে, সেইরূপ পরলোকের সাহায্যার্থ, অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাতে পরপীড়া না হইতে পায়। যে হেতু, পারলৌকিক সাহায্যের নিমিত্ত পিতা, মাতা, পুত্র, কলত্র বা জ্ঞাতিবর্গ কেহই বিদ্যমান থাকেন না, কেবল ধর্ম্মই সহায়রূপ হইয়া বর্ত্ত-মান থাকেন। জীবগণ একাকী জন্মগ্রহণ করে। একাকীই পরলোক যায়। এবং পাপ পুণ্যের ভোগও একাকী করে, তাহাতে বন্ধুগণ, কেহই সহকারী থাকেন না। অর্থাৎ বন্ধুগণের অনুরোধেও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে

নাই। বন্ধুগণ মৃতদেহটী, কাষ্ঠখণ্ড বা মৃৎখণ্ডের ন্যায় ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, পরাঙ্মুখ হইয়া প্রতিগমন করে, কেবল ধর্ম্মই মৃতব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে যায়। সেই হেতু পারলৌকিক সাহায্যের নিমিত্ত নিত্যই অল্প অল্প ধর্ম্ম সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। যে হেতু সহায়ভূত ধর্ম্ম দ্বারা দুস্তর নরকাদি দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অপনীতপাপ অথচ ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিকে, ধর্ম্মই দীপ্তিমান্ ও ব্রহ্মস্বরূপ করিয়া, পরলোকে প্রাপণ করিয়া থাকে।

ধর্ম্মাধর্ম্ম যে কেবল, জন্মান্তরেই ফলপ্রসব করে এমত নহে। প্রবলতর হইলে, বর্ত্তমান জন্মেই ফলোৎপাদন করিতে পারে।

ত্রিভির্ব্বর্ষৈস্ত্রিভির্ম্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে ॥

প্রবলতর পাপপুণ্যের ফল, তিন বর্ষ, তিন মাস, তিন পক্ষ বা তিন দিনেই হউক ইহজন্মেই ভোগ করে।

অধর্ম্ম স্থলে মনুও লিখিয়াছেন—

ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্ব্বকৃতৈস্তথা।
প্রাপ্নুবন্তি দুরাত্মানো নরা রূপবিপর্য্যয়ম্ ॥

"কোন কোন দুরাত্মা ঐহিক দুষ্কর্ম্মানুসারে, কেহ কেহ জন্মান্তরীণ দুষ্কর্ম্মানুসারে, বর্ত্তমান জন্মে অন্ধত্ব, বধিরত্বাদিরূপ রূপবৈপরীত্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

অতএব আমরা সংসার দশায়, যে কিছু সুখানুভব করি, প্রায় সেসমস্তই জন্মান্তরীণ সুকৃতির ফল। যে সকল দুঃখানুভব করি, তাহাও জন্মান্তরীণ দুষ্কৃতির ফল।

পুরাকৃতানি পাপানি ফলন্ত্যস্মিং স্তপোধনাঃ।
রোগদৌর্গত্যরূপেণ তথৈবেষ্টবধেনচ ॥

মৎস্যপুরাণ ॥

"হে তপোধন গণ! পূর্ব্বজন্মার্জিত পাপ সমুদায়, ইহজন্মে রোগ, দারিদ্র্য ও ইষ্টবিয়োগরূপে পরিণত হয়।"

যাঁহারা জন্মান্তর স্বীকার করেন, তাঁহারাই আমাদিগের এই সকল বাক্যের লক্ষ্য। যাঁহারা জন্মান্তর স্বীকার করেন না, জন্মান্তরের সত্তা

প্রমাণ না করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট এ সকল কথার প্রস্তাব করা নিতান্ত উপহাসাস্পদ হইবে সংশয় নাই। অতএব জন্মান্তর স্বীকার সম্বন্ধে, যে সকল প্রমাণ গ্রন্থকারেরা উপন্যস্ত করিয়াছেন, তাহা এস্থলে প্রদর্শন করা আবশ্যক। জন্মান্তর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ নাই। কেবল শব্দ অর্থাৎ প্রত্যয়িত বাক্য ও অনুমান, এই উভয়বিধ প্রমাণই প্রমাণরূপে আদৃত ও বলবৎ হইতে পারে। আর্য্যশাস্ত্রে এ বিষয়ে ঐ সকল আপ্তবাক্য এত প্রচুর পরিমাণে আছে যে, কোন না কোন একখানি গ্রন্থের যে কোন স্থান উদ্ঘাটন করিলেই, তাদৃশ প্রমাণ উপলব্ধ হইতে পারে। শব্দ প্রমাণের এরূপ সৌলভ্যসত্বেও যে সকল লোক জন্মান্তরের পক্ষে অবিশ্বাস করেন, তাঁহারা অবশ্যই ঐসকল বাক্যগুলিকে আপ্ত অর্থাৎ প্রত্যয়িত বলিয়া গণ্য করেন না। একারণ বেদাদিবাক্যরূপপ্রমাণ প্রদর্শন করা অনুপযোগী বিবেচনায়, অনুমান অর্থাৎ যুক্তিরূপ প্রমাণই এ স্থলে প্রদর্শনীয়। অতএব কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১ম। মৃতদেহটী যখন ক্রমে ক্রমে ক্ষিত্যাদিরূপেই পরিণত হয় দেখিতেছি, তখন অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, আমাদিগের দেহটী জড়ময় ভূতসমষ্টিমাত্র। যদি ক্ষিত্যাদি ভূতনিচয়ের চৈতন্য থাকিত তাহা হইলে, তদ্দ্বারা বিনির্ম্মিত দেহের ও চৈতন্যরূপ ধর্ম্মটী স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া নির্ণীত হইতে পারিত। কিন্তু জড়ময় ক্ষিত্যাদির তাদৃশ ধর্ম্ম কখনই অনুভূত হয় না, সুতরাং ঐক্ষিত্যাদি যাহার উপাদান তাহার চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা কি। অতএব ইহাই স্বীকার্য্য, যেমন জলের উষ্ণতা স্বভাবসিদ্ধ নহে, কোন একটী উষ্মা উহার অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকায়, উষ্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ঐ উষ্মার অপগম হইলেই পূর্ব্ববৎ সুশীতল হইয়া যায়। তদ্বৎ এই ভৌতিক দেহের অভ্যন্তরেও কোন একটী চৈতন্যময় পদার্থ অবস্থিত থাকায়, দেহকে চেতন বলিয়া মানিতেছি, ঐ চৈতন্যের বিনির্গম হইলেই দেহটী পূর্ব্ববৎ জড়ময় হইয়া থাকে। ঐ চৈতন্যটীই আত্মা।

এরূপে যদি দেহাতিরিক্ত আত্মনামক একটী পদার্থ দেহে থাকিল, ও মৃত্যুকালে ঐ আত্মার দেহ হইতে বিনির্গমও অঙ্গীকার করিতে হইল, তবে ইহাও অবশ্য মানিতে হইবে, যে দেহের উৎপত্তি কালে আত্মনামক একটী পদার্থের উৎপদ্যমান স্থূলদেহে আবির্ভাব হয়। ঐ স্থূলদেহে আবির্ভাবকেই

তাহার জন্ম বলে ও ঐ স্থূলদেহে আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাহার যে স্থানে আবির্ভাব ছিল, তাহাকেই জন্মান্তর বলে।

এস্থলে এরূপও বলিতে পারেন যে "আত্মা একটী পৃথক পদার্থ বটে, কিন্তু মৃত্যুকালে সে কোন স্থানেই যায় না, উহার একেবারে বিনাশ হইয়া যায়। এবং জন্মকালেও সে কোন স্থান হইতে আসে না, প্রত্যেক দেহোৎপত্তি কালে তাহার উৎপত্তি হয়।"

আত্মার উৎপত্তি মানিলে, জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, ঐ আত্মার উপাদান কারণ কি? অচেতন জড়পদার্থ, না, চৈতন্যময় পদার্থ? অচেতন পদার্থত চৈতন্যের উপাদান হইতে পারে না, সুতরাং চৈতন্যময় পদার্থই তাহার উপাদান বলিতে হইবে। তাহা হইলে চৈতন্যময় বস্তুদ্বারা চৈতন্যময় আত্মার, সৃষ্টি মানাতে, আত্মার উৎপত্তির পূর্ব্বেও চৈতন্য পদার্থের সত্তা স্বীকার করিতে হইল, ও উপাদানভূত চৈতন্যময় পদার্থ এবং কার্য্যভূত চৈতন্য পদার্থের কোন বৈলক্ষণ্য না থাকায়, উৎপত্তির পূর্ব্বে ও চৈতন্যময় আত্মা পদার্থ ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। তবে তাহার আর উৎপত্তি কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি।

যদি কহেন "চৈতন্য পদার্থ পূর্ব্বেও ছিল বটে, কিন্তু সে পদার্থ আকাশের ন্যায় দেহ সম্বন্ধ শূন্য ছিল। দেহের উৎপত্তিকালে ঐ দেহে তাহারই সম্বন্ধ হয়, দেহ বিনাশকালে ঐ আত্মার আকাশবৎ পৃথক্ ভাব হয়। লোকান্তরেও যায় না, উৎপত্তিকালে কোন লোকান্তর হইতে আগত হইয়াও দেহবদ্ধ হয় না।"

এরূপ বাদীকে এই প্রশ্ন করা যায় যে, তাদৃশ আত্মার দেহসম্বন্ধ হওয়ার প্রতি কারণ কি। দেহসম্বন্ধ আপনা আপনি হইয়া থাকে, ইহা স্বীকার করা যায় না। তাহা হইলে অন্যান্য জড়পদার্থের উৎপত্তিকালেও চৈতন্যের সম্বন্ধ হইত ও জীবদেহের কোন কোনটাতে চৈতন্যের সঞ্চার হইত না। যখন অন্যান্য জড়পদার্থ কোনটাতেই চৈতন্যের সত্তা দেখি না, জীবদেহেই অব্যভিচারি রূপে দেখিয়া থাকি, তখন তাদৃশ সম্বন্ধের নিয়ন্তা কেহ আছে অবশ্যই বলিতে হইবে। যদি তদর্থ সর্ব্ব নিয়ন্তা একজন ঈশ্বর মানিয়া, আত্মার দেহ সম্বন্ধ তদধীন বলিয়া, অঙ্গীকার করিতে হয়, তাহা হইলে কর্ম্মানুসারেই ঈশ্বর, জীবের দেহসম্বন্ধ ঘটনা করেন। দেহসম্বন্ধ কেবল ঈশ্বরাধীন নহে, ইহাও অবশ্য মানিতে হইবে। নচেৎ

যাঁহাকে সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতেছি, তাঁহার সদোষতা প্রতিপাদন করা হয়। যেহেতু তিনি কতকগুলি আত্মাকে অত্যন্ত সুখময় দেবাদিশরীরের সহিত এবং কোন কোন আত্মাকে অত্যন্ত দুঃখময় পশ্বাদি দেহের সহিত সম্বন্ধ করিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহার বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাতিতা দোষ সম্ভাবিত হয়। এবং দুঃখসম্বন্ধ বিধান করায়, তিনি নির্ঘৃণ অর্থাৎ সর্ব্বলোকের ঘৃণাস্পদ বা অতি নির্দ্দয় হইয়া উঠিলেন। কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের সৃষ্টি মানিলে, তাদৃশ দোষস্পর্শ হইতে পারে না। যেমন মেঘ, ব্রীহিযবাদি সমস্ত পাদপের উৎপত্তির প্রতি জলদান দ্বারা. সাধারণ কারণ হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রীহিযবাদি পাদপের অবয়ব ভেদ সম্পাদন করে না। তত্তদ্বীজগত অসাধারণ এক একটী বস্তুই, অবয়বভেদের উৎপাদন করিয়া থাকে। তদ্বৎ ঈশ্বরও দেব মনুষ্যাদি সৃষ্টি বিষয়ে সাধারণ কারণ। সুখ দুঃখভোগী দেহভেদের পক্ষে উদাসীন হইয়া থাকেন। তাদৃশ দেহভেদের অসাধারণ কারণ জীবগত ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মগুলিই তাদৃশ দেহভেদের সম্পাদক। এরূপে ঈশ্বর কথনই অপরাধী হইতে পারেন না।

এক্ষণে দেখুন কর্ম্মানুসারে দেহ সম্বন্ধ হয়, ইহা স্বীকার করিলেই জন্মান্তর স্বীকার করা হইল কি না। জন্মান্তর না থাকিলে, উৎপত্তিকালে জীব কর্ম্ম কোথায় পায়। অবশ্যই জন্মান্তর আছে। তৎকালীন কর্ম্মানুসারেই দেহসম্বন্ধ বলিতে হইল। এই নিমিত্ত মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মমীমাংসা গ্রন্থে সৃষ্টির কর্ম্ম সাপেক্ষতা স্বীকার করতঃ ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্যদোষের পরিহার করিয়াছেন যথা—

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।

সুখ দুঃখসম নানাযোনি সৃষ্টি করায় এবং দুঃখসম্বন্ধ বিধান করায়, ঈশ্বরের বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাতিতা নৈর্ঘৃণ্য অর্থাৎ সর্ব্বলোক ঘৃণাস্পদতা বা নির্দ্দয়তা হউক? না, তাহা হইতে পারে না। যে হেতু, সৃষ্টি কর্ম্মানুসারিণী। শাস্ত্রে ও সৃষ্টির কর্ম্ম সাপেক্ষতা দেখাইয়াছেন।

২য়। আরও দেখুন, মনুষ্যবালক গর্ভ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া, যাবৎ স্তন্যপান করিতে না পায়, তাবৎকাল মুখব্যাদন করিতে থাকে। এই মুখব্যাদনটী তাহার আহারের অভিলাষ ব্যঞ্জক। ইহাতে অবশ্যই অনুমিত হইবে যে, ঐ বালকের ক্ষুধায় কষ্ট হইতেছে, তন্নিবন্ধনই আহারের চেষ্টা করিতেছে। বলুন দেখি, ক্ষুধা জন্য দুঃখ যে, আহার করিলেই শান্ত

হয়, ইহা কে তাহাকে শিক্ষা দিয়াছে। স্তনটী তাহার মুখে ধরিলে যে, চোষণদ্বারা দুগ্ধের আকর্ষণ করে, তাহাই বা কে জানাইল। কাহাকেও জানাইতে হয় না। কেবল জন্মান্তরীণ সংস্কার বশতঃ তাদৃশ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে বলিতে হইবে।

৩য়। উত্তানশয় বালকের নিকটে একটা গুরুতর শব্দ হইলে, বালক আতঙ্কিত হইয়া উঠে। কেন উঠে, আমার প্রতি গুরুতর আঘাত হইল ভাবিয়াই ভয়ে আতঙ্কিত হয়। আঘাত হইলে, মরিব বা একান্ত কষ্ট পাইব, ইহা না বুঝিলে, কখনই ভয়ের সঞ্চার হয় না। যে যাহাতে কখনই কষ্ট পায় নাই বা অন্যান্য লোকের তাদৃশ ব্যাপারে কষ্ট পাওয়া কখনই অনুভব করে নাই, সে তাহাতে ভীত হয় কেন? কেবল জন্মান্তরীণ সংস্কার বশতঃই তাদৃশ ভয় পাইয়া থাকে বলিতে হইবে।

৪র্থ। পশুজাতি সর্প দেখিলেই ভীত হইয়া থাকে। সর্প দংশনে মৃত্যু হয়, ইহা তাহাদিগের ঐহিক জ্ঞানগোচর কখনই হয় নাই। কিন্তু দেখিবা মাত্র চীৎকার করিয়া পলায়ন করে। কেন করে? কেবল জন্মান্তরীণ সংস্কার বশতঃই তাদৃশ ভয় উপস্থিত হয় বলিতে হইবে।

৫ম। বানরশিশু মাতৃগর্ভ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াই, হস্ত দ্বারা একটী শাখা অবলম্বন করে, শাখা অবলম্বন না করিলে, শূন্যের ধারণা শক্তি না থাকায়, কখনই থাকিতে পারিব না অবশ্যই পতিত হইব, তৎকালে তাহার ঈদৃশ জ্ঞান না হইলে, শাখা অবলম্বন করে না। তাহার তাদৃশ জ্ঞান কিরূপে হয়? সে কখনই বানরীর প্রসব দেখে নাই, আপনিও আর কখন প্রসূত হয় নাই, তবে তাহার শূন্যের ধারণা শক্তি নাই এ জ্ঞান কেন হইল? কেনই বা সে শাখাবলম্বন করিল। কেবল জন্মান্তরীণ সংস্কার বশতঃই তাহার তাদৃশ জ্ঞানোদয়ও তাদৃশ প্রবৃত্তি হয় বলিতে হইবে।

৬ষ্ঠ। একটী বৃক্ষের নিকটে যদি আর একটী বৃক্ষ রোপণ করা যায়, তাহা হইলে শেষ বৃক্ষটী পূর্ব্বতন বৃক্ষের পরিসর পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় শাখা বিস্তার করতঃ হেলিয়া উঠিবে। যদিও অপর বৃক্ষের লঘু লঘু পল্লব ঐ বৃক্ষের অঙ্গ স্পর্শ করে বটে, তথাপি তাহার এমন ঠেশ লাগে না যে ঐ ঠেশের বলে হেলিয়া উঠে। তাহা দেখিয়া অনুমান করিতে হইবে যে, বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত জীব, সমভাবে উঠিবার প্রতিবন্ধক আছে অনুভব করিয়াই, স্বীয় কলেবরকে বক্র করিয়াছে। প্রতিবন্ধক থাকিলে যে শিরঃসঙ্কোচ করিতে হয়, এ অনুভব

তাহার কিরূপে হইল! কেবল জন্মান্তরীণ সংস্কার বশতঃই তাহার তাদৃশ জ্ঞান ও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে বলিতে হইবে।

অতএব ভগবান মনু বলিতেছেন। যথা—

অপুষ্পাঃ ফলবন্তোযে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ।
পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব বৃক্ষাস্তূভয়তঃ স্মৃতাঃ॥
গুচ্ছগুল্মন্তু বিবিধং তথৈব তৃণ জাতয়ঃ।
বীজকাণ্ডরুহাণ্যেব প্রতানা বল্ল্য এবচ॥
তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখ সমন্বিতাঃ॥

বনস্পতি নামক কতকগুলি বৃক্ষ পুষ্প রহিত হইয়াও ফলবান্। কতকগুলি বৃক্ষ, পুষ্প ও ফল উভয় বিশিষ্ট, এইরূপে বৃক্ষ উভয়রূপ। মল্লিকাদি ও শর ইক্ষু প্রভৃতি বিবিধ প্রকার গুচ্ছ ও গুল্ম এবং বিবিধ প্রকার তৃণজাতি ও অলাবুলতা প্রভৃতি, প্রতান ও গুড়ূচী প্রভৃতি বল্লী, ইহারা সকলেই বীজ হইতে জন্মে, কেহ কেহ শাখা হইতেও জন্মে। পূর্ব্বোক্ত পাদপগণ অধর্ম্ম কর্ম্মজন্য বিচিত্র দুঃখফলক তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া অন্তসংজ্ঞ অর্থাৎ বাহ্য-চৈতন্য ক্রিয়াহীন অথচ সুখ দুঃখ সমন্বিত হইয়া থাকে।

যখন উদাহৃত স্থলে, জন্মান্তরগত সংস্কার স্পষ্টরূপে অনুমিত হইতেছে, তখন জন্মান্তর মানিতে বিমুখ হওয়া কখনই উচিত হয় না।

এস্থলে এক আপত্তি হইতে পারে।

যদি জন্মান্তর সংস্কার বলেই পূর্ব্বলিখিত স্থলে তাদৃশ জ্ঞান হয়, তবে জন্মান্তরের অন্যান্য সংস্কার গুলির বলেও অন্যান্য জ্ঞান হউক না কেন শিক্ষার প্রয়োজন কি?

একথা বলিতে পারেন। তাহার প্রতিবচনও আছে। জন্মান্তরের সমস্ত সংস্কারই থাকে, কিন্তু তন্মধ্যে যে সকল সংস্কার নানা জন্মে ফলোপধান করিতে না পারায়, সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত থাকে। জীবের স্থূল শরীরান্তর পরিগ্রহ হওয়াতে ঐ সকল সংস্কারের ফলোপধান, শিক্ষা ব্যতীত হয় না। আহার, ভয়, মৈথুন প্রভৃতির সংস্কার, যাহা প্রায় প্রতি জন্মেই ফলোপধান করিয়া থাকে, তাহাই দৃঢ়তর রূপে অবস্থিত, সুতরাং তাহারই ফল, বিনা শিক্ষায় ঘটিয়া থাকে। সে সকল বিষয়ে কাহারও নিকট শিক্ষালাভ করিতে হয় না। এই নিমিত্তই সকল সংস্কারের কার্য্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হওয়া দেখা যায় না।

অধুনা স্থিরীকৃত হইল যে, আমরা বর্ত্তমান জন্মে যে সমস্ত সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি, তাহা প্রায় জন্মান্তরীণ সদসৎ কর্ম্মেরই পরিণাম, ও বর্ত্তমান জন্মে, যে সমস্ত সদসৎ কর্ম্ম করিতেছি ঐ সকল কর্ম্মই ভাবিজন্মের সুখ দুঃখ প্রাপ্তির নিদান। অতএব আমরা পদে পদে দুঃখানুভবকালে যেমন জন্মান্তর কর্ম্মদোষের অনুতাপ করিতেছি,ভাবিজন্মে,যেন বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মগুলির জন্য তাদৃশ অনুতাপ করিতে না হয়, এ বিষয়ে আমাদিগের সাবধান হওয়া একান্ত উচিত। কর্ম্মের প্রতি সতর্ক হইলেই, আমরা কখন দুঃখের বার্ত্তা জানিতে পারিব না।

অতএব মহাকবি শান্তিশতককার লিখিয়াছেন।—

নমস্যামোদেবান্নম্ন হতবিধেস্তেপি বশগা
বিধির্ব্বন্দ্যঃ সোপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চবিধিনা
নমস্তৎকর্ম্মভ্যোবিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥

আমাদের।

"ভাঙ্গিল চুর্ণিল উলটি পালটি
লুটি নিল যা ছিল সারও।

সকলিত গিয়াছে, রাজ্য গিয়াছে, ধন গিয়াছে, বিদ্যা গিয়াছে, গৌরব গিয়াছে, ধর্ম্ম গিয়াছে, বিশ্বসংহারক কালের করাল গ্রাসে সকলিত গিয়াছে। তবু কেন আমাদের কথা মনে হয়, কেন তবে কাঙ্গাল হইয়াও ছিন্ন কন্থাকে নিজের বলিয়া টানিয়া লইতে ইচ্ছা করে? চোখের উপরেইত দেখিতেছি— বিধর্ম্মী বিদেশী সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এখানে আসিয়া, আমাদের ঘরের জিনীষ, মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে, কথাটি কহিবার শক্তি নাই।

দেখিতেছিত আমাদের কত আদরের সামগ্রী, কত যতনের ধন, মাথার মণি ধর্ম্মকে লইয়া ছোট, বড়, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই বুঝুক বা নাই বুঝুক টানাটানি করিতেছে, কতই অপমান করিতেছে; মুখের উপর আমাদের অস্পৃশ্য যবনেও আমাদের পূজ্যপাদ আর্য্য ব্যক্তিগণকে কত অকথ্য বলিতেছে, কেহ কৃষক, কেহ গোঁয়ার, আবার কোন কোন পণ্ডিত তাঁহাদের কাহারও কাহারও অস্তিত্বই উড়াইতে চায়—এবম্বিধ কত লোকে কত কথা বলিতেছে! কৈ কাহাকেওত কোন কথা বলিতে পারি না? চোর হইলাম, বঞ্চক হইলাম, জালিয়াৎ হইলাম, মিথ্যাবাদী হইলাম, পৌত্তলিক হইলাম, অধার্ম্মিক পাষণ্ড নরকের কীট হইলাম, ইংরাজ যাহা মনে আসিল তাহাই বলিল ; কিন্তু এত লাঞ্ছনার মধ্যে, এত বিড়ম্বনার মধ্যে,সর্ব্বস্বহীন কাঙ্গালের ঘোর নরক যন্ত্রনার মাঝেও "আমাদের" কথাটি মনে হইলে কি-জানি-কেন প্রাণের ভিতরে একটু সুখের লহরী বহিয়া যায়, এবিষাদও নৈরাশ্যের অন্ধতামসে একটু কেমন হাঁসির বিজলি ছুটিয়া যায়, বুকটা কেমন যেন আমোদে ও ভরসায় ফুলিয়া উঠে, ভিখারীর ভগ্ন কুটীরে থাকিয়াও রাজ্যসুখ অনুভব করি।

দুঃখীর স্মৃতি, পূর্ব্বস্মৃতিই একমাত্র অবলম্বন। আমাদের কিছুইত নাই তবে এখন তাহাই আছে, যাহা ছিল বলিয়া আমরা এখনও আছি, এখনও কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এখনও নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছি। যাহা ছিল তাহার স্মৃতি, যাহা ছিল তাহা যে আমাদের ছিল এই জ্ঞান। এই স্মৃতি, এই জ্ঞান, এবং তজ্জনিত একটু যে স্পর্দ্ধার ভাব আমাদের আছে ইহাই এখন আমাদের একটু জাতীয়তা রক্ষা করিয়াছে, তাই আমাদের মধ্যে আভি-জাত্যটুকু এখনও শুকায় নাই। কিন্তু যে রকম সংস্কারের মেলা লাগিয়াছে তাহাতে বুঝি বা আমাদের জ্ঞানটাও আর থাকে না, এ স্বেচ্ছাচারের এক-টানা স্রোতে 'অহম্মমেতি' ভাবটাও ভাসিয়া যায়। বৃদ্ধার নয়নতারা অন্ধের নড়ি, আমাদের সর্ব্বস্ব ধন এ আমাদের "আমাদের" জ্ঞানটা যাইলে ভারতের সমূহ ক্ষতি। আর্য্য জাতির সর্ব্বনাশ, আর্য্যসন্তানের সমূলে, যদুবংশ-নিধনবৎ উন্মূলনের সূত্রপাত হইবে। তাই এখন আমাদের কথাটা মনে পড়িল।

ইংরাজী শিক্ষার মোহমায়ায় আমরা বড়ই আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছি, আর নিজের কথা পরের কথা কোন কথাই মনে হয় না। মাতাল যেমন উন্মত্ত হইয়া, আত্মজ্ঞানহীন হইয়া, আলুথালু বেশে কত কি আবল তাবল বকিতে

বকিতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। পাগল যেমন কা'র কথা লইয়া, কা'র ভাবে কি জানি, কেমন রকমে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়ায়, হয়ত কেহ গালিদিলে তাহার উপর সুখী হয়, আবার অন্য কেহ ভাল কথা, বুঝান কথা বলিলে তাহাকে মারিতে উদ্যত হয়; আমরাও তেমনি নেসাখোর মাতালের মত, উন্মাদের মত, কত খেয়ালের উপর কত কথা বলিতেছি, কত রঙ্গই করিতেছি, নিজেদের বুদ্ধিদোষে কত সংই সাজিতেছি, তাহার আর অবধি নাই। অথচ যেমন মাতালকে মাতাল বলিলে চটিয়া উঠে, পাগলকে পাগল বলিলে মারিতে যায়, তেমনি সুবুদ্ধি দূরদর্শী কেহ যদি উচিৎ কথা বলে, তবেই তাহার উপর দেশশুদ্ধ লোক চটিয়া লাল। এমন শোচনীয় অবস্থা কেন হইল, এ দুরারোগ্য রোগ কোথা হইতে আসিল, এ অহম্মুখতার মূল কোথায়? হয় ত ইতিহাস খুঁজিলে তাহা পাওয়া যায়, ইহার কারণ নির্দ্ধারিত করা যায়।

মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ও কামন্দকী বার্হস্পত্য নীতিশাস্ত্রাদি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বতন আর্য্যঋষিগণ, একটা সামাজিক সাম্য স্থাপনের জন্য সদাই ব্যস্ত। যেমন সৌরজগৎ কেমন এক শৃঙ্খলায় পরিচালিত হইতেছে। যেখানের যে গ্রহটি, যে তারাটি, ঠিক সেই ভাবে সেই সেই কার্য্যগুলি করিতে থাকিলে বিশ্বসংসার সুশৃঙ্খলায়, সামঞ্জস্যের ভাবে সাম্যের সহিত পরিরক্ষিত হয়, তেমনি আর্য্যসমাজের যেখানে যেটি আছে, সামাজিক উন্নতি কল্পে, যাহাদের জন্য যে যে কার্য্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাদেরই ঠিক সেই কার্য্যগুলি যথানিয়মে করিতে হইবে—নচেৎ সমাজের কাছে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। পাছে শূদ্র, নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কার্য্য না করে ব্রাহ্মণ পাছে উচ্ছৃঙ্খল হয়, তাই শাস্ত্রকারগণ পদে পদে কত বিধি-বিধান, কত অনুশাসন বাক্য লিখিয়া গিয়াছেন। সংসারে জন্মিলেই মানুষ সামাজিক হইলেন, সমাজের সুখ দুঃখ সকলি সমভাবে তাঁহাকে সহ্য করিতে হইবে—তিনি তখন সমাজের দাস। যাহাতে সমাজের উন্নতি হয়, যাহাতে সমাজে অন্নের অভাবে লোক মারা না পড়ে, যাহাতে পাপের বৃদ্ধি সমাজে না হইতে পারে, তুমি যতটুকু পার সাধ্যমত ততটুকু তোমাকে করিতে হইবে। আর্য্যসমাজের ইহাই মূলমন্ত্র। কোটী কোটী লোকের সমাজের মধ্যে সকলেই কিছু ধনী হয় না, সুখী হয় না, কর্ম্মের ফলে তুমি একজন বড়ই ধনশালী হইলে, আর্য্যসমাজ তোমার ধনরাশী লোহার সিন্ধুকে চাবী দিয়া রাখিতে দিবে না, তোমার ভোগবাসনা পরিতৃপ্তির জন্য, তোমার ইহকাল পরকালের শুভ সম্পাদনের জন্য প্রচুর মুদ্রা তুমি লও, কিন্তু কতকাংশ ঐ যে অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, আতুর, দীন, দুঃখী অন্নের জন্য, বস্ত্রের জন্য, হা হা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের যতটুকু দুঃখ মোচন করিতে পার তাহা কর, বিদ্যার উন্নতির জন্য, ধর্ম্মের বিস্তৃতির জন্য, যাহা কিছু পার তাহা কর, ইহাই আমাদের সমাজের নিয়ম। এ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে তুমি সমাজের নিকট দায়ী, তুমি সামাজিক পাপের পাপী।

ব্যারীশু সাহেব আমাদের দেশে Poor Law নাই বলিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়া ছিলেন; কিন্তু তিনিত জানেন না যে, আমাদের সামাজিক মূল নীতি এই যে, যাহাতে সমাজে মোটামুটি ভাবে সকলেরই অন্নবস্ত্রের অভাব ঘুচিয়া যায়, তাহাই করিতে হইবে। এখন বাণিজ্য দ্বারায়, দেশে ধনাগম অধিক হইলেই, অর্থনীতি শাস্ত্রবিদ্‌রা যেন চতুর্ব্বর্গফল লাভ করেন। কিন্তু সে ধন কি রকমে কতটুকু সাধারণ ভাবে বিস্তৃত লাভ করিল, তাহা কেহ দেখেন না। ইউরোপীয়ের চক্ষে ইংলণ্ড এখন বড়ই ধনী। কিন্তু ভারতের অর্থনীতিবিদ্‌গণ ইংলণ্ডকে হতভাগা ছাড়া অন্য কিছু বলিবেন না। কারণ তথায় কতকগুলি লোক কুবেরসদৃশ ধনশালী, এবং অপর সকলকেই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ঘোর যুদ্ধ করিতে হয়, তাহাতেও অনেকে অভুক্ত থাকেন ইহা আমাদের চক্ষে সামাজিক মহাপাপ। সমাজের সকলে খাইয়া পরিয়া, মোটাভাত মোটা কাপড়ে সুখে দিন কাটাইতে থাকুক, আর যদি তাহার মধ্যে তোমার তেমন বাহাদুরী থাকে ত ন্যায়ের-পথ অবলম্বন করিয়া, ইহার উপর যাহা পার উপার্জ্জন কর, ইন্দ্রের ন্যায় ভোগবিলাসে ভাসিতে থাক, কেহ তোমায় কোন কথা বলিবে না। বরং তাহাতে সমাজের কল্যাণ বৈ অকল্যাণ হইবে না। এই নীতির অনুসরণ করিয়া চলিতে হইত বলিয়াই, পূর্ব্বে ভারতীয় সমাজে অন্নকষ্ট অতি কম ছিল দুর্ভিক্ষ্য ছিল না! তাই সেকালের লোকে নির্ভাবনায় দিন কাটাইত, তখন এ ছাই "জীবনসংগ্রাম ((Struggle for existence) ছিল না। আজ্‌কাল্‌ মান নাই, অপমান নাই, যেখানে যাও সেই খানেই দেও দেও, নাই নাই শব্দ এ নরকের দৃশ্য পূর্ব্বে ছিল না। তাই এখন আর তেমন গালভরা দেশজোড়া হাঁসিও নাই, সে আমোদ প্রমোদ নাই, সে দান ধ্যান নাই, সে সদাব্রত অতিথি সৎকার নাই; সে সুখ কৈ, সে শান্ত ভাব কৈ, সে সাম্যও নাই!

মানুষের আশাতৃষ্ণাটা যত বাড়াইবে ততই বাড়িবে। আশা, আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও সমাজ চলে না; কিন্তু আবার উহার অতি বৃদ্ধিও ভাল নহে, সমাজে সুখ থাকে না। সকলকেই এক একটা গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে হইবে, গণ্ডীর বাহিরে গেলেই, সমাজে অসন্তোষের বীজ বপন করা হইবে, তখন আড়াআড়ীটা বাড়িয়া উঠিবে, একটা অদম্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা হৃদয়খানা জুড়িয়া বসিবে, কিসে অন্যকে চাপিয়া রাখিতে পারি, ইহাই সকলের চেষ্টা হইবে এবং পরিশেষে সাম্য বিনষ্ট হইয়া, সংসার ও সমাজ অন্ন বস্ত্রের সংগ্রাম স্থল হইয়া উঠিবে। এই জন্য আমাদের সমাজে গণ্ডীগুলা এত পরিষ্কার করিয়া আঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাই আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। তোমার নকলনবিশী ইংরাজী বুদ্ধিতে হয়ত এছাই (Caste System) জাতিভেদ-প্রথা ঘোর বৈষম্য পূর্ণ বোধ হইবে। কিন্তুইহাই স্বভাবসিদ্ধ এবং মনুষ্য সমাজের একমাত্র অবলম্বনীয়। পূর্ব্বের সে সমাজ শৃঙ্খলা উঠাইয়া দিয়াই, এমন হিন্দু সমাজ এত দুঃখের আকর হইয়াছে। এখন জেলের

মাথায় চেরা তেড়ী চুনোট কোর্ত্তা তেলীর তেলের ভাঁড়ের স্থানে হাতির দাঁতের ছড়ী! সুচতুর ইংরাজের কূট নীতি আজ্ কার্য্যে সকল প্রসব করিয়াছে। সমাজে সাম্য থাকিলে, যাহার যাহা কর্ত্তব্য সকলেই তাহা করিলে, সমাজে একটা শৃঙ্খলা থাকে এবং তজ্জন্য দেশে একটি সমবেত শক্তি সঞ্চিত থাকে, সেই শক্তির বলে হয়ত কালে একটি মহাশক্তির সৃষ্টি হইতে পারে এবং বিজেতার লৌহনিগড় ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। তাই ইংরাজের সুকৌশলে হিন্দু সমাজে ঘোর বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে, লোকের আর কর্ত্তব্য বোধ নাই, তাই সে একতা নাই, সে সম বেদনাও নাই। যাহা হউক এই মূল নীতির অনুযায়ী কার্য্য করিয়া সমাজ ঠিক সেই মতে গঠিত করিয়া, আমরা বড়ই শান্তি নিকেতনে ছিলাম। আর্য্য ঋষিগণের এই সমাজ নীতি অনুসরণ করিয়া যদি মনে মনে একটি সমাজ গড়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে আমাদের আর্য্য সমাজ যেন সাত গ্রাম চড়াইয়া (Climax) রচিত করা হইয়াছে। কি রাজনীতি কি সমাজনীতি কি পররাষ্ট্র নীতি, ধর্ম্মনীতি সকল ব্যাপারেই এই মূল ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়াছে। যাহাই বলুন দেশ বলুন, ধর্ম্ম বলুন, উচিৎ বলুন সকলইত মানুষ লইয়াই টানাটানি। সেই মানুষ সমাজে সকলের মধ্যে মিশিয়া মিলিয়া কেমন করিয়া থাকিবে, এই কথা লইয়াই সমাজ-নীতির কত গোলমাল চলে, যে সমাজই যে কোন প্রকারে গঠিত হউক না কেন, ব্যক্তি মাত্রেরই আমিত্ব জ্ঞানটা প্রায় এক ভাবেই সঞ্চিত হইয়া থাকে। ব্যক্তি সকলেরই নিজ নিজ আমিত্বগুলিন সমবেত হইয়া, একটা দেশব্যাপী সামাজিক 'আমি' সৃষ্টি হয়। তুমি, আমি, সুরেন্দ্র, নগেন্দ্র সকলেরই স্বার্থপরতা মাখান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'আমি' গুলি মিশাইয়া একটি সামাজিক 'স্বার্থ' সৃষ্টি হয়। যিনি এই প্রকাণ্ড সমাজিক 'স্বার্থ' মাখান 'আমিত্বতে' নিজের ক্ষুদ্র 'আমিত্ব' টুকু ডুবাইয়া উহারই মঙ্গলবিধানে যত্নবান্ হয়েন তিনিই দেশহিতৈষী। আবার যিনি মোটের উপর এই সকলের 'আমি' কে বজায় রাখিয়া, তাহার দুই একটি বিচ্যুতি সামলাইয়া লইতে বদ্ধ পরিকর হয়েন, তিনিই প্রকৃত সমাজ সংস্কারক। পূর্ব্বে যে মূলনীতির কথা বলা হইয়াছে, সেই নীতির উপর এই 'আমিত্ব' জ্ঞানটুকু থাকা চাই। ইহার উপর ধর্ম্মন্যায় জড়াইয়া যে দয়া দাক্ষিণ্য মিশাইয়া, স্নেহ মমতা ঢালিয়া দিয়া যে একটি সমাজ গঠিত হয়, তাহা যে শান্তির পবিত্র নিকেতন হইবে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ কি? কিন্তু বিধি বিড়ম্বনায় সে সুখ সে স্বচ্ছন্দতা আমরা নিজেই হারাইলাম।

ইংরাজ সাম্য বলিলে যাহা বুঝেন, অথবা লোকতঃ আমাদের যাহা বুঝাইয়া থাকেন, তাহা হইতে আমাদের সাম্য টা সম্পূর্ণ পৃথক্। এখন ইংরাজের সে সাম্যর কথা পড়িয়া, বাল্যকালাবধি মূল সমাজ তন্ত্রের বিরোধে অভিনব সমাজ নীতির কথা শুনিয়া আমাদের মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে বহুদিন পরপদতাড়নে সঙ্কুচিত থাকিয়া মনের সে স্ফূর্ত্তি, হৃদয়ের সে প্রশস্ততা,

বুদ্ধির সে ধীরতা ও প্রবেশ শক্তি সকলই লয় পাইয়াছে। স্বাধীন বৃত্তি থাকিলে, দেখিয়া শুনিয়া অনেক বিষয় শিখিতে পারা যায়। কিন্তু পরাধীন জাতির পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। শৌর্য্য, বীর্য্য হারাইয়া আমরা পরাধীনতার কঠোর নিগড় নিজ হইতেই পরিলাম; আর তাহা কাড়িয়া উঠিয়া স্বাধীন ভাবে দাঁড়াইতে পারিলাম না। বিজেতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইল, পরতন্ত্রতা অঙ্গের ভূষণ হইল, ধীরে ধীরে এক এক করিয়া মনুষ্যজনোচিত গুণগ্রাম হারাইতে লাগিলাম, এবং পরিশেষে বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়া কেমন যেন বালকের মতন হইয়া গেলাম। স্বতন্ত্রতা থাকিলে যাহা থাকিত, পরতন্ত্র হইয়া সে সব ঘুচিয়াত গেলই, অধিকন্তু পড়া পাখী হইয়া উঠিলাম। এই শুকত্বে পরিণত হইবার সমসময়ে ইংরাজ ভারত জয় করিলেন। মুসলমানে বরং এদেশীয়তা অনেক পরিমাণে রাখিয়াছিল, সমাজের আদৎ বাঁধন তখন ছিন্ন হয় নাই, আমাদের বলিবার তখনও অনেক বিষয় ছিল। কিন্তু ইংরাজ শিক্ষার গুণে তাঁহার মোহিনী মন্ত্রজালে ইহ সংসারে আর আমাদের "আমাদের" বলিবার কিছু রাখিলেন না। নানা ছলে কৌশলে, সকল জিনীষেই ভেজাল করিতে লাগিলেন। সমাজনীতি বিলাতী চক্ষে দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। কাঙ্গালের ভাঙ্গাচুরা যাহা ছিল তাহাও ঘুচিয়া গেল। কুবের যদি কাঙ্গাল হন, ইন্দ্র যদি পথের ভিখারি হন, তবে তাঁহাদেরও আমাদের মত বুদ্ধিগ্রস্ত হইতে হয়। হায় রে যাহাদের কাছে কোটী কুবেরও তুচ্ছ ছিল, যাহাদের প্রতাপে শত শত ইন্দ্র ও ভীত ও ত্রস্ত থাকিতেন, যাহাদের বীরত্বে ধরাধাম কম্পিত হইত, তাহারা আজকালকার হিন্দুতে পরিণত হইয়া, যে এখন ও মাথা তুলিয়াছে ইহাই তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের পুণ্য ফলে বলিতে হইবে। "ভাঙ্গিল চূর্ণিল উলটি পালটি লুটি নিল যা ছিল সার ও" সবই গেল তবে আছে একটা 'আমাদের' জ্ঞান। ভাঙ্গা হউক, মন্দ হউক, নিন্দনীয় হউক, অব্যবহার্য্য হউক তবু সে সব যে 'আমাদের' অতএব তাহা যে 'আমাদের' আদরের ধন, যতনের সামগ্রী। বিদেশী তুমি গালি দেও, তুমি নিন্দা কর, দুঃখীকে নিঃসহায় দেখিয়া কটু কাটব্য যাহা ইচ্ছা তাহাই বল, তাহাতে দুঃখ নাই, পরিতাপ নাই—তবে মনে জানিও যে 'আমাদের' যাহা তাহাই গ্রাহ্য। তুমি গালি দিলেও 'আমার' জিনীষটি আমি ছাড়িব না। পৌত্তলিকতা 'আমাদের' জাতিভেদ 'আমাদের' পুরাণতন্ত্র আমাদের তাই উহারা আমাদের চক্ষে এত আদরের। যতদিন এই প্রাণ ভরা আমাদের কথাটি, আমাদের মাঝে ব্যবহৃত থাকিবে, ততদিন ইংরাজ তুমি শত সহস্র কৌশল করিলেও হিন্দুর হিন্দুত্ব নষ্ট করিতে পারিবে না। একদিন না একদিন তাহা জাগিয়া উঠিবে। 'আমাদের' যে জাতীয়তার ভিত্তি তাহা কি জান না? ভগবান্ এ নৈরাশ্যের মাঝে আশার জ্যোৎস্না রেখা প্রদীপ্ত রাখুন।

২য় ভাগ। ১২৯৪ সাল। ৫ম খণ্ড।

সুখ।

স্বার্থ প্রবৃত্তির নিকট সকল প্রবৃত্তিই দাস্যবৃত্তি করিতেছে। স্বার্থপ্রবৃত্তির অনুজ্ঞাব্যতীত কোন প্রবৃত্তিই স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। সকলেরই স্বার্থ এক। কেবল্ যানভেদে ভিন্ন পথে প্রত্যেকে স্বার্থসাধনোদ্দেশে প্রস্থিত হয়। "অন্যেচ্ছানধীনেচ্ছা বিষয়" ই স্বার্থ, অর্থাৎ যাহা করিবার ইচ্ছা অন্যেচ্ছার অধীন নয়। সুখসম্ভোগ এবং দুঃখনিবৃত্তিই স্বার্থ বা স্বপ্রয়োজন ; কেন না আমরা কোন কার্য্যসাধনেচ্ছায় সুখ এবং দুঃখনিবৃত্তি চাই না। বরং সমস্ত কার্য্যই একমাত্র সুখ এবং দুঃখ নিবৃত্তির জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুখরূপ লক্ষ্য স্থানে যাইবার পথ, প্রবৃত্তিভেদে ভিন্ন হইয়াছে। কেহ ঐ আকাশের চাঁদ ধরিতে প্রবৃত্তির পথে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বিচরণ করেন, কেহ বা নিবৃত্তির পথে বিচরণ করেন। কেহ সুখের আবছায়া দেখিয়া অগ্রসর হন। কচিৎ তড়িদ্বৎ বিভাত সুখের কিরণে পথহারা হন। কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে প্রকৃত সুখ সাক্ষাৎকার ঘটে।

অসৎপ্রবৃত্তি সুখের প্রবল প্রতিবন্ধক। অসৎ প্রবৃত্তিরূপ ঘোর ঘন ঘটায় সুখশশী সতত সমাচ্ছন্ন। তাই আমরা নিরন্তর সুধাপানে বঞ্চিত থাকি। সৎপ্রবৃত্তিরূপ প্রভঞ্জনের প্রবলবেগে হৃদয়াকাশ হইতে কুপ্রবৃত্তি মেঘ

বিদূরিত হইলে সুখ-শশীর উদয় হয়। তাই বলি সকলেই যখন "দিল্লিকা লাড্ডু"একমাত্র সুখের তরে দ্বারে দ্বারে বেড়াইতেছে, তখন একবার সৎপ্রবৃত্তির তোষামোদ করিয়া দেখিলে হয় না? কাশীতে যাইবার ইচ্ছা। ভাই, পথ অপরিচিত। তথাপি কাহাকে জিজ্ঞাসাও করিব না—পাছে গুমোর ফাঁস হইয়া যায়। বল দেখি, কেমন করিয়া উদ্দেশ্য সফল হইবে?

দুষ্টলোকের সহবাসে কুপ্রবৃত্তি স্ফুরিত হয়। ইহার এই এক মহৎ দোষ—একটী কুপ্রবৃত্তি হৃদয়ে উদিত হইতে না হইতে, পাশে পাশে অপর কুপ্রবৃত্তি তাহার অনুবর্ত্তন করে। গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন।

"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ ॥
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

ইহার তাৎপর্য্য—কুসঙ্গীর কুহকে, কুকথায়, কুদৃষ্টান্তে মন স্বভাবতঃই কলুষিত হয়। মন কলুষিত হইলে কাম্যবস্তু পাইবার জন্য, তৃষ্ণা সমুদ্ভূত হয়। ইন্দ্রিয়ের উপভোগতৃষ্ণা অতিশয় বলবতী হইলে ক্রোধবৃত্তি আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ যে কাম্যবস্তু লাভের অন্তরায়ভূত হয়, তাহার প্রতি ক্রোধ হয়। ক্রোধ হইলে চিত্ত চঞ্চল হইয়া মোহপ্রাপ্ত হয়। মোহ হইলে নিজের পূর্ব্বাপর অবস্থা আর মনে হয় না। কাজেই নিজ কুশল সাধনের উপায় স্মৃতি পথারূঢ় হয় না। স্মৃতি বিভ্রম হইলে বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটে। বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইলে লোক নষ্ট হয়, অর্থাৎ সে লোকের ইহলোকে ও পরলোকে সুখের সম্ভাবনা থাকে না।

আমাদের অন্তঃকরণের কুবৃত্তিই যে দুঃখের মূল এবং সুখের প্রতিবন্ধক, ইহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। সুষুপ্তিদশায় যখন অন্তঃকরণ কুবৃত্তি মেঘে আবৃত না থাকে, তখন সকলেই অনুভব করিতে পারেন "সুখমহমস্বাপ্সং" সুখে আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম। অনেকেই বিবেচনা করেন, ইন্দ্রিয়ের বিষয়োপভোগে সুখ জন্মে। বস্তুতঃ তাহাতে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের মাত্রাই অধিক। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়োপভোগ যতদিন না ঘটে, ততদিন কেবল কামতৃষ্ণার দুঃখের জালে জড়ীভূত হইয়া অশেষ যন্ত্রণায় কাল কাটাইতে হয়। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক ঘটিলে (অর্থাৎ কাম্য বস্তু পাইলে) কথঞ্চিৎ তৃষ্ণা নিবৃত্তি জন্য সুখানুভব হয়। আবার যে তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণা। পুনর্ব্বার বিষয়োপভোগ না হইলে আর পশ্চাজ্জাত তৃষ্ণা নিবৃত্তি

হয় না, বরং পদে পদে দুঃখ অনুভব হয়। যে কোন প্রকারে তৃষ্ণার অভাব হইলে সুখ এবং তৃষ্ণার সম্ভাব হইলে দুঃখ হইয়া থাকে। অতএব তৃষ্ণা নিবৃত্তি জনিত সুখই কাম্যবস্তু-লাভের সুখ। তাই যদি হইল, তবে কর্দ্দমে পদক্ষেপ করিয়া পঙ্কিল পদ ধৌত করা অপেক্ষা কর্দ্দমাক্ত পথে বিচরণ না করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অশেষ দুঃখাকর তৃষ্ণা করিয়া তাহার নিবৃত্তি জন্য সুখ অনুভব করা অপেক্ষা তৃষ্ণা পরিহার করিয়া স্বতঃসিদ্ধ সুখ অনুভব করাই উচিত। কুপথ্য ভোজন করিয়া অসুস্থ হইলাম. পরে ঔষধের দ্বারা রোগ নিবারণ করিয়া, আরোগ্য সুখ অনুভব করা অপেক্ষা কুপথ্যাশী না হওয়া কি ভাল নয়?

কথাটী একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করি। মনে করুন, শ্যামের বাটীতে কলমের চারার ভাল আম দেখিয়া আমার লোভ হইল। সেই আমটী খাইতে প্রবল তৃষ্ণা হইল। সেই তৃষ্ণায় অহোরাত্র উদ্বেগ সাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে চৌর্য্যবৃত্তির প্রসাদেই হউক, অথবা কাকুতি মিনতির কৃপায় হউক, কিম্বা মিত্রতার খাতিরেই হউক এত সাধের আম্রটী উদরসাৎ করিয়া, চিরপ্রযত্ন সঞ্চিত লোভ তৃষ্ণার শান্তি করিলাম। এবং তজ্জনিত কিঞ্চিৎ সুখও অনুভূত হইল। নিরপেক্ষ ভাবে সুখ দুঃখের অনুপাত করিয়া দেখিলে দেখিবে, দুঃখের সঙ্খ্যাই অধিক। পক্ষান্তরে দেখ, আমি যদি অপাত্রে তৃষ্ণা না করিতাম, তাহা হইলে আর এত উদ্বেগ, এত আয়াস, এত লাঞ্ছনা-এত ন্যূনতা স্বীকার করিতে হইত না। তুমি বলিবে—ভক্ষণ জনিত সে "দিল্লিকা লাড্ডু" সুখটুকু পাইতে না। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবে, সে সুখও আমার কাছ ছাড়া ছিল না। আমি পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি, তৃষ্ণার অভাবই সুখ এবং তৃষ্ণার সম্ভাবই দুঃখ। আম্র ভক্ষণ করিয়া যে তৃষ্ণার অভাব করিলাম, যদি লোভের পূর্ব্বে সে অভাব করিয়া রাখিতাম, তাহা হইলে আর পরের কাছে তৃষ্ণা নিবৃত্তি জন্য সুখের মুষ্টিভিক্ষা করিতে হইত না। পাঠক, একটু প্রণিধান করিলে আমার বাক্যের সত্যতা সপ্রমাণ হইবে, তথাপি প্রকারান্তরে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করি।

সকলেই জানেন, সুখ স্বসংবেদ্য অন্তরের ধর্ম্ম। প্রতিবন্ধকের অভাবে আপনিই ফোটে প্রতিবন্ধকের সম্ভাবে আপনি টোটে। দুঃখই সুখের প্রতিবন্ধক, দুঃখের অভাব হইলে আপনিই সুখের উদয় হয়, ইহা নির্ব্বিবাদে

সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং দুঃখই সুখোদয়ের একমাত্র প্রতিবন্ধক। চিত্তে কাম. ক্রোধ লোভ প্রভৃতি প্রবৃত্তি উদিত হইলে যতদিন চরিতার্থ না হয়, ততদিন তাহার অভাব জনিত বলবৎ দুঃখ হয়। সে সময়ে দুঃখরূপ প্রতিবন্ধক থাকায় সুখের সাক্ষাৎকার ঘটে না। যখন কামাদি প্রভৃতি চরিতার্থ হয়, তখন তাহার দুঃখের অনুবৃত্তি থাকে না, সুতরাং সুখ স্বয়ংই আবির্ভূত হয়। কেন না তাহার প্রতিবন্ধক স্বরূপ দুঃখ আর নাই। প্রণালী কাটিয়া অন্তঃপুরে জল আনিয়া অপর প্রণালীর দ্বারা বাহির করিয়া স্বচ্ছন্দতালাভ যেমন দুর্ব্বুদ্ধির কার্য্য, ইহাও তাই, কেননা যে দুঃখের অভাবে সুখের উপলব্ধি হইতেছে, সে দুঃখ না করিলে দুঃখাভাব থাকিত, সুখও উপলব্ধ হইত। অতএব সাবধান, যাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া আহার বিহার প্রভৃতি কার্য্য পরম্পরা নির্ব্বাহ করিতেছ, কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, হেলায় যেন তাহা (সুখে) হারাইও না। গীতায় উক্ত হইয়াছে।

"শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীর বিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং সযুক্তঃ সসুখী নরঃ।"

অর্থ—এই সংসারে কাম, ক্রোধে চক্ষুরাদির ও মনের ক্ষোভরূপ বেগ জন্মে। যে ব্যক্তি সেই বেগের উদ্ভব কালেই আজীবন তাহার প্রতিরোধ করিতে পারে, সেই ব্যক্তি যোগী ও সুখী। এস্থলে কাম শব্দের অর্থ তৃষ্ণা। তৃষ্ণা রাক্ষসীই আমাদের সমস্ত অনর্থের মূল। যখন যুধিষ্ঠির তৃষ্ণাতুর হন। তৎকালে শৌনক তাঁহাকে সদুপদেশ দিয়াছেন—

"রাগাভিভূতঃ পুরুষঃ কামেন পরিকৃষ্যতে।
ইচ্ছা সংজায়তে তস্মাত্ততস্তৃষ্ণা বিবর্দ্ধতে॥
তৃষ্ণা হি সর্ব্বপাপিষ্ঠা নিত্যোদ্বেগ করীস্মৃতা।
অধর্ম্ম বহুলাচৈব ঘোরাপাপানুবন্ধিনী॥
যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যোঽসৌ প্রাণান্তকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্॥"

পুরুষ অনুরাগাভিভূত হইলেই কামনা তাহাকে আশ্রয় করে। অনন্তর সেই বস্তুলাভের ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হইলে তৃষ্ণা বাড়িতে থাকে। তৃষ্ণার মত পাপিষ্ঠা সংসারে নাই; নিয়ত উদ্বেগকরী, অধর্ম্মবহুলা এবং পাপের অনুবন্ধ করিয়া দেয়। দুর্ম্মতি হইলে তৃষ্ণা ত্যাগ করা যায় না। নিজে

প্রাচীন হইলেও তৃষ্ণা প্রাচীন হয় না। যে তৃষ্ণারূপ প্রাণান্তিক রোগ হইতে মুক্ত হয়, সেই সুখী।

পাঠক, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির পথের সুখ দেখাইলাম। যদি দুঃখের সূত্রে গ্রথিত ক্ষণিক সুখের ঘোরে বিভোর হও, তবে প্রবৃত্তির পথে বিচরণ কর, তৃষ্ণার মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আত্মহারা হও, অনন্তকালের জন্য আত্মাকে নরকপথের পথিক কর। আর যদি নিবৃত্তির পথের পথিক হও চিরকাল ভূমানন্দে তৃপ্ত থাকিবে।

"শক্তি।"

আমরা স্থিরভাবে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাই, জগতের অন্তরালে কোন পদার্থ নিযন্ত্রিত থাকিয়া জগৎ বিচালিত করিতেছে। এবং জগতের যে কোন কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, সমস্তই শক্তির অনুবলে। এই শক্তির রক্ষা ও পরিবর্দ্ধন জন্য সকলেই ব্যস্ত। যাহাতে শক্তি থাকে তৎপক্ষে সকলেই বিশেষ সাবধান। হাত নাড় পা নাড় যাহা কর সমস্তই শক্তি সাপেক্ষ। একটি কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হইলেই শক্তির প্রয়োজন। যেখানে যেরূপ শক্তি তদ্রূপ কার্য্য হইয়া থাকে। যদি শক্তি না থাকে তবে কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। অতএব বলা বাহুল্য যে প্রত্যেকের শক্তির সেবা করা একান্ত প্রয়োজন ও নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সংসারে থাকিয়া ব্যবহার ক্ষেত্রে অত্যুচ্চ হইতে বাসনা কর শক্তির প্রয়োজন। সংসার ছাড়িয়া বৈরাগ্য বিপিনে বিচরণ করিয়া মোক্ষফল চাও শক্তি সেবা আবশ্যক হইবে। অনুদিন শক্তি সাধন কর্ত্তব্য। আমরা জগতে তিনটি কার্য্য দেখিতে পাই। এক উৎপত্তি, দ্বিতীয় স্থিতি, তৃতীয় বিনাশ। উহা শক্তির লীলা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঐ কার্য্যত্রয় সংরক্ষণ জন্য শক্তি বিভিন্নরূপে প্রযোজিত হয়। এবং আপাততঃ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। বস্তুতঃ শক্তি মূলে এক। বস্তু সমূহের আধার শক্তি *। জাগতিক বিভিন্ন

---

* শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রণীত ধর্ম্মব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

শক্তি গুলি মূল শক্তিরঅংশ। দ্রব্য বিশেষে সংলগ্ন হইয়া বিভিন্ন কার্য্য করে। এতক্ষণ আমরা যে শক্তির কথা বলিয়া আসিলাম। যদ্দারা জগৎ পরিচালিত স্বীয় উপাদানে অবস্থিত এবং অশেষ পরিণামে নিয়োজিত, সেই শক্তিরও আবার একটিমাত্র আধার আছে। শক্তি শক্ত ছাড়িয়া তিষ্ঠিতে পারে না। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করিতে পারে না। সেইরূপ মূল শক্তিও শক্ত-পরিহীণ হইয়া থাকিতে পারে না। অগ্নি ও দাহিকা, জড় ও জড় শক্তি, মূলশক্তি ও শক্ত, চিৎশক্তি ও চিৎ। সেই চিৎ একমাত্র সত্য। কালত্রয়ে একরূপে বিদ্যমান। দেশ কাল ও বস্তু দ্বারা তাঁহার পরিচ্ছিন্ন হয় না সুতরাং অনন্ত। এই তত্ত্ব আমরা পরমহিতৈষিণী শ্রুতি মুখে শুনিতে পাই, যে " সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"।

মূল শক্তিকেই আদ্যাশক্তি বলে। শক্তি ও শক্ত অভেদে অবস্থিতি। চিৎ ও চিচ্ছক্তি অভেদে বর্ত্তমান। সুতরাং শক্তি শক্ত ছাড়িয়া জড় কার্য্য নহে। যেখানে শক্তির ক্রিয়া সেখানে তাহা আপাততঃ শক্তির ক্রিয়া বলিয়া প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ শক্তির ক্রিয়া নহে শক্তের ক্রিয়া। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি শক্ত ছাড়িয়া শক্তির সত্তানাই। সুতরাং কিছুই নহে। শক্ত, অভিধ্যান ক্রমে শক্তির বিকাশ, সঙ্কোচ বা উপসংহার করিতে পারেন। কারণ উহা জড় শক্তি নহে, চিচ্ছক্তি। এই জন্যই এস্থলে ইহাও বলা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে যে মূলশক্তি বা আদ্যাশক্তির কথা বলা গিয়াছে উহা শক্ত-সম্বলিত। শক্ত-শূন্য শক্তি নহে, কারণ তাহা কিছুই নহে। ঐ শক্ত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্ম সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। শক্তি ও শক্ত অভেদে বর্ত্তমান। শক্ত যখন শক্তি লীলা উপসংহার করিয়া স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া স্বরূপে অবস্থান করেন তখন তিনি নির্লেপ নির্গুণ। ফলতঃ সতত ঐ অবস্থা হইলেও কেবল প্রলয় সময়ে ভগবানের যে অবস্থা, সেই স্বরূপকেই আমরা নির্গুণ নিরঞ্জন বলিয়া, কথঞ্চিৎ অনুমান করিয়া লইতে পারি। অন্যথা তৎস্বরূপ যোগ জ্ঞান ভিন্ন অনুভব করিবার সাধ্য নাই। মনে ধারণা হইবে না। কেবল বিতণ্ডা করিতে সমর্থ হইবে মাত্র।

শক্তির অনন্ত লীলা ও অনন্ত ক্ষমতা। শক্তিই মায়া। পরমেশ্বর মায়া সুখে জগৎসর্জ্জনাদি করিয়া থাকেন, তখন তিনি বিভিন্ন কার্য্যে বিভিন্ন নামে অভিহিত হন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও মহেশ্বর পরমার্থতঃ এক। মায়া নিষ্ঠ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ ভেদে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব।

"সচ পরমেশ্বর একোঽপি স্বোপাধিভূত মায়ানিষ্ঠ সত্ত্ব রজ তমোগুণ ভেদেন ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর শব্দ বাচ্যতাং ভজতে,,। বেদান্ত পরিভাষা।

মায়া বা শক্তি তদনুরূপ ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, ও শৈবী বলিয়া ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ একচিৎ একমায়া। শক্তিই কার্য্যভেদে ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মিকা। শাস্ত্রে উহার অনেকশঃ উল্লেখ আছে।

"শক্তয়ো যস্য দেবস্য ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মিকা,, ইতি।
"ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবা ব্রহ্মন্ প্রধানা ব্রহ্ম শক্তয়,, ইতি॥
"সর্গ স্থিত্যন্ত কারিণীং ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব জনার্দ্দনঃ॥"
"ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবা ব্রহ্মন্ প্রধানাব্রহ্ম শক্তয়ঃ।
বিষ্ণু শক্তিঃ স্মৃতা প্রোক্তৈস্মৃতেঃ পরম শক্তিভিঃ॥"

ইহা ভিন্ন শ্রুতিতে ও রহিয়াছে

"তে ধ্যান যোগানু গতা অপশ্যন্
দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণে র্নিগূঢ়াং।"

অতএব এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম সুতরাং এক শক্তি, ইহা বিশেষ রূপে উপপাদিত হইল। নীরূপ পরমেশ্বরের ঐরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে, শক্তির কোনও ছায়া অবলম্বন করিতে হইবে। উহাই গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী রূপে উপাসিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা সংসাধিত হয়। ব্রাহ্মণগণ প্রতিদিন সন্ধ্যা করিয়া থাকেন, সন্ধ্যাতে ঐ মূর্ত্তিত্রয় উপাসিত হয়, ইহা চিরন্তন নিত্য পদ্ধতী। অতএব ব্রাহ্মণগণ শাক্ত। এবং শক্তিগণ সর্ব্বোপরি অবস্থিত। উপাসনা করিতে হইলে তাহাকে শাক্ত হইতেই হইবে। এস্থলে ইহা ও বলা যাইতেছে যে, দুর্গা, কালী প্রভৃতি ও উহাই। এখন এই এক কথা হইতে পারে যে, যে সমস্ত দেবমূর্ত্তি গঠিত হইয়া পুজিত হয়, উহা প্রকৃত মূর্ত্তি কি স্বকপোল কল্পিতা (আমরা বলি স্বকপোল কল্পিতা নহে। অবস্থাভেদে, হৃদয় শতদলে সাধক যে ভাবে নিরন্তর ধ্যান যোগে সমাহিত থাকেন, পরমেশ্বর তাহার মানস সফল করিবার জন্য ঐ সকল মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, অথবা ঐ সকল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাধকের মনোবাঞ্ছা পরিপূরণ করিয়া থাকেন। পরস্থিত সাধকগণ ও সেই মহাজন নির্দ্দিষ্ট পথের পান্থ হইয়া তত্তৎ ফললাভে সমর্থ হইবে, এই আশায়ই ঐ সমস্ত মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। ঐ সকল মূর্ত্তি

মন গড়া খাম খেয়াল বা বালকের ক্রীড়া পুতুল নহে। আবার একান্ত ভক্ত সাধক, যখন ব্রহ্মানন্দে পরম প্রীতি অনুভব করিয়া, অমৃতোপভোগ করেন, তখন তাঁহার পবিত্র হৃদয়, দৈবাবেশে আবির্ভূত কোন বিগ্রহ না পাইলে. হৃদয় সিংহাসন যেন শূন্য শূন্য বোধ করেন। তখন সাধক ভক্ত, সাধ করিয়া এক দিব্য বরণীয় মূর্ত্তিকে হৃদয় রাজ্য সমর্পণ করিয়া, সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করে। ত্রিতাপ ও হৃদয় গ্রন্থি সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিলোপ পায়। আহা! সাধকের সেই অবস্থা ভূতলে অতুল। তিনি ধন্য তিনিই কৃত-কৃতা তাঁহা৭ই জন্ম সকল, যিনি এরূপ বরণীয় মূর্ত্তিতে আত্ম বরণ করিতে পারিয়াছেন।

জগতের প্রতি পদার্থ বা প্রতি কার্য্য, যেমন সাত্বিক, রাজসিক বা তামসিক মিশ্রিত। উপাসনাও তেমন সাত্বিক রাজসিক তামসিক আছে। সর্ব্বাপেক্ষা সাত্বিক উপাসনাই প্রশস্ততম। শক্তি সাধনও সাত্বিক হইলেই চরমোৎকর্ষে উন্নীত হইবে। তত্বজ্ঞানের অধিকারী অতি বিরল বিশেসতঃ বর্ত্তমান সময়ে। অতএব উপাসনা পথে বিচরণ করিয়া অমৃত ফল লাভ করিতে হইবে। উপাসনা শক্তি অবলম্বন ভিন্ন হইতে পারে না। উপাসনা মানস ব্যাপার বিশেস। এইজন্য সকলের কর্ত্তব্য যাহাতে শক্তিমূর্ত্তি হৃদয় পটে অচিরে চিত্রিত থাকে। এবং সকলের শক্তি সাধনতন্ত্রে প্রথিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহার সন্দেহ নাই। আমরা প্রথম বলিয়াছি, ব্রাহ্মণগণ শাক্ত, পরে বলিয়াছি উপাসকগণ শাক্ত। যে পঞ্চায়তনী দীক্ষা প্রচলিত আছে. উহার প্রত্যেকেই ব্রহ্ম শক্তির আলম্বনে দীক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্মই কখন কালী, কখন বিষ্ণু, কখন রুদ্র প্রভৃতি নাম ও উপাধির মাত্র পার্থক্য, বস্তুতঃ পার্থক্য নাই। গুণ তারতম্যে ও অবস্থাভেদে শক্তি সাধনের বিভেদ আছে, তাহাতেই কেহ শাক্ত কেহ বৈষ্ণব। তা বলিয়া শাক্ত বৈষ্ণবের পৃথক্ জ্ঞানে হৃদয়ে পোষণ না করিয়া, অভেদ জ্ঞানই কর্ত্তব্য. ভাগবতাদি শাস্ত্রেও এবম্বিধ উক্তির অভাব নাই। সকলেই এক লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার জন্য বিভিন্ন সোপানে আরোহণ করেন। কৃষ্ণ ও কালী অভেদ দেখাইবার জন্য কৃষ্ণকালী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। যে চণ্ডী গৃহে অদ্যাপি পঠিত হয়, তাহার আলোচনা করিয়া দেখিলেও অভেদ জ্ঞানই প্রতীতি হয়। এক ব্রহ্ম, এক মায়া ইহাও উপলব্ধি হইয়া থাকে। এই জন্যই চণ্ডীতে লিখিত আছে।

যাদেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণু মায়েতি সংস্থিতাঃ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥,,

এইরূপ বহুবিধ শ্লোকে অভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সমস্তই ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম শক্তির কার্য্য বলিয়া বর্ণিত আছে।

"বিষ্ণু মায়া চেতনা চ বুদ্ধি নিদ্রা তথা ক্ষুধা।
ছায়া শক্তিস্তথা তৃষ্ণা ক্ষান্তি র্জাতিশ্চলজ্জকা॥
শান্তিঃ শ্রদ্ধাচ কান্তিশ্চ লক্ষ্মী বৃর্ত্তিঃ স্মৃতিস্তথা।
দয়া তুষ্টিশ্চ মাতাচ ভ্রান্তির্ব্যাপ্তিশ্চিতিস্তথা॥"

এইরূপ উক্তি বাহুল্যের অসদ্ভাব নাই অতএব ইহা দৃঢ়রূপে বলা যাইতে পারে যে এক ব্রহ্মোপাসনা উপাধি ভেদে বিভিন্ন আখ্যায় আখ্যাত মাত্র পরমার্থতঃ এক সত্য নিত্য নিরঞ্জন। তাঁহার পরাশক্তি প্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন, স্থিত ও অন্তিমে তাহাতেই-বিলীন হইবে।

শক্তি সেবার হ্রাস হওয়াতেই ভারতে দুর্গতি। দৈহিক শক্তিকে বল বলে। ইন্দ্রিয় সামর্থ্যকে ওজঃ বলে ও মনের শক্তিকে সাহস বলে। আমাদের এই তিনটীই ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হইয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার ন্যায় নিষ্প্রভ হইতেছে। দিন দিন উপচয় না হইয়া, অপচয় হইতেছে। আবার আহার ও বিহার প্রভৃতির সহিত, উহার প্রত্যেকের সম্বন্ধ। আহারাদির পবিত্রতা ও সাত্ত্বিকতা সংরক্ষিত না হইলে কখনও দেহ ও ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ হইবে না। সুতরাং একান্ত প্রার্থনীয় শক্তিদেবীও ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধান করিতে আরম্ভ করিবেন। আমাদের প্রাণনশক্তিও খর্ব্বতা অবলম্বন করিতেছে। যে শক্তি, প্রাণনশক্তিকে গুরুতর অনুগ্রহে নিরোধ করিয়া ষড়ূর্ম্মিরহিত * হইতেন এবং জীবন্মুক্ত হইয়া ভূমানন্দ পান করিতেন, তাঁহাদের বংশধর গণের মধ্যে আজ্ রেইলওয়ে গাড়ীতে, যবন-ম্লেচ্ছ সংপৃষ্ট কর্কটায়মান এক খণ্ড রুটীর ভগ্নাংশ গ্রহণ করিতে অত্যন্ত লোলুপ দেখা যাইতেছে। তাহা উদরস্থ বা কবলস্থ না করিলে তাহার কিছুই ক্লেশ বা ক্ষতি নাই, তথাপি যেন ঐ স্থানে উহা না করিলেই তাহার বিশেষ আয়াস হইয়া থাকে। যাহারা নীরস একখণ্ড "বীজকুটে"র লোভে অতি পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম ও জগৎ পূজ্য বংশ

* ক্ষুৎ পিপাসে, শোক মোহৌ জরামৃত্যু ষড়ূর্ম্ময়ঃ।

পরিত্যাগ করিতে চাহে, তাহারা ধরণীর ভার ও দেশের কলঙ্ক ও কুলের অঙ্গার, ইহা আর বলিতে হইবে না।

পুরাকালে আহার বিহারের মেধ্যামেধ্য বিচার ছিল। ধর্ম্মাচরণে মন প্রাণ দিবানিশি ব্যাপৃত থাকিত তাহাতেই, মানসিক শক্তির সম্প্রসারণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়া জগৎগুরু ভারত পৃথিবীতে বিখ্যাত। আমরা এখনও বলি আবার শক্তি সাধনে তৎপর হই। এস আমরা পবিত্র হৃদয়ে শক্তির সেই অমৃতময় প্রস্রবণ অজস্র পান করি, আবার পৃথিবীতে আমরা পরম শাক্ত বলিয়া পরিচিত হই। জাতীয় মন্ত্রে জাগরিত হইয়া সেই, পরমারাধ্যা সঞ্জীবনী শক্তি দেবীর চরণসরোজ মকরন্দ নিরন্তর পান করি। আবশ্যক হইলে হৃদয় শতদলকে নিমেষ মধ্যে উৎপাটন করিয়া পবিত্র চরণে অঞ্জলি প্রদান করি, তিনি দয়াময়ী অবশ্যই আমাদিগকে দশ হস্তে দশদিগ্ হইতে রক্ষা করিবেন। আমাদের প্রার্থনা অবগত হইয়া দুঃখ দূর করিবেন। তখন আমাদের বহিঃ শত্রু কি করিবে? মেষযূথের ন্যায় পলায়ন করিবে। আমরা অন্তঃ শত্রুকে, আত্মা-দের সহিত ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ে নির্ভয়ে তাঁহার নিকটে জ্ঞানাসি দ্বারা বলি প্রদান করিব এবং দেহ উৎসর্গ করিয়া সংসারানলে আহুতি প্রদান করিব, প্রারব্ধ উহার দক্ষিণা। এইরূপ শক্তিসাধন জন্য প্রত্যেকে দীক্ষিত নাহইলে অতি তুচ্ছ লোভে মনকে বিষয়ী করিয়া বিষয় সুখসাগরে নিম-জ্জিত করিলে আর নিস্তার নাই বরং দুর্গতি, উহার তর্পণ নাই বিরাম নাই সুখও নাই। আজ্ ব্রাহ্মণ জাতির এত দুর্গতি, শূদ্র, যবন, ম্লেচ্ছ ও ব্রাহ্মণ প্রায় একাকার হইতেছে লোভ তাহার একতর কারণ, যেলোভ এক সময়ে ব্রাহ্মণের ত্রিসীমা স্পর্শ করিতে ভীত হইত, আজ্ তাহার অন্তঃ-পুরে। কালবশে এরূপ দুর্বিপাক পৃথিবীতে আর কোন জাতির ঘটে নাই। শক্তিহীন হইলে এমনই আশ্চর্য্য কার্য্য প্রত্যক্ষ করা যায় যে, একটু চিন্তা করিলে বিলক্ষণ বিস্ময় রসের সঞ্চার হয়। অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান কুচক্রে পড়িয়া কুসঙ্গের বাতাসে অবলীলাক্রমে ব্রহ্মবন্ধু অথবা ম্লেচ্ছ সাজিতেছেন। সাজিয়াই ক্ষান্ত নহেন, মুকুরে আবার সেই মনো-মোহন মূর্ত্তি সন্দর্শন করিবার জন্য ব্যস্ত হন। শক্তিশূন্য হইয়াই এ স্বপ্নবৎ অচিন্ত্য রচনা রচিত হইতেছে। যদি একান্ত মনে অশেষ সাধনায় আবার শক্তিসিদ্ধির বিশেষ যত্ন না ঘটে, তবে সর্ব্ববিষয়েই ধিক্কার লাভ করিয়া

নানাবিধ ক্লেশ হইবে। আমরা পূর্ব্বাপর দেখিয়া এই স্থির করিতেছি যে এখনও সায়াহ্ন হয় নাই, সূর্য্য ডুবেনাই, বিপক্ষগণ যতই কেন ভ্রূকুটী কুটীলানন হউক না, সকলে সমবেত হইয়া মন প্রাণ ভরিয়া শক্তিসাধন করি এবং ষোড়শোপোচারে যথাসাধ্য, শক্তি সেবা করিয়া পরম শাক্ত হই।—

ধর্ম্ম।

আমরা হিন্দু আর্য্যঋষিগণের সন্তান, এককালে ধর্ম্মই আমাদের জীবন, ধর্ম্ম আমাদের একমাত্র বল ছিল, কিন্তু হায় কালের করালগ্রাসে পতিত অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় আমাদের সেই অমূল্য রত্নটীও নষ্টপ্রায়; কিন্তু ইহার কারণ কি? যাহাইহউক তাহা বলিবার জন্য আমার এ অবতারণা নহে। যে কোন কারণেই হউক আমাদের সেই পবিত্র ধর্ম্ম নষ্টপ্রায় হইয়াছে, এবং যেটুকু অদ্যাপি ও বর্ত্তমান আছে তাহাও নানা প্রকার অর্থে গৃহীত হইয়া বিকৃত হইয়াছে এবং তাহাতে আচরণকর্ত্তাদের সাধনে সুফল প্রসব করে না।—অতএব আমার এখানে একমাত্র বক্তব্য যে ধর্ম্মসাধন করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্ম-পিপাসুগণের ধর্ম্মপদার্থ কি জানা উচিত এবং তাহা বর্ত্তমান সময়ে কোন অর্থে গৃহীত হইয়াছে।

১ম ধর্ম্ম কি? "চোদনা লক্ষণোর্থো ধর্ম্ম" ইতি জৈমিনী—

সূত্রং "চোদনয়া বেদেন লক্ষ্যতে অর্থঃ শ্রেয়ঃ সাধনং"

ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োভ্যুদয়-লক্ষণং

অস্য সম্যগনুষ্ঠানাৎ স্বর্গো মোক্ষশ্চ জায়তে"

ইতি ভবিষ্য পুরাণম্

বেদাদি দ্বারা লক্ষিত শ্রেয়ঃ সাধন যে বস্তু তাহার নাম ধর্ম্ম। শ্রেয়ঃসাধন দুই প্রকার স্বর্গাদিসাধন আর নিঃশ্রেয়স সাধন অর্থাৎ মুক্তিসাধন।

সংকল্প পূর্ব্বক কার্য্য করিলে স্বর্গাদি হয় কিন্তু তাহাতে পুনরায় ভবযন্ত্রণা সহ্য করিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, কারণ ইহা সংসারে বিচরণের ন্যায় স্বর্গাদি বাসও ভোগমাত্র, ইহ সংসারে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি

লাভ হয় এবং তথায় কিয়ৎকালের জন্য বাস করিয়া, তথাকার ভোগপূর্ণ হইলে, জীব পুনরায় দেহধারণ পূর্ব্বক সংসারে অবতীর্ণ হইবে।

যদিও কামনা পূর্ব্বক কার্য্য কর্ম্মপদ বাচ্য, তথাপি উহা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম নহে। নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য আত্মজ্ঞানে সহকারি কারণ বলিয়া মোক্ষ সাধন। ইহাতে কামিত্ব নাই। ("কামাত্মতা ন প্রশস্তা নচৈবেহাস্ত্য কামতা" ইত্যাদি মনু ২অ ২য় শ্লোক)। "আত্মাবারে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যশ্চেত্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বং"। অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হইতে হইলে আত্মার শ্রবণ মননাদি করিতে হয়, এই শ্রবণ মননাদিই প্রকৃত ধর্ম্ম। কিন্তু আত্মধর্ম্মিক শ্রবণ মননাদিতে পদার্থ জ্ঞানের অবশ্যকতা, পদার্থ জানিতে হইলে শাস্ত্র ও গুরূপদেশের আবশ্যকতা —

"ধর্ম্ম বিশেষ সুতাৎ দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায়ানাং পদার্থা নাম্ স্বাধর্ম্য বৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্ব জ্ঞান্নিঃশ্রেয়সং।" "দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় পদার্থানাম্ স্বাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাভ্যাম্ তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়স হেতুঃ।

তচ্চ ঈশ্বর চোদনাভিব্যক্তাৎ ধর্ম্মাদেব।

ইতি কণাদ সুত্র ভাষ্যঃ

"তন্নিঃশ্রেয়সং-তথাচ ঈশ্বর বেদনয়া প্রতিপাদিতাৎ আত্ম ধর্ম্মিক শ্রবণ মননাদ্যাত্মক ধর্ম্মান্নিঃ শ্রেয়সং" ইত্যর্থঃ

কণাদভাষ্য টীকা

সরলার্থ। নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্তি বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকও করে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি আবার ধর্ম্ম কারণ, এই ধর্ম্ম আত্মার শ্রবণ মননাদি তাহাতে দ্রব্যাদি পদার্থ জ্ঞানের আবশ্যকতা।

ভাবার্থ। পদার্থ জ্ঞান হইলে আত্মার শ্রবণ মননাদি হইবে, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে তাহা হইলে মুক্তি হইবে। এইপ্রকার আত্ম চিন্তনই ধর্ম্ম এবং ইহাই মুখ্যধর্ম্ম। ভগবান্ মনু যে দশকং "ধর্ম্মলক্ষণং" বলিয়া যে ধর্ম্ম নির্দেশ করিয়াছেন তাহা উক্ত ধর্ম্মের অঙ্গ, কারণ উক্তপ্রকার ধর্ম্ম যাজনা করিতে হইলে শান্ত দান্ত হওয়া আবশ্যক সুতরাং উহাকেও ধর্ম্ম বা অঙ্গধর্ম্ম বলে।

২য়। ব্রাহ্মণত্ব অশ্বত্ব প্রভৃতি ব্রাহ্মণ অশ্ব প্রভৃতির ধর্ম্ম ইত্যাদি যে ধর্ম্ম পদ ব্যবহার করে, তাহা কিন্তু উক্ত ধর্ম্ম নহে। ঐ ধর্ম্মের অর্থ ইতর

ভেদানুমাপক অর্থাৎ যাহা আছে বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তদিতর হইতে ভিন্ন।

৩য়। "নাষ্টম্যাং মাংস মশ্নীয়াৎ" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে তিথি ভেদে দ্রব্য বিশেষ ভোজন নিষেধ করিয়াছেন তাহাও ধর্ম্ম বলিয়া খ্যাত, তাহার অর্থ উক্ত ধর্ম্ম নহে, কিন্তু শরীর ধর্ম্ম অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্যাদির গতি ভেদে পৃথিব্যাদির ও তজ্জাত দ্রব্যাদির গুণের পরিবর্ত্তন হয়। যে যে তিথিতে যে যে দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন, সেই সেই তিথিতে সেই সেই দ্রব্যের গুণের ব্যতিক্রম হওয়ায় তাহা খাইলে পীড়া হয়। যদি শরীরে সুস্থতা না থাকিবে, তবে লোকে কি প্রকারে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, কারণ "শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং" অর্থাৎ ধর্ম্ম সাধনের পূর্ব্বে সুস্থ শরীরে কারণতা।

৪র্থ। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম শব্দটীর যোগার্থ গ্রহণ হয়, উহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ হয় না। আমার বোধ হয় উক্ত অর্থটী ইংরাজী রিলিজন (Religion) শব্দের অনুবাদ। কারণ ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় গ্রহণ করিলে যাদৃশ অর্থ গ্রহণ হয়, রিলিজন শব্দটীও তদ্রূপ, অর্থাৎ ধৃ ধাতু (ধারনার্থক)+ মন্ এবং রি (re) +লেগো (lego) বন্ধন করা (bind) যাহাতে লোককে কোন বিশেষ কার্য্যে বা সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ করে এবং বাস্তবিক ইহা হইতে দেশধর্ম্ম কুলধর্ম্ম রূপ নানাবিধ বিশেষ বিশেষ কার্য্যের সংজ্ঞা হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রকৃত ধর্ম্ম পদার্থ নহে এবং এই প্রকার এক শব্দের একভাব ভাবান্তরে গৃহীত হওয়ায় আমাদের দেশে আজকাল ধর্ম্ম লইয়া এত গোল, ধর্ম্মের এত দুর্দ্দশা, হায় ইহা কি পাশ্চাত্য বিদ্যারফল না কালের মাহাত্ম্য?

"ধর্ম্মাদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তিভুবনে ধর্ম্মায়তস্মৈনমঃ।" (ক্রমশঃ)।

বালিবধ।

সত্যস্বরূপ রামচন্দ্র নিরপরাধ বালিকে কিরূপে বধ করিলেন, ইহা, আপাততঃ বাস্তবিকই এক কঠিন সমস্যা বলিয়া বোধ হইতে পারে? তাহাতে ও যদি সম্মুখ সংগ্রামে বালিবধ হইত, তাহা হইলেও বা কতকটা কথা ছিল।

কিন্তু এ কি? সত্যময় পুণ্যময় বীর্য্যময় শৌর্য্যময়, ত্রিভুবন বিজয়ী, পরশু রামেরও ধর্ষণকারী ভগবান্ রামচন্দ্র, চোরের ন্যায় বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া একটা বানরকে বিনাশ করিতেছেন। এদৃশ্য ভক্তের নিকট আপাততঃ নিতান্ত লজ্জাকর ও কলঙ্ক কলুষিত। কবি কৃত্তিবাস এ দৃশ্য বর্ণনা কালে যেন নিজেই লজ্জায় জড়সড় ও ম্রিয়মাণ হইয়েছেন। তিনি রামকে দিয়া বলাইতেছেন;—

"সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমারে অধিক বলা না হয় উচিত॥
তোমার সহিত যুদ্ধ মোরে নাহি সাজে।
ক্ষমা কর কপিরাজ কেন পাড় লাজে॥
ক্ষমা কর বীর তব দৈবের লিখন।
আমার প্রসাদে যাহ মহেন্দ্র ভুবন॥"

কবির ন্যায়পরতা এস্থলে কবির ভক্তিকে পরাভূত করিয়েছে। হউন্ না কেন তিনি ভগবান্। তিনি যখন অন্যায় করিয়াছেন, তখন তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য। জয়দেব ভগবান্‌কে বলাইয়াছিলেন।

"স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং"।

জয়দেব ভাবিতেন প্রণয়ের কাছে আবার ঠাকুর দেবতা কি? যদি প্রণয়ের গুণে নায়ক নায়িকার সমান অবস্থা না হইল, তবে আর প্রণয়ের মহিমা রহিল কোথায়? কবি কৃত্তিবাস বড় ন্যায়পর। ভগবান্‌কে অন্যায় কার্য্য করিতে দেখিয়া তিনি যেন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছেন। তাই তিনি ভগবানকে দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়াছেন। কৃত্তিবাস আরও তাঁহাকে দিয়া বলাইতেছেন;—

"ইহা মনে না করিহ আমি নারায়ণ।
কর্ম্মমত ফলভোগ করে সর্ব্বজন॥
বিনা দোষে মারিলে যেমন কপীশ্বরে।
মারিবে তোমারে রাম এই জন্মান্তরে॥"

যাহারা মনে করে, বাঙ্গালীর হৃদয়ে ন্যায়ান্যায় বোধ অল্প, তাহারা বাঙ্গালী কবির এই সাহসময় কবিতা পাঠ করুক। ন্যায় পথে না চলিলে নারায়ণেরও নিস্তার নাই। কোন্ দেশের কবি সাহস করিয়া এ কথা লিখিতে বা ভাবিতে পারিয়াছেন? ঈশ্বর যা করেন, তাহাই ন্যায়, অনেক

জাতিরই এরূপ বিশ্বাস। যে সমস্ত জাতির নৈতিক উন্নতি একরূপ সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহারাই ঈশ্বরের অবতারকেও ন্যায়ের বশীভূত বলিয়া কল্পনা করিতে পারে।

তুলসীদাস রামচন্দ্রকে এ লজ্জায় ফেলেন নাই। রামচন্দ্র একটা বানরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তুলসীদাস হয়ত ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতেন না। আর একটা বানর, সামান্য প্রাণ হারাইয়া রামচন্দ্রকে ভৎর্সনা করিবে, ইহাও ভক্ত কবির হৃদয়ে সহ্য হয় নাই। তাই তিনি লিখিয়াছেন।

মূল।	অনুবাদ।
পড়া বিকল মহি শরকে লাগি।	শর লাগি ভূমে পড়ে বিকল হইল।
পুনি উঠি বৈঠ দেখি প্রভু আগি॥	সম্মুখে দেখিয়া প্রভু উঠিয়া বসিল॥
শ্যামগাত শির জটা বনায়ে।	শ্যামাঙ্গ প্রভুর শিরে জটা লম্বমান।
অরুণ নয়ন শর চাপ চড়ায়ে॥	অরুণ নয়নে করে ধনুঃশর জান॥
পুনি পুনি চিতৈ চরণ চিত দীহ্না।	বারম্বার দেখি, চিত্তে চিত্তে শ্রীচরণ।
সুফল জন্ম মানা প্রভু চীহ্না॥	প্রভুরে চিনিয়া ভাবে সফল জীবন॥
হৃদয় প্রীতি বচন মুখ কঠোরা।	মনে ভক্তি, মুখে বলে কঠোর বচন।
বোলা চিতৈ রামকী ওরা॥	রামেরে চাহিয়া কিছু করিল ভৎর্সন॥
ধর্মহেতু অবতরেহু গোসাই।	ধর্ম্ম হেতু অবতীর্ণ হইলা ধরায়।
মারেহু মোহি ব্যাধ কি নাই॥	কি কারণে ব্যাধভাবে মারিলে আমায়
শুনি সহঠবচ কিএ করমা।	শঠের শুনিয়া বাক্য কিবা এ করিলে।
পরি হরি লোক বেদ কুল ধরমা।	লোক বেদকুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিলে।

বালির এই তিরস্কার শুনিয়া রাম বলিলেন

মূল।	অনুবাদ।
অনুজ-বধূ, ভগিনী, সুত নারী।	ভ্রাতৃবধূ, পুত্রবধূ, তনয়া ভাগিনী।
শুন শঠ, কন্যা সমান চারী॥	এচারি সমান জ্ঞান করে যত জ্ঞানী।
ইহৈঁ কুদৃষ্টি বিলোকে জোই।	ইহাদের করে যেবা কুভাবে দর্শন।
তাহি বধে কছু পাপ ন হোই॥	তাদের বধিলে পাপ না হয় কখন॥

বালী এই কথা শুনিয়াই নিজ দোষ সমস্ত স্বীকার করিয়া লইল, এবং

রামচন্দ্রের বহুবিধ স্তব করিতে আরম্ভ করিল। এস্থলে তুলসীদাস ঘোর ঈশ্বর ভক্তি দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কাব্যে কৃত্তিবাসের ন্যায়, ন্যায়-পরায়ণতার সমাদর নাই। ঈশ্বর কি কখন কিছু অন্যায় করিতে পারেন? তিনি যাহা করেন তাহাই ন্যায়, তুলসীদাস যেন এই ভাবেই কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক অধ্যাত্ম রামায়ণে বালিবধের কিরূপ চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। মুমূর্ষু অবস্থায় বালী রামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে।

বিলোক্য শনকৈঃ প্রাহ বালী রামং বিগর্হয়ন্।
কিং ময়াপকৃতং রাম তব যেন হতোঽস্ম্যহম্॥ (১)

রামকে দেখিয়া বালী মৃদুস্বরে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিল, 'হে রাম! আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে তুমি আমাকে বধ করিলে।' (১)

রাজধর্ম্মমবিজ্ঞায় গর্হিতং কর্ম্ম তে কৃতং।
বৃক্ষখণ্ডে তিরোভূত্বা ত্যজতা ময়ি সায়কং॥ (২)

তুমি বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া আমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলে। তুমি রাজধর্ম্ম জান না। জানিলে কখনই এরূপ নিন্দনীয় কর্ম্ম করিতে না। (২)

যশঃ কিং লপ্স্যসে রাম! চোরবৎ কৃতসঙ্গরঃ।
*　　*　　*　　(৩)

হে রাম! তুমি চোরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া কি যশস্বী হইবে?
*　　*　　*　　(৩)

ধর্ম্মিষ্ঠ ইতি লোকে ঽস্মিন্ কথ্যসে রঘুনন্দন।
বানরং ব্যাধবদ্ধত্বা ধর্ম্মং কং লপ্স্যসে বদ॥ (৪)

পৃথিবীতে সকলেই তোমাকে ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া বলে। কিন্তু আমাকে ব্যাধের ন্যায় হত্যা করিয়া তোমার কি ধর্ম্ম লাভ হইল। (৪)

'ইত্যেবং বহুভাষন্তং বালিনং রাঘবোঽব্রবীৎ।
ধর্ম্মস্য গোপ্তা লোকেঽস্মিং শ্চরামি সশরাসনঃ॥
অধর্ম্মকারিণং হত্বা সদ্ধর্ম্মং পালয়াম্যহং।
দুহিতা, ভগিনী, ভ্রাতুর্ভার্য্যা, চৈব তথা স্নুষা॥
সমা যো রমতে তাসামেকামপি বিমূঢ়ধীঃ।
পাতকী সতু বিজ্ঞেয়ঃ স বধ্যো রাজভিঃ সদা॥

ত্বন্তু ভ্রাতুঃ কনিষ্ঠস্য ভার্য্যায়াং রমসে বলাৎ।
অতো ময়া ধর্ম্মবিদা হতোঽসি বন গোচর॥
ত্বং কপিত্বান্নজানীষে মহান্তো বিচরন্তি যৎ।
লোকং পুনানাঃ সঞ্চারৈ রতস্তান্নাতি ভাবয়েৎ॥'

বালী এইরূপে নানাবিধ তিরস্কার করিলে, রামচন্দ্র বলিতে আরম্ভ করিলেন।—"আমি ধর্ম্মের রক্ষার নিমিত্ত শরাসন হস্তে পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতেছি। আমি অধার্ম্মিককে বিনাশ করিয়া ধার্ম্মিককে পালন করিয়া থাকি। দুহিতা, ভগিনী, ভ্রাতৃবধূ ও পুত্রবধূ এই চারি সমান। যে মূর্খ ইহাদের কাহারও সহিত সহবাস করে সে পাতকী। সে রাজাদিগের কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই বধ্য। তুমি বল পূর্ব্বক তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে উপভোগ করিতেছ। এজন্য আমি তোমাকে বধ করিয়াছি। মহৎ ব্যক্তি কি ভাবে কি কার্য্য করেন তুমি কপি হইয়া তাহার কি বুঝিবে মহদ্ব্যক্তির পদস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র হয়, অতএব তাঁহাদের নিন্দা করিতে নাই।"

রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বালী, নিজ দোষ স্বীকার করিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইল। পরে তারা আসিয়া বিলাপ করিলে, রাম তাঁহাকে নানাবিধ দার্শনিক যুক্তি দ্বারা সান্ত্বনা করিলেন।

তুলসীদাসের সহিত অধ্যাত্মরামায়ণের কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। ফলতঃ অনেক স্থলেই তুলসীদাসকে অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুবাদক বলিয়া মনে হয়। তবে, অঃ রামায়ণে রামচন্দ্র আপনাকে যেরূপ ধার্ম্মিক ও লোক পাবন মহাত্মা বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তুলসীদাস সেরূপ করেন নাই।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, কৃত্তিবাস, তুলসীদাস ও অঃ রামায়ণ এই তিনেরই মূল স্বরূপ বাল্মীকি রামায়ণে বালিবধের কিরূপ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

বালীর যুদ্ধ যাত্রাকালে তারা পরামর্শ দিতেছেন।

"বিগ্রহংমাকৃথা বীর ভ্রাত্রা রাজন্ যবীয়সা।
লালনীয়ো হিতে ভ্রাতা যবীয়ানেষ বানরঃ॥
তত্রবাসন্নিহস্থোবা সর্ব্বথা বন্ধুরেবতে।
নহি তেন সমং বন্ধুং ভুবি পশ্যামিকঞ্চন॥"

"হে বীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিরোধ করিও না। সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ অতএব ত্বৎ কর্ত্তৃক লালনীয়। সে যেখানেই কেন থাকুক না, সে

যে তোমার বন্ধু তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই পৃথিবীতে তাহার মত বন্ধু তোমার কেহই নাই।"

বালী এই শুনিয়া উত্তর করিল—

"গর্জতোহস্য সুসংরব্ধং ভ্রাতুঃ শত্রোর্বিশেষতঃ।
মর্ষয়িষ্যামি কেনাপি কারণেন বরাননে॥
অধর্ষিতানাং শূরাণাং সমরেষ্বনিবর্তিনাং।
ধর্ষণামর্ষণং ভীরু মরণাদতিরিচ্যতে॥"

"আমার ভ্রাতা অথচ শত্রু সুগ্রীব স্পর্দ্ধার সহিত গর্জ্জন করতঃ আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। আমি কেন তাহার স্পর্দ্ধা সহ্য করিব। যাঁহাদিগকে কেহ কখন পরাজিত করে নাই, যাঁহারা যুদ্ধস্থল হইতে কখন প্রতিনিবৃত্ত হন নাই, তাঁহারা মরণের আশঙ্কা থাকিলেও কাহারও অপমান সহ্য করিতে পারেন না।"

মৃত্যুর পূর্ব্বে নিম্নলিখিত বাক্য দ্বারা রামকে তিরস্কার করিয়াছিলেন।

"পরাঙ্মুখ বধং কৃত্বা কোহত্রপ্রাপ্ত স্ত্বয়া গুণঃ।
যদহং যুদ্ধ সংরব্ধস্ত্বৎ কৃতে নিধনং গতঃ॥
কুলীনঃ সত্বসম্পন্ন স্তেজস্বী চরিতব্রতঃ।
রামঃ করুণ বেদীচ প্রজানাং চ হিতেরতঃ॥
সানুক্রোশো মহোৎসাহঃ সময়জ্ঞো দৃঢ়ব্রতঃ।
ইত্যেতৎ সর্ব্বভূতানি কথয়ন্তি যশো ভুবি॥
দমঃ শমঃ ক্ষমা ধর্ম্মো ধৃতিঃ সত্বং পরাক্রমঃ।
পার্থিবানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু॥
তান্ গুণান্ সংপ্রধার্য্যাহং অগ্র্যঞ্চাভিজনং তব।
তারয়া প্রতিসিদ্ধঃসন্ সুগ্রীবেণ সমাগতঃ॥
নমামন্যোন সংরব্ধং প্রমত্তং বেদ্ধুমর্হসি।
ইতি মে বুদ্ধি রুৎপন্না বভূবাদর্শনে তব॥
সত্বাং বিনিহতাত্মানং ধর্ম্মধ্বজমধার্ম্মিকং।
জানে পাপসমাচারং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতং॥
সতাং বেশধরং পাপং প্রচ্ছন্ন মিব পাবকং।
নাহং ত্বামভিজানামি ধর্ম্মচ্ছদ্মাভিসংবৃতং॥"

শঠো নৈকৃতিকঃ ক্ষুদ্রো মিথ্যা প্রশ্রিতমানসঃ।
কথং দশরথেনত্বং জাতঃ পাপো মহাত্মনা ॥"

"হে রাম! আমি যৎকালে অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলাম, তখন আমাকে গুপ্তভাবে বধ করিয়া তোমার কি গুণপনা প্রকাশ হইল। লোকে তোমাকে সদ্বংজাত, বলবান্, তেজস্বী সদাচার, দয়াময়, সর্ব্বহিতে রত করুণ স্বভাব, উদ্যমশীল, দেশকালপাত্রজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত বলিয়া জানে ও বলে। আমি তোমার এই যশ শ্রবণ করিয়া এবং তোমাকে রাজগুণালঙ্কৃত (শম, দম প্রভৃতি গুণালঙ্কৃত) ভাবিয়া তারার নিষেধ বাক্য অবহেলা করতঃ সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তোমাকে দেখিবার পূর্ব্বে আমি ভাবিয়া-ছিলাম যে তুমি কখনই আমাকে (অন্যের সহিত আমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া) অসাবধান অবস্থায় বধ করিবে না। কিন্তু আমি এক্ষণে দেখিতেছি যে, তুমি নিতান্ত দুরাত্মা, ভণ্ড, অধার্ম্মিক, পাপিষ্ঠ ও তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় লোকপ্রতারক। তুমি সতের বেশ ধারণ করিয়া পাপাচরণ করিতেছ। তুমি ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায় নিজের পাপাভিলাষ গোপন করিয়া ধার্ম্মিকের বেশে বিচরণ করিতেছ। আমি তোমার প্রকৃত স্বভাব বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি শঠ পরাপকারী তুমি লোকের নিকট প্রশান্তমানস বলিয়া পরিচিত। তুমি ক্ষুদ্রচিত্ত। মহাত্মা দশরথের ঔরসে তোমার ন্যায় পাপী কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিল ?"

এই তিরস্কার শ্রবণে রাম উত্তর দিতেছেন।

"ইক্ষ্বাকূণামিয়ং ভূমিঃ সশৈলবন কাননা।
মৃগপক্ষিমনুষ্যাণাং নিগ্রহানুগ্রহেষপি ॥
তাং পালয়তি ধর্ম্মাত্মা ভরতঃ সত্যবানৃজুঃ।
ধর্ম্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞো নিগ্রহানুগ্রহেরতঃ ॥
তস্য ধর্ম্মকৃতাদেশা বয়মন্যেচ পার্থিবাঃ।
চরামো বসুধাং কৃৎস্নাং ধর্ম্মসন্তান মিচ্ছবঃ।
যস্মিন্ নৃপতি শার্দ্দূলে ভরতে ধর্ম্মবৎসলে।
পালয়ত্যা খিলাং পৃথ্বীং কশ্চরেদ্ধর্ম্মবিপ্রিয়ং ॥

১। ত্বন্তু সংক্লিষ্ট ধর্ম্মশ্চ কর্ম্মণা চ বিগর্হিতঃ।
কামতন্ত্র প্রধানশ্চ নস্থিতো রাজ বর্ত্মনি ॥

জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতাবাপি যশ্চ বিদ্যাং প্রযচ্ছতি।
ত্রয়স্তে পিতরো জ্ঞেয়া ধর্ম্মে চ পথি বর্ত্তিনঃ॥
যবীয়ানাত্মনঃ পুত্রঃ শিষ্যশ্চাপি গুণোদিতঃ।
পুত্রবৎ তে ত্রয়শ্চিন্ত্যাঃ ধর্ম্মশ্চৈবাত্র কারণং॥
তদেতৎ কারণং পশ্য যদর্থং ত্বং ময়া হতঃ।
ভ্রাতুর্বর্ত্তসিভার্য্যায়াং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং সনাতনং॥
অস্যাতীতস্য তে ধর্ম্মাৎ কামবৃত্তস্য বানর।
ভ্রাতৃভার্য্যাভিমর্শেঽস্মিন্ দণ্ডোয়ং প্রতিপাদিতঃ॥
ঔরসীং ভগিনীং বাপি ভার্য্যাং বাপ্যনুজস্য যঃ।
প্রচরেত নরঃ কামাৎ তস্য দণ্ডো বধঃ স্মৃতঃ॥
ভরতস্তু মহীপালো বয়ং ত্বাদেশবর্ত্তিনঃ।
ত্বঞ্চ ধর্ম্মাদতিক্রান্তঃ কথং শক্যং উপেক্ষিতুং॥

২। প্রতিজ্ঞাচ ময়াদত্তা তদা বানর সন্নিধৌ।
প্রতিজ্ঞাচ কথং শক্যা মদ্বিধেনানবেক্ষিতুং॥

৩। শ্রূয়তাং মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চারিত্রবৎসলৌ।
গৃহীতৌ ধর্ম্মকুশলৈ স্তথা তচ্চরিতং ময়া॥
রাজভির্ধৃতদণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্ম্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা॥
শাসনাদ্বাপি মোক্ষাদ্বা স্তেনঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
রাজাত্বশাসনাত্তস্য তদবাপ্নোতি কিল্বিষং॥

৪। বাগুরাভিশ্চ পাশৈশ্চ কূটৈশ্চ বিবিধৈ র্নরাঃ।
প্রতিচ্ছন্নাশ্চ দৃশ্যাশ্চ গৃহ্নন্তি সুবহূন্ মৃগান্॥
প্রধাবিতান্ বা চিত্রস্তান্ বিস্রব্ধানতিবিষ্ঠিতান্।
প্রমত্তান প্রমত্তান্ বা নরা মাংসাশিনোভৃশং।
বিধ্যন্তি বিমুখাংশ্চাপি নচ দোষোঽত্র বিদ্যতে॥"

রামচন্দ্রের উত্তরটিকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

(১) এই পৃথিবীস্থ সমস্ত শৈল, কানন, বন, ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজগণের সম্পত্তি। অত্রস্থ পশু পক্ষী মনুষ্য এ সমস্তকেই নিগ্রহ বা অনুগ্রহ করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে। সত্যবান্, সরল, ধর্ম্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞ, পাপীর দাতা, পুণ্যবানের অনুগ্রাহক, ধর্ম্মাত্মা ভরত একণে এই পৃথিবী শাসন

করিতেছেন। আমি ও অন্যান্য রাজারা ভরতের আদেশে পৃথিবীতে ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য বিচরণ করিতেছি। ধর্ম্মবৎসল ভরত রাজা থাকিতে, কাহার সাধ্য যে পাপাচরণ করিয়া নিস্তার পাইতে পারে? তুমি অধর্ম্ম পথ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের অমর্য্যাদা করিয়াছ। তুমি রাজনীতি বিস্মৃত হইয়া কেবল কাম ভোগের অন্বেষণ করিয়াছ। দেখ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতা, ও শিক্ষক এই তিনই তুল্য সম্মানার্হ। এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিষ্য ও পুত্র এই তিনই তুল্য স্নেহের পাত্র। তুমি সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীতে অনুরক্ত হইয়াছ। এইজন্য আমি তোমায় বধ করিয়াছি। যে ব্যক্তি কন্যা, ভগিনী, বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীতে আসক্তি করে, সে স্মৃতির আদেশ অনুসারে বধ্য হয়। আমি ভরত রাজার আজ্ঞাকারী হইয়া তোমার পাপাচরণের প্রতি উপেক্ষা করিতে পারি নাই।

(২) এতদ্ভিন্ন আমি সর্ব্ব বানর সমক্ষে তোমার বধ সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎপালনে বিরত হওয়া আমার ন্যায় লোকের পক্ষে অসম্ভব।

(৩) মনুতে ধর্ম্মের উপকারক ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি কর্তৃক অনুমোদিত দুইটী শ্লোক আছে। আমি ঐ শ্লোক অনুসারে কার্য্য করিয়া তোমাকে বধ করিয়াছি। ঐ শ্লোক দুইটি এই।

পাপী, রাজা কর্তৃক দণ্ডিত হইয়া, পাপ মুক্ত হয়, এবং পাপমুক্ত হইয়া সে সাধু পুণ্যবানের ন্যায় স্বর্গারোহণ করিতে পারে। চোর, রাজা কর্তৃক শাসিত বা মোচিত হইলে উহার পাপশান্তি হয়। কিন্তু যদি রাজা পাপীর পাপ সম্বন্ধে কোন রূপ বিচার না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পাপীর পাপ সমস্ত বহন করিতে হয়।

(৪) মনুষ্যেরা পাশ (রজ্জু), জাল প্রভৃতি নানাবিধ সন্তযন্ত্র দ্বারা কখন বা প্রকাশ্যে কখনও বা গোপনে পশু পক্ষী মৃগয়া করেন। ভয়ে পলায়মান, ভীত, বিশ্রব্ধ, স্বপালিত মৃগের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত সাবহিত বা অসাবধান এ যে কোন অবস্থাতেই পশুপক্ষী সংহার করা যাইতে পারে, তাহাতে কোন পাপ হয় না।

ইহার পরে রাম তারার নিকট হইতে আরও কিঞ্চিৎ মিষ্ট ভৎর্সনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তারা কর্তৃক শাপের কোন কথা বাল্মীকিতে নাই।

বালি বধের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ হইতে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি?

(১) বাল্মীকিতে রামচন্দ্র এক জন ধার্ম্মিক বীর পুরুষ মাত্র। তিনি অবতার বলিয়া আপনাকে বর্ণনা করেন নাই। তিনি রাজা, পুণ্যের প্রবর্ত্তক এবং পাপের শাস্তা। তিনি বলিতেছেন, আমি রাজা, রাজার ন্যায় আচরণ করিয়াছি। এবং হিন্দু শাস্ত্রে অবতার সম্বন্ধে নিয়মও এই। যিনি যখন যে জন্মে অবতীর্ণ হন, তিনি তখন সেই জন্মোচিত কার্য্য করেন। সে জন্মের যে কর্ত্তব্য কার্য্য তিনি তাহাই সম্পাদন করেন। ভগবান্ বলিয়া তিনি আপনাকে নিজ জন্ম, নিজ জাতি, নিজ বর্ণ, নিজ আশ্রম, প্রভৃতির বহির্ভূত বলিয়া মনে করেন না। রাজা পাপীর শাস্তি করেন, রামচন্দ্র তাহাই করিয়াছেন। রাজা মনুর নিয়ম পালন করেন, রামচন্দ্রও তাহাই করিয়াছেন। রাজা বিগর্হিত উপায় অবলম্বনে মৃগয়া করেন, রামচন্দ্রও তাহাই করিয়াছেন। বাল্মীকি যে রামচন্দ্রকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন না তাহা নহে। বাল্মীকি অন্যকে দিয়া বারম্বার রামচন্দ্রকে ভগবান্ বলিয়া বলাইয়াছেন। তবে বাল্মীকির বক্তব্য এই যে, যখন নারায়ণ বিষ্ণুরূপে বৈকুণ্ঠে অবস্থিত, তখন তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য স্বতন্ত্র, তখন তাঁহার কার্য্য প্রণালীও স্বতন্ত্র। কিন্তু ঐ ভগবানই যখন ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার কার্য্য প্রণালী স্বতন্ত্র ও কর্ত্তব্য কার্য্য স্বতন্ত্র হইল। সদয় হৃদয় বুদ্ধ ও নির্দ্দয় হৃদয় পরশুরাম এ উভয়ই ভগবানের অবতার। তিনি যখন সদয় সন্ন্যাসী, তখন তাঁহার হৃদয় দয়ায় পরিপূর্ণ। এবং যখন তিনি নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ, তখন তাঁহার হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্রও নাই। একই ভগবানে সদয় ও নির্দ্দয় এই দুই বিশেষণই আরোপিত হয় কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে অবতার বিশেষে ভগবানের চরিত্র, কর্ত্তব্য কার্য্য, কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় রাজা। তাঁহার চরিত্র সমালোচনা করিতে হইলে রাজনীতি ও ক্ষত্রিয় নীতিকে আমাদের আদর্শ করিতে হইবে। বাল্মীকি ও তাহাই করিয়াছেন। এইরূপ করাতে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও কাব্যের সৌন্দর্য্য উভয়ই সুন্দররূপে সংরক্ষিত হইয়াছে।

২। অধ্যাত্ম রামায়ণকার ও তুলসীদাস ভক্ত। রামচন্দ্রের মূর্ত্তি তাঁহাদের হৃদয়ের প্রত্যেক কক্ষ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। রামচন্দ্রের ভগবত্তা

তাঁহারা একবারও বিস্মৃত হইতে পারেন না। ভগবানের সহিত অবতারের যে পার্থক্য, ইহা তাঁহারা বিস্মৃত হইয়া যান। যখন ভক্তিতে হৃদয় উদ্বেলিত হয়, তখন অত সূক্ষ্ম তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখাও যায় না। তখন কেবল এই কথাই মনে থাকে যে রামচন্দ্র পূজ্য ও আরাধ্য এবং আমরা তাঁহার পূজক ও সেবক। বাল্মীকি নিজ ভক্তিকে সংযমিত করিতে পারিতেন। ইহাঁরা তাহা পারিতেন না। এইজন্য বাল্মীকির সহিত ইহাঁদের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। তাহার পরে আমাদের কৃত্তিবাস। ইনিও রামচন্দ্রের ভগবত্তা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। অবতারকে ভগবানের স্থলে দণ্ডায়মান করাইয়া কৃত্তিবাস, উভয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখিলেন, দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইলেন। তাঁহার কাব্যে ঐ ব্যথার পরিচয় স্পষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামচন্দ্রকে ক্ষত্রিয় রাজা বলিয়া ভাবিলে, বালি বধে কিছুই লজ্জার বিষয় থাকে না। কিন্তু কৃত্তিবাস তাহা না করিয়া রামচন্দ্রকে ভগবদুচিত নীতির দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছেন। এই পরীক্ষায় কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য দেখিয়া কৃত্তিবাস যথা সাধ্য সেই অসামঞ্জস্য পরিহারের চেষ্টা করিয়াছেন।

(৪) কিন্তু কি নীতি, কি ধর্ম, কি কাব্য, সর্ব্বাংশেই বাল্মীকি নিরবদ্য ও নির্দ্দোষ। এক জন ফরাসিস্ লেখক রামায়ণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"It is an immense poem, as wide as the Indian Ocean.

It is a book of divine harmonoy, without a breath of discord."

এই মহাকাব্য ভারত সাগরের ন্যায় অসীম। ইহাতে স্বর্গীয় সামঞ্জস্য বিরাজিত আছে। ইহার কুত্রাপি বিন্দুমাত্র অসামঞ্জস্য নাই।" যিনি বাল্মীকির অনুসৃত পথ হইতে বিন্দুমাত্রও পরিচালিত হইয়াছেন, তাঁহাতেই কোন না কোন প্রকারের অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে।

সৃষ্টি অনাদি।

মনুষ্যের কতিপয় অঙ্গ ধ্রুব বলি খ্যাত। যথা কণ্ঠ, উদর, বক্ষঃ প্রভৃতি। এই অঙ্গ নাই অথচ মনুষ্য জীবিত রহিয়াছে, ইহা, কখন দৃষ্টিগোচর হয় না। অপর কতিপয় অঙ্গ অধ্রুব বলিয়া পরিগণিত, যথা অঙ্গুলি ভ্রূ প্রভৃতি। উহাদের অভাবেও মনুষ্যের জীবন রাখিতে হয় না।

মানব দেহে যদ্রূপ প্রাগুক্ত দ্বিবিধ অঙ্গ বিরাজমান। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ দ্বিবিধ. সত্য পরিলক্ষিত হয়; উহার কতিপয় সত্য আছে; যাহাতে বঞ্চিত হইলে, লোকের ধর্ম্ম সংস্কার নিতান্ত দূষিত, এবং নাস্তিকতায় পরিণত হয়; অপর কতিপয় সত্য আছে ; যাহাতে ভ্রান্ত হইলেও লোকের নাস্তিকতা রূপ ভীষণ অবস্থায় উপনীত হইতে হয় না। ইহার প্রথমোক্ত সত্য গুলি ধ্রুব সত্য এবং দ্বিতীয় গুলি অধ্রুব সত্য বলিয়া গণনীয়।

আমাদের সামান্য বিবেচনায় "সৃষ্টি অনাদি" ইহা একটি ধ্রুব সত্য—যাহার ইহাতে ভ্রম ও অবিশ্বাস আছে, তাহাকে নিশ্চয় দারুণ মোহে নিপতিত হইয়া ভূতবাদ ও নাস্তিকতায় উপনীত হইতে হয়। অতএব এতদ্বিষয়ে যাহাতে লোকের ভ্রম অপনীত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নকরা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আসুন, আমরা প্রথম দেখি এই বিষয় আগমোক্ত প্রমাণ কি ?

কঠোপ নিষদের ৬ষ্ঠ বল্লীর প্রথম এই—

'ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃত মুচ্যতে॥'

এই অনাদি অনন্ত সংসার বৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধ ;—অর্থাৎ ভগবান্ নারায়ণ; ইহার শাখা অধোগত অর্থাৎ স্বর্গ নরক ভূলোকাদি রূপে অবস্থিত ঐ মূল শুক্র অর্থাৎ স্বতশ্চৈতন্যময়, মহৎ হইতে মহৎ এবং অমৃত বলিয়া অভিহিত।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতার ১৫শ অধ্যায়ে অর্জ্জুনের নিকট এই কথাটি বলিয়াছেন—

ঊর্দ্ধমূল মধঃশাখ মশ্বত্থং প্রাহুর ব্যয়ং।
ছন্দাংসিযস্য পর্ণানি যস্তংবেদ সবেদবিদ্। ২।

এই সংসার প্রপঞ্চরূপ বৃক্ষ; অশ্বত্থ অর্থাৎ অদ্য একরূপে অবস্থিত, এবং দিনান্তরে রূপান্তরে পরিণত সুতরাং বিনশ্বর; অথচ অব্যয়, অর্থাৎ প্রবাহরূপে

নিত্য; ইহার মূল উর্দ্ধ পুরুষোত্তম নারায়ণ; এবং শাখা হিরণ্য গর্ভাদি স্তম্ভপর্য্যন্ত ক্রমে অধোগত; বেদ সকল ইহার পত্র, কারণ ছায়া স্থানীয় বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা ইহা সেবনীয় হইয়াছে। যিনি এইরূপ সংসারকে জানেন তিনিই বেদার্থ বুঝিতে পারেন। তিনি স্পষ্টতর রূপে ইহার অনাদিত্ব প্রতিপাদনের জন্য পরে বলিয়াছেন।

নরূপ মস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো নচাদি র্নচ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ় মূল মসঙ্গ শাস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা।
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তিভূয়ঃ।

সংসারবাসী জীবগণ ইহার উর্দ্ধ মূলত্বাদি ভাব উপলব্ধি করিতে অক্ষম, ইহার অন্ত নাই, আদি নাই এবং সংপ্রতিষ্ঠা, একরূপে অবস্থিতিও নাই; সুবিরূঢ় মূল সংসার বৃক্ষকে দৃঢ় বিবেক অস্ত্রে ছিন্ন করিয়া, ইহার মূলভূত পরম বস্তুর অনুসন্ধান করিতে হইবে। যাহা লাভ করিলে, আর ভব যন্ত্রণায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না।

"সৃষ্টির আদি নাই" আস্তিকতার এই ধ্রুব অঙ্গ, সকল শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়। দেখুন স্বায়ম্ভুব মনু কি বলিয়াছেন—

মন্বন্তরাণ্যসংখ্যানি সর্গঃ সংহারএবচ।
ক্রীড়ন্নিবৈ তৎ কুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃ পুনঃ॥

মন্বন্তর সৃষ্টি ও সংহার ইহার কিছুরই সংখ্যা নাই; অধ্যাপক অধ্যাপন-কালে যে কর সঞ্চালনাদি করেন—উহাতে যেমন বিশেষ আয়াসও নাই উদ্দেশ্যও নাই; পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাণ্ড, তদ্রূপে পুনঃ পুনঃ এই বিশ্ব সংসার সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন। ইহাতে তাহার কোনও আয়াস বা উদ্দেশ্য কিছু নাই।

পূর্ব্বোক্ত বিষয় অনুসন্ধান করিলে "সৃষ্টির আদি নাই" ইহা যে আগমসিদ্ধ তাহা অনায়াসে প্রতীত হইবে।

এইক্ষণ বিবেচনা করা আবশ্যক—ইহার সহিত ধর্ম্মতত্ত্বের কতদূর সম্বন্ধ? যাহারা 'সৃষ্টি অনাদি" ইহা না বুঝিয়াছেন, তাহারা আর একটি বৈদিক তত্ত্ব বোধ করিতে অক্ষম। তাহা কি? প্রেত্যভাব—পুনর্জ্জন্ম।

যথা কঠোপনিষদ্ পঞ্চম বল্লী ৭ম সূক্ত।

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থানুমন্যেঽনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতম্।

যে সকল জীব ব্রহ্মজ্ঞান বিধুর, তাহারা স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম ও জ্ঞান অনু-সারে শরীর ধারণের নিমিত্ত, মাতৃযোনিতে প্রবেশ করে; অন্যেরা স্থাবর-ভাব আশ্রয় করে।

তাহারা বলিবেন—যদি কর্ম্মানুসারে জীব জন্ম ধারণ করে, তবে প্রথম সৃষ্টির কালে জীবের জন্ম হইল কেন? "সৃষ্টি অনাদি" এই বৈদিক তত্ত্বে যাহার আস্থা নাই, তাহার মনে সুতরাং এই বিতর্ক উপস্থিত হইবে বাধা কি?

ইহার পর সে মনে করিবে—যদি প্রথম জন্ম, প্রাক্তন পাপ পুণ্য ব্যতি-রেকে, হইয়াছে—ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইল; তবে বর্ত্তমান জন্ম তদ্রূপে হইয়াছে ইহা স্বীকার করাই যুক্তি যুক্ত। এবং তাহা হইলে পূর্ব্বে আমাদের নানা জন্ম অতীত হইয়াছে, এই প্রকার অনাবশ্যক জন্ম পরম্পরা স্বীকার না করিয়া—ইহা আমাদের প্রথম ও শেষ জন্ম এই প্রকার স্বীকার করিতে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। অতএব ইহাই আমাদের প্রথম ও শেষ জন্ম, এই সিদ্ধান্তে লোক উপস্থিত হয়। এই এক জন্ম বাদ নাস্তিক খৃষ্টান ও ব্রাহ্মগণ অনুসরণ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত নাস্তিকগণ মনে করেন—যদি শূন্য হইতে আত্মা উৎপন্ন হইতে পারে—তবে দেহ পাতের পর, উহা পুনর্ব্বার তদবস্থায় উপস্থিত হইবে ইহাতে বাধা কি? সুতরাং অপ্রামাণিক পারলৌকিক দণ্ডভয়ে, সুখকর অর্থকাম পরিত্যাগ করা বিবেচকের অকর্ত্তব্য।

যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ইহা হইতেই "যত কাল জীবন থাকে, তাবৎ সুখে থাকিতে হইবে, ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিতে হইবে" এই সুসভ্য মত প্রচারিত হইয়া উঠে।

আমরা কোন ধর্ম্মের নিন্দা করিতে ইচ্ছা করি না; আমাদের অভিপ্রায় এই যে, বৈদিক সনাতন সত্য হইতে বিচ্যুত হইলে, লোক কিরূপ বিপন্ন হয় তাহা প্রদর্শন করা—সুতরাং অতঃপর খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম দিগের কোন নাম উল্লেখ না করিয়া, প্রাগুক্ত একজন্ম বাদ হইতে কি কি ভ্রমে পতিত হইতে হয় তাহা প্রদর্শন করিব।

আমাদের বিশ্বাস যাঁহারা এক্ষণও বিচারক্ষম রহিয়াছেন, সর্ব্বতোভাবে পর-প্রত্যয়-নেয় বুদ্ধি হয় নাই—তাহারা স্ব স্ব ভ্রম উপলব্ধি করিতে পারিলে সংশোধন করিয়া আমাদের শ্রম সার্থক করিবেন।

এই এক জন্মবাদ হইতে আর একটী সনাতন সত্যে সংশয় উপস্থিত হয় তাহা এই ভগবান্ বলিতেছেন—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। গীতা ৯।২৯।

আমি সকল জীবের পক্ষেই সমান, আমার নিকট কেহ দ্বেষ্যও নহে প্রিয়ও নহে। বোধ হয় আস্তিক মাত্রেই ইহা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক। কারণ যিনি স্বীয় চক্ষু উন্মীলন করিয়া চতুর্দ্দিক দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পৃথিবীতে জীবের এতাদৃশ অনেক সুখ ও দুঃখ দৃষ্টিগোচর হয়; যাহার কারণ রূপে তাহাদের ঐহিক কোনও সুকৃত দুষ্কৃত অনুমিত হইতে পারেনা।

এই বিষম সমস্যার মীমাংসার জন্য কতিপয় সম্প্রদায়, আর এক অবৈদিক সিদ্ধান্তের শরণাপন্ন হইয়াছেন—তাহা এই যে, একজন ব্যক্তি পাপ করিয়াছে তাহার নিমিত্ত ঐ পাপের অনুষ্ঠান কালে, যাহার কোথাও অস্তিত্ব ছিল না এবং তাহার পরে সত্তালাভ করিয়াছে, তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে।

যেমন পিতা কোন অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহাও অনেক সময় নিতান্ত অজ্ঞাতসারে, তাহার জন্য পুত্রকে দণ্ডিত হইতে হইবে। ইহা আবার এতদূর অগ্রসর করা হইয়াছে, যে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি, এক কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার কার্য্যে আমি অনুমোদন করি নাই, তাহাকে, আমি দেখি নাই, তাহার সত্তায় আমার বিশ্বাস নাই অধিকন্তু একজন্ম বাদ অনুসারে তৎকালে জগতের অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশেও আমার কোন অস্তিত্ব ছিল না, যদি তিনি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ হয়েন, তবে কত শত বার হোমিওপ্যাথিক ডাইলিয়ুসনেরপর, তাহার শোণিতের কণৈককণা আমাদের দেহে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাতেও ঐ কার্য্যের জন্ম আমাদের পাপ হইয়াছে এবং দণ্ডিত হইতে হইবে, এইমত প্রচার করিতে কত দরিদ্রের শোণিত শোষণ পুরঃসর আহৃত অর্থেরব্যয় হইতেছে; তাহার সংখ্যা নাই।

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকে, আমরা কোন পাত্রের মুখে নিম্নলিখিত দণ্ডের কথা শ্রবণ করিয়া হাসা সম্বরণ করিতে পারি নাই—

অস্মচ্ছ্যালক মিত্র মাতুল সুতা মিথ্যাভিশস্তা পরৈ স্তৎসম্বন্ধ বশান্ময়া স্বগৃহিণী প্রেয়স্যাপি প্রোজ্‌ঝিতা।

আমার যে শ্যালক তাহার যে মিত্র, তাহার যে মাতুল তাহার কন্তার প্রতিকূলে শত্রুগণ এক অলীক অপবাদ রটনা করিয়াছিল, উহার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া, আমি প্রিয়তমা ভার্য্যাকেও পরিত্যাগ করিয়াছি।

আমাদের সামান্য বিবেচনায় প্রাগুক্ত অবৈদিক সম্প্রদায়, ভগবানের দণ্ড বিধানের যে নীতি, জগতে প্রচার করিতেছেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে, প্রবোধ চন্দ্রোদয়ে ভার্য্যার পরিত্যাগরূপ দণ্ড বিধাতা, কোন প্রকারে উপহাসের যোগ্য হইবেন-এইরূপ বোধ হয় না।

এই প্রকার বিশ্বাস হইতে আর একটি অবৈদিক বিশ্বাস বহুলোকের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে, যাহার সমকালে আমাদের কোন প্রকার সত্তা ছিল না, যাহার সহিত আমাদের কোন রক্ত সম্বন্ধও নাই তিনি বহুশতাব্দী হইল, এক প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারিবে। পাপও প্রক্ষালিত হইবে। মন্দ নয়, যে দরে খরিদ সেই দরে বিক্রী!

এই বিষয়ে সনাতন ধর্ম্মের সত্য এই—

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতং এক এবতু দুষ্কৃতং।

মনু ৪। ২৪০।

জীব একাকীই উৎপন্ন হয় এবং একাকীই বিলয় পায়। একাকী স্ব স্ব সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফল ভোগ করে।

এখন পাঠকগণ তুলনা করিয়া দেখুন এই সত্য ধর্ম্মানুমোদিত সিদ্ধান্ত কিরূপ ন্যায়োপেত ও সুসঙ্গত।

কতিপয় সম্প্রদায়—অপাংমধ্যেতস্থিবাংসংতৃষ্ণাবিজ্জবিতারং—ভারতবর্ষে বাস করিয়া সনাতন সত্যে বঞ্চিত। তাহারা অন্য কোন সম্প্রদায়ের অনুকরণে "সৃষ্টির অনাদিত্ব জন্মান্তর, প্রাক্তন পাপ পুণ্য, কিছুই স্বীকার করেন না। কেন বিনাদোষে ও বিনাগুণে লোকে নানাবিধ ক্লেশ ও সুখ ভোগ করে? সৃষ্টির এ বিচিত্র বৈষম্যের কারণ কি? তাহারা এই প্রশ্নের কোনও মীমাংসা করিতে পারেন না, কেহ কেহ "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" গোছের এক উত্তর করিয়া, নিজের চিত্তকে প্রবোধ দিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা জগতের সুখ দুঃখাদি বৈচিত্র্য আকস্মিক এই দৃষ্টান্তে বিশ্ব সংসার আকস্মিক বিবেচনা করিয়া, ভয়াবহ নাস্তিকতায় নিপতিত হয়েন, অপরেরা সৃষ্টি অনাদি পুনর্জ্জন্ম প্রাক্তন পাপ পুণ্য—এই সকল সত্য হইতে বিচ্যুত হইয়া ভগবানের বিশ্বরাজ্যকে ভবচন্দ্র রাজার রাজ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।

প্রাগুক্ত সম্প্রদায়ের পারলৌকিক সিদ্ধান্তও চমৎকার!

ইহাদের মতে পাপী ও পুণ্যাত্মা সকলেই মৃত্যুর পর উন্নততর আধ্যাত্মিক জগতে' অর্থাৎ ভগবানের স্বদেশীয় রাজ্যে উপনীত হইয়া থাকেন, ফলতঃ যাহারা পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন না তাহাদিগকে, হয়, নাস্তিক হইতে হইবে? না হয় এই প্রকার একটা কিছু কল্পনা করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন গতি নাই। সুতরাং লিখি না লিখি সকলেরই দারগ্‌গিরি নিশ্চয় আছে। এই সকল মত যে, নিতান্ত পাপাচারের পরিপোষক তাহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হয়।

বর্ত্তমান সময়ে যে পাপ প্রবাহ শত মুখে প্রবাহিত হইতেছে এই সকল অবৈদিক মত প্রচারই তাহার কারণ সন্দেহ নাই। বৈদিকতত্ত্ব সকল উপেক্ষিত হইলে, বিশ্বসংসার ন্যায় শৃঙ্খলভ্রষ্ট ও অন্ধকারময় এবং লোক সমাজ নিশ্চয় কুসংস্কারময় হইয়া পড়ে।

হে ভূতভাবন নারায়ণ! তুমি তোমার সনাতন সত্য প্রচার করিয়া পতনোন্মুখ মানব সমাজকে রক্ষা কর।

আগমিক একটি সত্যকে উপেক্ষা করিলে, লোকের কিরূপ বিপদ হয় তাহা কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত হইল; দ্বিতীয় প্রস্তাবে সৃষ্টি অনাদি এই বিষয়ে সাধক ও বাধক প্রমাণ পর্য্যালোচিত হইবে।

২য় ভাগ ১২৯৪ সাল ৬ষ্ঠ খণ্ড.

সৃষ্টি প্রবাহের অনাদিত্ব পরীক্ষা।

যাহারা ভগবানের অচিন্তনীয় কৌশলে শ্রুতি প্রতিপাদিত তত্ত্বে বঞ্চিত; তাহারাও এই পর্য্যন্ত অবগত আছেন যে,—যে কাল, অতীত ভাগে অনাদি, ভবিষ্যদংশে অনন্ত, মধ্যভাগে সাগরদ্বয়ান্তর্গত যোজক-কল্প বর্ত্তমান রেখা দ্বারা বিভক্ত; যে দিক্ বামে দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, ঊর্দ্ধে ও অধোমুখে পরিধিহীন বৃত্তাকারে, অনন্তরূপে বিস্তীর্ণ, সকল ব্যক্তিই মনে করে যেন সে উহার কেন্দ্রস্থানে বিরাজমান; ইহাদের কোথাও এমন একটু ক্ষণ নাই এবং এমন একটু অবকাশ নাই—যাহাতে ভূতভাবন বিশ্বনাথ অবর্ত্তমান বা অনাসন্ন রহিয়াছেন, ইহা সত্য ইহা বৈদিক।

সর্ব্বান ন শিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূত গুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ।

শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রঃ। *

---

*এই অসীম জগতের সমস্ত পদার্থই তাঁহার মুখ, আনন এবং গ্রীবাস্বরূপ। তিনি সকল জীবের বুদ্ধি রূপ গুহায় শয়ান রহিয়াছেন, অতএব সেই শিব সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত।

পরন্তু জগতে এমন অনেক লোক আছেন, কেবল লোক কেন? অনেক জাতিও আছে—যাহারা মনে করেন যে ঈশ্বর সর্ব্বদা ঈশ্বর ছিলেন না; তাঁহার ঈশ্বরত্বের গৌরব কতিপয় সহস্র বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে তৎ-তৎ পূর্ব্বে তিনি কখনও সৃষ্টি করেন নাই। এই সিদ্ধান্ত বেদ বিরুদ্ধ এবং অসত্য।

সূর্য্যাচন্দ্র মসৌধাতা যথা পূর্ব্ব মকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষ মথোস্বঃ॥

অনন্তর বিধাতা সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, ভূলোক, অন্তরিক্ষ এবং স্বর্গ পূর্ব্ব-বৎ সৃষ্টি করিলেন।

ঋগ্বেদোক্ত এই অঘমর্ষণ সূক্তে "যথাপূর্ব্বং" এই পদ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে অনাদি বিধাতার কার্য্যও অনাদি।

শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ।"

জগতে কতগুলি বিষয় আছে—যাহা চিন্তার অতীত; উহা তর্করূপ তুলাদণ্ডে আরোপণ করিতে নাই। তদ্বিষয়ে আগম প্রমাণই আশ্রয়ণীয়; কিন্তু এতদ্দেশে, কতিপয় ব্যক্তি জন্ম ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ বুদ্ধিবলেই সমুদয় তত্ত্ব নিশ্চয় ও কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে উদ্যত। তাহা-দিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন মক্ষিকাগণ পক্ষ পাত দ্বারা, আচক্রবালব্যাপী মেঘমালাকে অপসারণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যাহা হউক, যাহাদের কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র নাই, তাহাদের সহিত সৃষ্টি প্রবাহের অনাদিত্ব বিষয়ে তর্ক করিতে হইবে; সুতরাং আমাদের এই বিষয়ে ধর্ম্ম শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ সঙ্গত হয় না; রথে আরোহণ করিয়া নীরথ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা, ভারতবর্ষে, চিরকাল নিন্দনীয়।

বিচার।

হেতু। বৈদিক আর্য্যগণ বলেন "বিধাতা চিরকালই বিধাতা এবং তাঁহার সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি এবং ম্লেচ্ছ ও তদনুচিকীর্ষু ব্যক্তিগণ, বলেন= ঈশ্বর কতিপয় বর্ষ হইল বিধাতা হইয়াছেন এবং তাহার সৃষ্টি সাদি—এই পরস্পর বিরোধী বাক্য জনিত সংশয় বিচারের হেতু।

বিচারের প্রয়োজন ?—আর্য্যগণ পক্ষে সৃষ্টির প্রবাহের অনাদিত্ব স্বীকৃত না হইলে জন্মান্তর প্রমাণীকৃত হয় না, তদভাবে শাস্ত্রে ও ঈশ্বরের ন্যায়-পরতায় এবং পরিপূর্ণতায় অবিশ্বাস হয়; এবং তন্নিবন্ধন পাপভয় ও পুণ্যানুরাগ শিথিলীভূত হয় বলিয়া, লোক যথেচ্ছাচরণ দ্বারা অধোগতি লাভ করে, তন্নিবারণ বিচারের প্রয়োজন।

ম্লেচ্ছ ও তদনুচিকীর্ষুগণের পক্ষে সৃষ্টিপ্রবাহ সাদি হইলে, শাস্ত্রে অবিশ্বাস হয়; এবং তাহা হইলে লোক স্বাধীনভাবে অনুরঞ্জন পূর্ব্বক যুবতি বিবাহ, যথেচ্ছ ভাবে আহার, বিধবার সংযম ভঙ্গ; এবং পরস্পর অসামঞ্জস্যে, দাম্পত্য বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া সভ্যতা লাভ করিতে সমর্থ হয়, ইহাই প্রয়োজন।

সৃষ্টি প্রবাহের সাদিত্ববাদিগণের যুক্তি। যাহার প্রত্যেকের যে ধর্ম্ম থাকে, উহার সমুদায় সেই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়; দৃষ্টান্ত—যদি বস্ত্রের প্রত্যেক সূত্র ধবলবর্ণ হয় তবে সমুদয় বস্ত্রই শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে। অতএব সৃষ্টির প্রত্যেক অঙ্গ সাদি সুতরাং সমুদায় সৃষ্টি সাদি।

এই যুক্তির প্রতিকূলে আচার্য্যগণ বলেন "সৃষ্টি সাদি" এই মতাবলম্বিগণের অনুমান দ্বারা উহা প্রমাণ করিবার অধিকার নাই। কারণ অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবার মূলে একটি "স্বতঃ সিদ্ধ" স্বীকার করিয়া লইতে হয়। তাহা এই যে "প্রকৃতির নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয়। এখন দেখুন সৃষ্টিকে সাদি বলিলে তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে—যে যিনি, সৃষ্টির অনাদি প্রাকালে ইচ্ছা বিহীন ঈশ্বর ছিলেন; অকস্মাৎ তিনি ইচ্ছাবান্ ঈশ্বর হইলেন। যখন প্রকৃতির অধীশ্বর ভগবান্ এই প্রকার পরিবৃত্তি প্রবল তখন প্রকৃতিও তাহার নিয়ম যে পরিবর্ত্তনীয় তাহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অনুমান দ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয় করিতে তাহাদের অধিকার কৈ?

এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে সৃষ্টি ৬ সহস্র বৎসর হইল হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়াছে বলিয়া অনার্য্যদিগকে তৎপূর্ব্বে "ঈশ্বর ইচ্ছা বিহীন ছিলেন" ইহা স্বীকার করিতে হইবে কেন? ইহার উত্তরে আর্য্যগণ বলেন—হা ভগবান্ তোমার বিশ্বরূপের প্রতি রোমকূপে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যথাবকাশে বিরাজমান; আমরা কীটাণুতুল্য

হইয়া, তোমার বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম, আমাদিগকে ক্ষমা কর। আমাদিগকে তোমার অনন্ত বিধাতৃভাবের পরিপন্থিগণের সুখ মুদ্রণের জন্য বলিতে হইতেছে যে;—যদি বল ষট্ সহস্র বৎসর কিম্বা তদনুরূপ কোন সময় হইতে সৃষ্টির আরম্ভ হইয়াছে, তবে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে তৎ পূর্ব্বে তিনি ভিন্ন আর কোন পদার্থ ছিল না;

এখন দেখ—ইচ্ছামাত্রই সবিষয় সুতরাং তৎকালে তাঁহার কোন ইচ্ছা থাকিলে অবশ্য তাহার কোন বিষয় ছিল; সেই বিষয় হয় তিনি স্বয়ং না হয় অন্য কোন বস্তু ইহা অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে। আবার দেখ তিনি স্বয়ং ইচ্ছার বিষয় হইতে পারেন না—কারণ তিনি নিত্যসিদ্ধ; সিদ্ধ বিষয়ে, ইচ্ছার উদয় হয় না; সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা থাকিলে, তাহার বিষয় হইবে অন্য বস্তু। তাহাতে হানি কি? হানি আছে—তিনি যাহা ইচ্ছা করেন—তাহাই উৎপত্তি লাভ করে—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং প্রাগুক্ত ও সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও বিধাতার ইচ্ছা ছিল—স্বীকার করিলে তোমরা, সৃষ্টির আরম্ভকাল বলিয়া যে সময় নির্দ্দেশ করিতেছ—তৎপূর্ব্বে ও অনেক বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে—অতএব উহা আরম্ভকাল নহে স্বীকার করিতে হইবে।

ব্যভিচার দোষ।

বিশেষতঃ—যে অনুমানের পর সৃষ্টিপ্রবাহকে "সাদি" বলা হইয়েছে উহা ব্যভিচার দোষে দূষিত;—কারণ প্রত্যেক অংশ যে ধর্ম্মাবশিষ্ট, উহার সমষ্টি ও তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত এই নিয়ম সত্য নহে। দৃষ্টান্ত

১ম। প্রত্যেকক্ষণ সাদি ও সান্ত—কিন্তু ক্ষণসমষ্টিকাল—অনাদি ও অনন্ত।

২য়। প্রত্যেক বিন্দুই পরিমিত—কিন্তু বিন্দুসমষ্টি দিকৃপরিমিত।

৩য়। প্রত্যেক সূত্র যবের শতভাগৈকভাগ তত সমষ্টিভূত বস্ত্রও যবের শতভাগৈক ভাগ নহে।

ফলতঃ পরিমিতি বিষয়ে কুত্রাপি প্রাগুক্ত নিয়ম লক্ষিত হয় না।

বর্ণাদি বিষয়েই—কি সঙ্গত হয়? তাহাই বা কোথায়? রস শ্বেতবর্ণ রক্তও শ্বেতবর্ণ উভয়ের সমষ্টিভূত বস্তুটি কৃষ্ণবর্ণ। এ প্রকার অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

জাতিবিষয়েও এই নিয়ম সত্য নহে। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য যে জাতি তদ্‌ব্যাপ্য জাতি পরমাণুর ধর্ম্ম হয় না—তদনুসারে দেখ মনুষ্যের কোনও পরমাণুই মানুষ নহে অথচ তাহাদের সমষ্টি মানুষ। ধান্যের কোন পরমাণুই ধান্য নহে অথচ তাহার সমষ্টি ধান্য।

জ্ঞানবিষয়তার সম্বন্ধেও এই নিয়ম সত্য নহে। দেখ প্রত্যেক পরমাণুই প্রত্যক্ষের অবিষয় অথচ তাহাদের সমষ্টি প্রত্যক্ষের বিষয়। প্রত্যেক কেশ কিয়দ্দূরস্থ ব্যক্তির দর্শনের অযোগ্য অথচ কেশ-কলাপ দর্শন যোগ্য হয়।

অতএব কৃপাপারাবার নির্ব্বিকার সদাশিবকে, যাহারা বিকৃত করিতে উদ্যত সেই ম্লেচ্ছগণ এবং তৎপদানুগামী সভ্যগণকে অনুমান করিবার অধিকার প্রদান করিলেও, তাহারা যে অনুমান বলে সৃষ্টিপ্রবাহের সাদিত্ব প্রমাণ করিতে পারেন না তাহা প্রদর্শিত হইল।

সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি

ইহা অনুভবের বিষয় কিনা?

বরিশালবাসী কোন বালককে জিজ্ঞাসা কর—জোয়ার আগে হইয়াছে কি ভাটা আগে হইয়াছে? সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিবে ইহার আগ পর কি? চিরকাল একবার জোয়ার হয় আবার ভাঁটা হয়। একজন অশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর—দিন পূর্ব্বে কি রাত্রি পূর্ব্বে হইয়াছে! কিংবা আমগাছ অগ্রে কি আমের বীজ অগ্রে হইয়াছে? সে উত্তর করিবে—চিরকাল দিবার পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিবা হয়; এবং বীজ হইতে গাছ হয় এবং গাছ হইতে বীজ হয়—ইহার পূর্ব্বাপর কি? এই সকল ব্যক্তিই জলের হ্রাসও বৃদ্ধি; দিবাও রাত্রি,

এবং বীজও তরুর পরম্পরা গত প্রবাহকে "অনাদি" বলিয়া অনুভব করিতেছে।

জিজ্ঞাসা না করিলেও, অনুমিত হয়—যে উহাদের নিকট প্রাগুক্ত প্রবাহ সকল অনাদি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কারণ অনাদিত্ব জ্ঞান অভাব বিষয়ক ; ইয়ত্তা জ্ঞান ভাব বিষয়ক ; অতএব যাহার ইয়ত্তা জ্ঞানের উপায় নাই ; তাহারই অনাদিত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে। প্রাগুক্ত প্রবাহ সকলের ইয়ত্তা জ্ঞান কখন উপস্থিত হয় ? যখন "এই সমস্ত ভূত ভৌতিক পদার্থ এক সময় সৃষ্ট হইয়াছে" বলিয়া নিরূপিত হয় ; কিন্তু এই জ্ঞান আগম বা অনুমান দ্বারা সাধনীয়, সুতরাং যাহারা তাদৃশ উপায়ে, সৃষ্টির জ্ঞান উপার্জন করে নাই ; তাহাদের নিকট দিবারাত্রি, বীজাঙ্কুর এবং বেলার উদ্গম ও অপগমের পরম্পরা প্রবাহ অনাদি বলিয়াই প্রতিভাত হয় সন্দেহ নাই। এইরূপ যদি পরানুচিকীর্ষু উদ্ধত সংস্কারকগণের প্রলাপ বাক্যে ও ভ্রান্তিপূর্ণ গ্রন্থের অধ্যয়নে লোকের চিত্ত কলুষিত না হইত, তবে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বতোঽনন্তরূপ, অনন্তবীর্য্য, অনন্তবাহু, বিশ্বের পরম নিধান ভগবানের সৃষ্টিক্রিয়াকে কতিপয় বর্ষ সহস্র দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে সাহসী হইত। বস্তুতঃ নহি কারণসত্বে কার্য্য বিলম্বঃ—কারণীভূত সামগ্রী সমাধান হইলে তৎক্ষণাৎ কার্য্য উৎপন্ন হয়। বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ ভগবান সনাতন, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ক্রীড়াও নিয়তই চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে সন্দেহ কি ?

দেখুন আচার্য্য উদয়ন কি বলেন—

"কারং কারমলৌকিকাদ্ভুত ময়ং মায়াবশাৎ সংহরন্
হারং হারমপীন্দ্রজাল মিবয়ঃ কুর্ব্বন্ জগৎ ক্রীড়তি।
তং দেবং নিরবগ্রহং স্ফুরদভিধ্যানানুভাবং ভবঃ
বিশ্বাসৈকভুবং শিবং প্রতিনমন্ ভূয়াসমন্তেষপি ॥"

যে বিশ্বনিধান ভগবান্, মায়াগুণে, যেন ক্রীড়াচ্ছলে, ইন্দ্রজালের ন্যায় এই লোকাতিক্রান্ত বিস্ময়ময় বিশ্বসংসারকে, পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া সংহার এবং সংহার করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন। যাঁহার শক্তির নিরোধ নাই, ইচ্ছা ও জ্ঞান অপ্রতিহত, এমন যে বিশ্বাসের একনিকেতন সদাশিব ; আমি যেন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার চরণ কমলে প্রণত হইয়া থাকিতে পারি।

পরিশেষে বক্তব্য এই—কেহ কেহ বলেন বিশ্বাসের অধিকারে তর্ক সংগ্রাম উপস্থিত করা অবিধেয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহা স্বীকার করি এবং আমাদের প্রবীণ পূর্ব্বপুরুষগণের সাধুদৃষ্টান্তানুসারে, কোন ধর্ম্মের নিন্দা বা কাহারও বিশ্বাসের ব্যাঘাত করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু আমাদের দেশীয় অনুচিকীর্ষু খৃষ্টসংস্কারকগণ এই শিষ্টাচারের যোগ্য পাত্র কি না, তাহা বড় সন্দেহের বিষয়; তাহারা সততই অন্যদীয় ধর্ম্মের নিন্দা পরকীয় বিশ্বাসের ব্যাঘাত, বালকগণকে বঞ্চনা পূর্ব্বক ধর্ম্মত্যাগ করান, এই সকল সদাশয়জনোচিত কার্য্যে ব্যাপৃত। ইহারা এমনই বিনীত যে অতি বিচক্ষণ ব্যক্তির কথায়ও উপহাস করে, এমন কি সার্ব্বভৌম কিরীট নীরাজিত চরণ-বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের নাম উল্লেখ করিয়াও "বাতুল" প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণ করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণও ঋষি ছিলেন ইহারাও ঋষি ব্যবসায় করিয়া থাকেন; সুতরাং সমকক্ষ বলিয়া করিতেও পারেন। যাহাহউক ইহাদের বিশ্বাসের প্রতিকূলে কোনও কথা বলিলে বিশেষ প্রত্যবায় আছে বোধ হয় না।

কি চমৎকার শিক্ষাই এই দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এই অল্পকাল মধ্যেই অনেক লোক, কোন কর্ম্মোপযোগী বা গৌরব কর বিদ্যা না শিক্ষা করিয়াই, শিক্ষিতাভিমানে উন্মত্ত, স্বধর্ম্মচ্যুত, সুহৃদ্ভেদে জর্জ্জরিত, পূর্ব্বপুরুষ গণের প্রতি বিরক্ত, স্বজাতী আচার ব্যবহারের প্রতি কূপিত; এবং যাহা কিছু অপবিত্র ও অকল্যাণকর তদভিমুখে ধাবিত; এবং উন্নতি হইতেছে বলিয়া আস্ফালনে প্রবৃত্ত। অমৃতবাজার অনুসারে ভূপালে মিঃ গ্রীফেন সাহের দ্বারা যাহা না হইয়াছে, বঙ্গদেশে শিক্ষাবশে তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। হে জগন্মাতঃ। তুমি তোমার এই অবোধ সন্তানগণের অন্তঃকরণে সদ্বুদ্ধি প্রদান করিয়া বঙ্গদেশের কলঙ্ক কালিমা অপনোদন কর।

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য
হৃদি সংস্থিতে!
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি!
নমোঽস্তুতে!

সাধু দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্। *
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

এইরূপ ব্যক্তিকেই সাধু বলিয়া জানিবে। এবং যথা সাধ্য ইহাঁদের সহবাসে থাকিয়া উপদেশ লাভ করিবে।

---

* এই খানে বলিয়া রাখা উচিৎ যে, আমরা যে সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি, স্বামীজী যে ঠিক এই সমস্তই বলিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি কোন শ্লোকের এক চরণ, কোনটার বা অর্দ্ধ চরণ মাত্র উল্লেখ করিতেন। আমরা পাঠকগণের বোধ গম্যের জন্য শ্লোক গুলি সম্পূর্ণাকারে প্রকাশ করিলাম।

আমি। আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি আপনার কৃপাদৃষ্টিতে পড়িয়াছি। এতদিনে আমার কাশী আগমন সার্থক হইল। এতদিন ধরিয়া আপনার উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া একটি ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছে। যদি অনুমতি করেন তবে প্রকাশ করি।

স্বামী। ভীত হইবার কোন কারণই নাই নিঃসঙ্কোচে বলুন। আমাদের নিকট ভয়ের কারণ কি আছে?

আমি। আপনার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। যদি কৃপা করিয়া দীনের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করেন তাহা হইলে ঘোর পাপার্ণবে নিমজ্জমান একটি প্রাণির উদ্ধার করা হয়।

স্বামী। বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইল যে আপনার এ প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আমি প্রকৃত পক্ষে অক্ষম। আমাদের আশ্রমের রীতি অনুসারে এরূপ দীক্ষার বিশেষ নিষেধ আছে। আর একটি কথা বলিয়া রাখি, আপনি কখন ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দিবার জন্য মানুষের নিকট উপযাচক হইবেন না। বিশেশ্বরকে আপন ভাষায় আপন ভাবে কাতর হৃদয়ে প্রাণের সমস্ত ভিক্ষা জানাইবেন, তিনি সদ্গুরুর আশ্রয় দেখাইয়া দিবেন। তিনিই সকল স্থানে থাকিয়া ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আপনারও গুরু তিনিই মিলাইয়া দিবেন, সুতরাং ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় অন্ধকার হইয়া আসিল। তখন আমি ভগ্নমনে স্বামীজীর নিকট ধীরে ধীরে বিদায় লইলাম। আমি যখন আনন্দবাগ পরিত্যাগ করিয়া দুর্গাকুণ্ডর উত্তর প্রান্তে আসিলাম, পথিমধ্যে কষায় বস্ত্রধারী একজন দণ্ডীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনিও প্রায়ই স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিতেন। তাঁহাকে পাইয়া আমি বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম। বিশেষ প্রয়োজন জানাইয়া তাঁহাকে আমার সহিত সহর মধ্যে আসিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি অতি বিনীত ও স্নেহ পরায়ণ; সুতরাং আমার অনুরোধ অবহেলা না করিয়া তৎক্ষণাৎ আমার অনুসরণ করিলেন। পরে নানা কথাবার্ত্তার পর স্বামীজীর বিষয় উত্থাপিত হইল। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্বামীজীর কঠোর সাধনার বিষয় বিবৃতি করিতে আরম্ভ করিলেন।

"আমি অল্প বয়সেই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলাম। যখন কেবল মাত্র আমার অষ্টাদশ বর্ষমাত্র বয়ঃক্রম তখন আমি ৺ কাশীধামে আসিয়া বাস করিতে থাকি। সে সময় ইনি সর্ব্বদাই গঙ্গাতীরে থাকিতেন। যেরূপ

ভাবে থাকিলে জীব [illegible]ই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভব সেইরূপই থাকিতে ভাল বাসিতেন। তাঁর [illegible]তর সময় বিবস্ত্র দেহে জলের উপরে ঠিক এক খানি কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতে বড়ই আনন্দ বোধ করিতেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় উত্তপ্ত বালুকার উপর নিজ দেহকে শায়িত করিয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন। এইরূপ অতি বিস্ময়কর ও অতীব কষ্টসাধ্য কঠোরতা করিয়া সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিতেন। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। আপন মনে কখন হাসিতেন কখন বা কাঁদিতেন। সে সময় তাঁহাকে কেহ কোনরূপ আহার করিতে দেখে নাই। যদি কেহ ভক্তি করিয়া কোন আহারীয় সামগ্রী নিকটে যাইয়া ধরিতেন; তিনি দ্রব্যগুলির প্রতি একবার নিরীক্ষণ করিয়া স্মিতমুখে সে স্থান পরিত্যাগ করিতেন। ক্রমে এত শীর্ণ হইয়া পড়েন যে উত্থানশক্তি পর্য্যন্ত রহিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় সর্ব্বদাই সমাধিস্থ থাকিতেন। বহুদিন যাবৎ এইরূপ অবস্থায় অতিবাহিত হইলে, ক্রমে যেন একটু একটু করিয়া বাহিরের কার্য্যে মননিবেশ করিতে লাগিলেন। সময়ে ২ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করেন, এবং মধ্যে মধ্যে দুর্গাবাড়ীতে মায়ের নিকট আসিয়া বসিয়া থাকিতেন। তৎপর এই আনন্দ বনে আশ্রয় লয়েন এবং সেই অবধি এই খানেই অধিকাংশ সময় বসিয়া থাকেন।"

দণ্ডীর নিকট হইতে স্বামীজীর পূর্ব্ব-কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। রাত্রিতে আসিয়া শুনিলাম পরদিনই আমাকে কোন বিশেষ প্রয়োজনে কাশীত্যাগ করিয়া বঙ্গ দেশাভিমুখে চলিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং অতি প্রত্যুষে উঠিয়া বরাবর স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইলাম। যথাবিধি প্রণামান্তর গত রাত্রির ঘটনা বলিলাম। তিনি উত্তরে একটু হাস্য করিলেন মাত্র। আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই দিবসই ভগ্ন হৃদয়ে কাশী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম!

"উপবাস।"

এই মায়াময় জগতে প্রতিদিন অসংখ্য ঘটনার সঙ্ঘটন হইয়া থাকে। সেই সকল ঘটনাবলীর মধ্যে দুইটী ঘটনা আমরা প্রতিনিয়ত দেখিয়া থাকি। তাহার একটী কার্য্য, অপরটী বিরাম। প্রাণিগণ প্রকৃতির গুণবশে নিয়মিত সময় ইতস্ততঃ শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া যথাসময়ে বিরাম সুখ লাভ করিতেছে। সতত বিরাম বা কার্য্য স্বাভাবিক নহে। কোন যন্ত্র নিয়ত বিচালিত হইলে অবিলম্বে উহা শীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, এইজন্য সময়ে সময়ে উহার বিরাম অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে উহা অনিয়মিত বিরাম প্রাপ্ত হইলেও অচিরে চির-বিরাম লাভ করিবে। অতএব নিয়মিত রূপে উভয়েরই আবশ্যক। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার বশতঃ উপদেশ ব্যতীতও স্তন্যপানার্থ মুখব্যাদান করিয়া থাকে। জন্মাবধি শেষ পর্য্যন্ত প্রতিদিনই বুভুক্ষার উদ্রেক হইয়া ভোজন ব্যাপারে বিনিয়োগ করে। ইহা প্রাণি মাত্রেরই সাধারণ ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপিত ও অনুভূত। যাঁহারা সেই সাধারণ বিধি হইতে একটু উপরে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহারা হয়ত গভীর আন্দোলন ও গবেষণা দ্বারা মীমাংসা করিয়া এই তত্ত্ব প্রচার করিবেন যে মধ্যে মধ্যে পাকস্থলীর বিরাম দেওয়া কর্ত্তব্য। মধ্যে মধ্যে ভোজনে বিরাম হইলে পাকযন্ত্র শিথিল হইবেনা, বরং নির্ম্মল হইয়া ভবিষ্যতের বিশেষ হিত সাধন করিবে; অতএব মধ্যে মধ্যে ভোজনে বিরতি ও পরিবর্ত্তন নিতান্ত কর্ত্তব্য। আর্য্যগণ সাময়িক ভোজন বিরতি প্রভৃতির শাসন করিয়াই তুষ্টিভাব অবলম্বন করেন নাই। উহা তিথি বিশেষে ভিন্নরূপে নির্ব্বাহিত হইবার জন্য বিশেষ শাসন করিয়াছেন। তিথি বিশেষে ত্রিলোকের অবস্থার ঈষৎ পরিবর্ত্তন হয় তৎসঙ্গে আমাদের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইজন্য তিথি বিশেষে ভোজ্য বস্তু জাত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আর্য্য জাতির প্রতি কার্য্যই সুদৃঢ় ধর্ম্ম বন্ধনে বদ্ধ। ত্রিকালজ্ঞ পরম পূজনীয় আর্য্য ঋষিগণ একাদশী প্রভৃতি তিথিতে কেবল ভোজন-বিরামেই প্রবৃত্তি জনক বাক্যের অনুশাসন করেন নাই, উহার সহিত উপবাসের সংযোগ করিয়াছেন। যদিও ভোজন কার্য্য

নির্ব্বাহ না হইলে সাধারণতঃ উপবাস বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে, প্রকৃত পক্ষে উপবাস, ভোজন বিরাম দিয়া আরও কতক গুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্পাদন করিলে সম্পূর্ণ রূপে উপবাস হইয়া থাকে। অবস্থাভেদে মুখ্যবিধি সঙ্কুচিত হইয়া অবস্থোচিত বিধানেরও অসদ্ভাব নাই। সংযত থাকিয়া যথাসাধ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কৃত্য গুলি সম্পাদিত হইল ইহা বলা যাইতে পারে। আমরা প্রথমতঃ উপবাস কাহাকে বলে তাহাই লিখিতেছি,—

"উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তবাসো গুণৈঃ সহ।
উপবাসঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগ বিবর্জ্জিতঃ॥" ভবিষ্যে।

পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বভোগ বর্জ্জন পুরঃসর গুণের সহিত বাসকে উপবাস বলে।

এস্থলে যে গুণের কথা আছে সেই গুণগুলি কি? তাহাই লিখিত হইল,

"দয়া সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরনসূয়া শৌচমনা-
য়াসো মঙ্গল মকার্পণ্য মস্পৃহাচ।"[১]

সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষমা, অনসূয়াঃ, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহাকে গুণ বলে।

দয়া— "পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা।
আত্মবৎ বর্ত্তিতব্যং হি দয়ৈবৈষা প্রকীর্ত্তিতা॥"

সতত, উদাসীন, বন্ধুবর্গ, মিত্র ও শত্রুতে আত্মবৎ ব্যবহারকে দয়া বলে।

ক্ষমা— "বাহ্যে চাধ্যাত্মিকে চৈব দুঃখেচোৎপাদিতে ক্বচিৎ।
ন কুপ্যন্তি ন বাহন্তি সা ক্ষমা পরিকীর্ত্তিতা॥"

কদাপি বাহ্য বা আধ্যাত্মিক দুঃখ উৎপাদিত হইলে কোপ বা হনন না করাকে ক্ষমা বলে।

অনসূয়া— "ন গুণান্ গুণিনোহন্তি স্তৌতি মন্দগুণানপি।
নান্যদোষেষু রমতে সানসূয়া প্রকীর্ত্তিতা॥"

পরের গুণের নাশ না করিয়া বরং পরের মন্দগুণেরও প্রশংসা করা এবং পরদোষে রমণ না করাকে অনসূয়া কহে।

শৌচ— "অভক্ষ্য পরিহারস্তু সংসর্গশ্চাপ্য নিন্দিতৈঃ।
স্বধর্ম্মেচ ব্যবস্থানং শৌচ মে তৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥"

অর্থাদা পরিহার, অনিন্দিত লোকের সংসর্গ ও স্বধর্ম্মে অবস্থানকে শৌচ বলে।

অনায়াস— শরীরং পীড্যতে যেন সু শুভেনাপি কর্ম্মণা।
অত্যন্তং তন্ন কুর্ব্বীত অনায়াসঃ স উচ্যতে॥"

যে কর্ম্মে শরীরের পীড়া হয় তাহা শুভকর্ম হইলেও অত্যন্ত করিবে না, ইহাকে অনায়াস বলে।

মঙ্গল— "প্রশস্তাচরণং নিত্যমপ্রশস্ত বিবর্জনম্
এতদ্ধি মঙ্গলং প্রোক্তমৃষিভি স্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

প্রশস্ত কর্ম্মের আচরণ ও অপ্রশস্ত কর্ম্মের পরিবর্জ্জনকে তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ মঙ্গল বলেন।

অকার্পণ্য— "স্তোকাদপিচ দাতব্য মদীনে নৈব চাত্মনা।
অহন্যহনি যৎ কিঞ্চিদকার্পণ্যং হি তৎ স্মৃতম্॥"

অল্প সঞ্চয় থাকিলেও প্রতিদিন অদীনভাবে যাহা কিছু দান করা যায় তাহাকে অকার্পণ্য বলে।

অস্পৃহা—যথোৎপন্নেন সন্তোষঃ কর্ত্তব্যোহপ্যল্প বস্তুনা।
পরস্যাচিন্তয়িত্বার্থং সাস্পৃহা পরিকীর্ত্তিতা॥"

যথাবিহিত রূপে উপার্জ্জিত অর্থ অল্প হইলেও তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে, তথাপি পরের অর্থে কামনা করিবে না। তাহা হইলে অস্পৃহা হইল।

এই সমস্ত ভিন্ন দেবীপুরাণে অন্যবিধ গুণের কথা ও আছে।

"তদ্ধ্যানং তজ্জপঃ স্নানং তৎকথা শ্রবণাদিকম্।
উপবাসকৃতো হেতে গুণাঃপ্রোক্তা মনীষিভিঃ॥"

ঈশ্বর ধ্যান, জপ, ও তাঁহার মহিমা শ্রবণ ও স্নানকে উপবাসকারীর গুণ বলিয়া পণ্ডিতগণ বলেন।

আমরা প্রথমে উপবাসের যে সংজ্ঞা লিখিয়াছি তাহার প্রায় প্রতিপদের অর্থ সংক্ষেপে উক্ত হইল। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য "সর্ব্বভোগ-বিবর্জ্জিতঃ" অর্থ শাস্ত্রনানুমত নৃত্য গীতাদি সুখরহিত, বলিয়াছেন। শাস্ত্র বহির্ভূত নৃত্য গীতাদি বিলাস কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

এখন বুঝা যাইতেছে ভোজন বিরত হইয়া পূর্ব্বোক্ত গুণ গুলির সহিত বাস করিলে উপবাস হয়। বিলাসিতা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। সংযত চিত্ত

হইয়া ঈশ্বরানুধ্যান জনিত অতুল আনন্দ ও শরীর রক্ষা জনিত সুখ, এই দুই সুখ উপবাসের প্রত্যক্ষ ফল এতদ্ভিন্ন আনুষঙ্গিক ফল বিস্তর রহিয়াছে। এইরূপ করিতে করিতে গুণগুলি ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া উঠে। ঐ সকল গুণে যিনি জড়িত হইয়াছেন তাহাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও পূজা করিতে কেহ বিরত হইবেন না। তবে যাঁহারা ভোজন না করিয়া থাকাকে মহাপাপ মনে করেন, বরং উহাতে শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয় এবং তাহাই ভারতের দুর্গতির মূল কারণ বলিয়া স্থির করিতেছেন, বেদকে চাষার গান বলিতেছেন, এবং তদ্রূপ উক্তিবিশারদদিগকে প্রবীণ বলিয়া দীর্ঘ সমালোচনা করিতেছেন সেই সমস্ত মূর্ত্তিমতী শিক্ষা দেবীদিগের কথা স্বতন্ত্র।

এখনও উপবাসাদি আপাত-ক্লেশ জনক কার্য্য অনেকে বলিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহারা ক্ষীণ বা দুর্ব্বল নহেন। প্রত্যুত বলিষ্ঠ ও নীরোগ।

বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে প্রায়লোক আশু সুখকর কার্য্যে বিব্রত, পরিণামে উহাতে সমূহ অনিষ্টপাত হইলেও তাহার-পরিহার করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। এই জন্যই অনেক সময় বহু ক্লেশের নিদান সঞ্চয় করিয়া অচিরে চির-রোদনের সাহচর্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। উপবাস দিনে কি কর্ত্তব্য তাহা একরূপ বলা হইল এখন নিষিদ্ধ কার্য্যাবলীর কিছু বলা যাইতেছে।

"উপবাসঃ প্রণশ্যেত দিবাস্বাপাক্ষ মৈথুনৈঃ।
অত্যয়ে চাম্বুপানেচ নোপবাসঃ প্রণশ্যতি ॥"

দিবানিদ্রা, অক্ষক্রীড়া ও মৈথুনে উপবাসের নাশ হইয়া থাকে। অত্যয় (নাশ) সম্ভব হইলে জলপানে উপবাস নাশ প্রাপ্ত হয়না।

যিনি যে কোন ব্রত অবলম্বন করুন না কেন নিম্ন লিখিত বিষয় গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

"গাত্রাভ্যঙ্গং শিরোভ্যঙ্গঃ তাম্বুলং চানু লেপনং।
এতস্থো বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বং যচ্চান্যৎ বলরাগকৃৎ ॥"

তৈল মাখাকে অভ্যঙ্গ বলে। ব্রতস্থ ব্যক্তি তৈল ব্যবহার, তাম্বুল, (গন্ধাদি দ্রব্য গাত্রে বিলেপনকে অনুলেপন বলে) অনুলেপন প্রভৃতি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। পঞ্চ পর্ব্বাদিতেও তৈল নিষেধ। যে স্থলে, তৈল নিষেধ তথায় তিল তৈল বুঝিতে হইবে। তিল তৈল সুবাসিত হইলে নিষেধ নহে।

"ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতং।
অদুষ্টং পক্কতৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গেচ নিত্যশঃ॥"
"তৈলাভাঙ্গ নিষেধেতু তিলতৈলং নিষিধ্যতে"।

বৈদ্যকশাস্ত্রেও তৈল ব্যবহার সম্বন্ধে ধর্ম্ম শাস্ত্রানুরূপই ব্যবস্থা আছে।

"অভ্যঙ্গং * কারয়েন্নিত্যং সর্ব্বেষঙ্গেষু পুষ্টিদম্।
শিরঃ শ্রবণ পাদেষু তং বিশেষণ শীলয়েৎ॥
সার্ষপং গন্ধতৈলঞ্চ যত্তৈলং পুষ্প বাসিতম্।
অন্যদ্দ্রব্যযুতং তৈলং ন দূষ্যতি কদাচন॥" ইত্যাদি

ভাব প্রকাশ।

"অঞ্জনং রোচনঞ্চাপি গন্ধান্ সুমনসস্তথা।
পুণ্যকে চোপবাসেচ নিত্যমেব বিবর্জ্জয়েৎ॥"

অঞ্জন, রোচনা (গন্ধ দ্রব্য বিশেষ) গন্ধ ও পুষ্প উপবাসদিনে উপভোগ করিবে না।

"গন্ধালঙ্কার বস্তূনি পুষ্পমাল্যানুলেপনম্।
উপবাসেন দুষ্যেত দন্তধাবন মঞ্জনম্॥"

অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, অনুলেপন, দন্ত ধাবন, অঞ্জন দ্বারা উপবাস, দোষ যুক্ত হয়।

দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার না করিয়া বিধি অনুসারে মুখপ্রক্ষালন করিবে।

"উপবাসে তথা শ্রাদ্ধে ন খাদেদ্দন্ত ধাবনম্।
দন্তানাং কাষ্ঠ সংযোগো দহত্যাসপ্তমং কুলম্॥"

উপবাস ও শ্রাদ্ধদিনে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিলে সপ্তমকুল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয়। এরূপ স্থলে মুখশুদ্ধি জন্য দ্বাদশ গণ্ডূষ জল দ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে।

"অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং প্রতিষিদ্ধদিনে তথা।
অপাং দ্বাদশ গণ্ডূষৈ র্মুখশুদ্ধি র্বিধীয়তে॥"

দন্তকাষ্ঠ না ঘটিলে ও নিষিদ্ধদিনে দ্বাদশ গণ্ডূষ জল দ্বারা মুখশুদ্ধি করিতে হইবে। আমরা প্রায় যাবতীয় শাস্ত্রীয় কথা এ স্থলে লিখিলাম, এখন আর একটী কথা লিখিলেই বোধ হয় তাহা হইলে একরূপ এতৎসম্বন্ধীয়

---

* মাথায় তৈলদিলে তাহা প্রবাহিত হইয়া গাত্রে পড়িলে অভ্যঙ্গ হয়।

শাস্ত্রীয় প্রমাণ শেষ হইল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মৈথুন দ্বারা উপবাসে দোষ ঘটে অথবা নাশ হয়। অথচ দক্ষ বলিতেছেন—

" স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ।
এতন্মৈথুন মষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ,
অনুরাগাৎ কৃতঞ্চৈব ব্রহ্মচর্য্য বিরোধকম্॥"

অতএব স্ত্রীলোকের প্রতি দৃক্‌পাত করিলেও (প্রেক্ষণ) মৈথুন জনিত দোষ স্পর্শ ঘটে। উপবাস দিনে স্ত্রী দর্শনাদি নিষিদ্ধ, তবে একরূপ ঘরে দুয়ার বন্ধ করিয়া থাকিতে হয়। আর্য্য শাস্ত্রে এরূপ মূর্খতা অসম্ভব। অনুরাগ পূর্ব্বক দর্শন, আলাপ প্রভৃতি করিলে উপবাসাদি ব্রত দূষিত হয়। সংযতচিত্তে ব্রত নির্ব্বাহ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রমর্ম্ম তাৎপর্য্য। অনুরাগ বিরহিত হইয়া পবিত্রভাবে কার্য্যবশতঃ আলাপ ও দর্শন অন্যায় নহে। বিশেষরূপে না হইলেও প্রায় শাস্ত্রীয় কথাই লিপিবদ্ধ হইল এখন আমরা কয়েকটি কথা বলিয়া উপবাসের উপসংহার করিব। অনশন এক তপস্যা। তপঃ নাম মনশনাৎ পরম্" অনশনের পর আর তপস্যা নাই। নিরন্তর অনশন করিয়া শরীর ক্ষীণ করিতে হইবে ইহাই উদ্দেশ্য নহে। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সাময়িক অনশন করিলে শরীর লঘু হয় এবং সত্বগুণের প্রকাশ হইয়া রজোমল ও তমোমল বিনষ্ট হইয়া যায়, নির্ম্মল লঘু শরীর হইলে আসনাভ্যাস হয়, পরে প্রাণ জয় কার্য্যে বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে। এমন কি উপবাসাদি ব্রত ভিন্ন শরীর নির্ম্মল ও লঘু হয় না, সুতরাং প্রণায়ামাদি যোগ সাধন মহৎ কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। পরং উহাতে স্বাস্থ্য প্রবর্দ্ধিত হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দতা ঘটে। উপবাসাদি ব্রত আপাততঃ কঠোর বোধ হইলেও অন্তিমে সুখ বোধ হয়। অধুনা অনেকেরই পরিণামের প্রতি তত দৃষ্টিপাত নাই। অভিমুখজনক কার্য্যকে সুখভ্রমে গ্রহণ করিয়া অন্তিমে অশেষ অকল্যাণ সাধিত হয়। সংযমের প্রতি লোকের দৃষ্টি নাই তবে মৌখিক বাগাড়ম্বর সময়ে সময়ে শুনা যায়। আর্য্য ধর্ম্মের সুখ ও স্বাস্থ্য প্রবর্দ্ধক ব্রত নিয়মাদি আশ্রম ধর্ম্মানুসারে প্রবর্ত্তিত না হইলে আর নিস্তার নাই। যাহারা বিধবার ব্রহ্মচর্য্যাদি পবিত্র কার্য্যাবলীকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন সেই বিলাস-ভোগ নিরত বাবুগণ বিধবার স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পারেন যে, বাবুগণ হইতে তাঁহারা কত স্বাস্থ্যসুখে সুখী। রূপ-

প্রায় দেশের এই স্বাস্থ্যটুকুও তাঁহারা দেখিতে পান না কি? আবার লোভ ও বিলাসিতার আপাত মধুর মোহন ছবির কুহকে পড়িয়া অনেকেরই পাকে প্রকারে ভোজন ব্যাপার উপযুক্ত রূপে নির্ব্বাহ হইতেছে না অথচ ধর্ম্মানুরোধে ধর্ম্ম কার্য্য সময়ে উপবাস ব্রতাদির সাময়িক আবশ্যকে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। রোগীকে কোন অহিতজনক দ্রব্য ভোজনে; নিষেধ করিলে পুনঃপুনঃ সেই দ্রব্য ভোজনেই তাহার অভিলাষ জন্মিয়া বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন করিয়া তুলে। কলিরোগগ্রস্থ বাবুগণকেও তদ্রূপ কোন সাময়িক নিষেধ করিলে তদ্বিষয়ের প্রতিকূলে তাহাদের প্রবৃত্তি সমধিক উত্তেজিত হইয়া থাকে। ইহা রোগেরধর্ম্ম তাহার সন্দেহ নাই। স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় বৃদ্ধির সহিত ধর্ম্মের সঞ্চয় জনক উপবাসাদি ব্রত একান্ত কর্ত্তব্য। তবে আশ্রম ভেদে ব্যক্তি ভেদে ও অবস্থা ভেদে ইহার ইতর বিশেষ হইয়া থাকে, আর্য্যশাস্ত্রে তদুপযোগী বিধানই রহিয়াছে। যাহারা আর্য্য শাস্ত্রের কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও ইহার মহিমা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। যাহারা উহার বিনাশ সাধন করিয়া স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচার পরায়ণ হইতে বাঞ্ছা করেন, তাহারা দেশের অনিষ্টকারী শত্রু। ম্লেচ্ছ হও, যবন হও, ব্রাহ্ম হও অনায়াসে হইতে পারিবে কিন্তু পবিত্র পূজ্য আর্য্য হইতে, স্বেচ্ছাচারকে নিবৃত্তিতে নির্ম্মূল করিয়া নিষ্কাম হইতে হইবে। ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা মনোমল অপসারিত করিয়া, প্রয়োজন হইলে, হৃদয় হইতে হৃদয় শতদল উৎপাটিত করিয়া বিভুচরণে অঞ্জলি দিতে হইবে। মন প্রাণ সমস্ত ঈশ্বরে উৎসর্গ না করিলে কখনই পরম পদ লাভ হয় না।

ধর্ম্ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আত্মার শ্রবণমননাদিই প্রকৃত ধর্ম্ম, তাহা হইতে তত্বজ্ঞান ও তত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, কিন্তু তত্বজ্ঞান হইবামাত্রেই মুক্তি হয় না, তত্বজ্ঞানের পর মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয়, তৎপরে দোষের নাশ হয়, তদনন্তর প্রবৃত্তির নাশ, তৎপরে জন্মের নাশ তদনন্তর দুঃখের নাশ এবং তাহাই মুক্তি।

"দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ মিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরা পায়ে তদনন্তরা পায়াদপবর্গঃ।" ইতি গৌতম সূত্রং, এক্ষণ মুক্তির প্রতিকারণ তত্বজ্ঞান কি?

"তত্ত্বং ব্রহ্মণি যাথার্থে" তখন যাথার্থ্য জ্ঞান অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞানের বিপর্য্যয়। কিন্তু আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ অর্থাৎ রূপ রসাদি, বুদ্ধি, মন, বাক্য চেষ্টা ও ধ্যান দশায় দর্শনানুকূল রূপ প্রবৃত্তি, রাগ দ্বেষ মোহাত্মক দোষ, প্রেত্যভাব অর্থাৎ মৃত্যুর পর জন্ম ইত্যাদিতে মিথ্যা জ্ঞান নানা প্রকার, যথা আত্মায় অনাত্ম জ্ঞান, অনাত্মাতে আত্ম জ্ঞান, দুঃখে সুখ জ্ঞান, অনিত্যে নিত্য জ্ঞান, অত্রাণে ত্রাণজ্ঞান, সভয়ে নির্ভয়জ্ঞান, নিন্দিতে অভিমত জ্ঞান, ত্যজ্যে অত্যজ্যজ্ঞান। প্রবৃত্তি হইতে কর্ম্ম হয় না, এবং কর্ম্ম হইতে ফল জন্মায় না। প্রকৃত পক্ষে দোষ নিমিত্ত, সংসার দোষের নিমিত্ত নন। প্রেত্য ভাবে অর্থাৎ মৃত্যুর পর-জন্মে জন্তু, জীব, সত্ব বা আত্মা নাই। জন্মের ও জন্ম নিবৃত্তির কারণ নাই, অতএব ইহাই প্রেত্যভাবের আদি এবং উহা (প্রেত্যভাব) অনন্ত সুতরাং প্রেত্যভাবের পর কোন বস্তুই নাই। প্রেত্যভাব নৈমিত্তিক হইয়াও কর্ম্ম নিমিত্ত নহে। শরীর ইন্দ্রিয় বুদ্ধি দুঃখ সমূহের উচ্ছেদে এবং প্রাপ্তির দ্বারা উহা নিষ্পন্ন হয় বটে, কিন্তু আত্মার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। এই সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের বিপর্য্যয়ের নাম তত্ত্ব জ্ঞান এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি। তবেইত অপবর্গ বড় ভয়ঙ্কর হইল; কারণ ইহাতে সকল প্রকার কার্য্যের উচ্ছেদ হইবে, এবং যদি সকল প্রকার কার্য্যের নিবৃত্তিই হইল, তবে অনেক প্রকার মঙ্গলদায়ক কার্য্যেরও মূলে কুঠারাঘাত হইবে। সর্ব্ব প্রকার সুখোচ্ছেদক এমন জড় পদার্থের অভিলাষী কোন্ ব্যক্তি হইবে? কারণ পুরুষ বা স্ত্রীর দ্বারা দান পরিত্রাণ ও পরিচর্য্যা প্রভৃতি সৎকর্ম্ম করিতে পারে, আবার বাক্যের দ্বারা সত্য প্রিয় ও সাধ্যায় আচরণ করিতে পারে ও মনের দ্বারা দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধা প্রভৃতি উত্তমোত্তম কার্য্যকরিতে পারা যায় কিন্তু উক্ত প্রকার জড় অপবর্গের প্রভাবেতে এই সমস্ত সদনুষ্ঠানও ভাসিয়া যায় তবে এমন বস্তুতে প্রয়োজন। ইহা বড় ভ্রম পূর্ণ,—অপবর্গ শান্তিময়। শরীরের দ্বারা যেমন দানাদি, বাক্যের দ্বারা সত্যাদি ও মনের দ্বারা দয়াদিরূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় বটে, কিন্তু আবার পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাজ্ঞানের অনুকূল রাগ ও প্রতিকূল দ্বেষ ও তাহা হইলে অসূয়া ঈর্ষ্যা মায়া লোভাদি জন্মাইবে এবং তৎযুক্ত পুরুষ নারীর দ্বারা হিংসা, স্তেয়, নিষিদ্ধ মৈথুনাদি করিবে, বাক্যের দ্বারা মিথ্যা পরুষ ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ ও মনের দ্বারা পরদ্রোহ পর দ্রব্য লোভেচ্ছা এবং নাস্তিকতা প্রভৃতি অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় ও তাহাতে নিকৃষ্ট জন্ম হয়। জন্মের অর্থ শরীর ইন্দ্রিয়

প্রভৃতির সমূহ বিশিষ্ট প্রাদুর্ভাব, সেই জন্ম হইলে দুঃখ, সেই দুঃখ প্রতিকূলে বেদনীয় হইলে পীড়া, তাপ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। এই প্রকার মিথ্যা জ্ঞান দোষ ধর্ম্মাধর্ম্ম ও জন্মের অবিচ্ছিন্ন স্থিতির নাম সংসার। তত্ত্বজ্ঞান হইলে মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইবে অর্থাৎ আত্মার আত্মজ্ঞান ও অনাত্মার অনাত্মজ্ঞান প্রভৃতি ও প্রবৃত্তিতে কর্ম্ম আছে, কর্ম্মে কর্ম্মফল আছে। এই সংসার দোষ নিমিত্ত। প্রেত্যভাবে আবাদি আছে, জন্ম ও জন্ম নিবৃত্তি সনিমিত্তক বলিয়া প্রেত্যভাবের আদি নাই কিন্তু তাহার অন্ত অপবর্গ ইত্যাদি জ্ঞান হইবে, তৎপরে দোষ অর্থাৎ রাগ দ্বেষাদি মরিবে, তৎপরে প্রবৃত্তি অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম যাইবে. তদনন্তর জন্ম অর্থাৎ শরীরাদি যাইবে, তদনন্তর দুঃখ অর্থাৎ বাধা পীড়াদি নাশ হইবে এবং ইহাই অপবর্গ। এখন সকলে বল দেখি মধুবিষ মিশ্রিত অন্ন কি কেহ ভোজন করে? ইহা যে প্রকার লোকের ত্যাজ্য হয় সেই প্রকার সুখ দুঃখ যুক্ত বস্তুও ত্যাজ্য হওয়া উচিত। যেমন উক্ত প্রকার অন্নে প্রাণনাশ করে, সেই প্রকার ইহাতে বন্ধন হয়। তুমি সৎকর্ম্ম কর গোলকে যাইয়া নানা প্রকার সুখভোগ পূর্ব্বক সোণার শিকলে বাঁধা পড়িবে, আবার অসৎ কর্ম্ম কর নরকে কীট হইয়া নারিকেলকাতায় বাঁধা পড়িবে। গোলকেই যাও আর নরকেই যাও উভয় স্থানেই বন্ধন, বন্ধন ছাড়া কথাটী নাই। কিন্তু এই বন্ধনটী দায় অপবর্গ হইলে। সকলে বল দেখি অপবর্গকে আর ভয়ানক বলিতে ইচ্ছা করে না তাহা পাইতে ইচ্ছা করে?

জ্যোতির্ব্বিদ্যা।

সকল মনুষ্যের পক্ষেই কালজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কি ঐহিক বিষয়, কি পারমার্থিক বিষয়, কালজ্ঞান ভিন্ন কোনও বিষয় সুসম্পন্ন হইতে পারে না। কালজ্ঞান জ্যোতির্ব্বিদ্যা সাপেক্ষ। সুতরাং জ্যোতির্ব্বিদ্যা যে সমধিক প্রাচীন, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। সভ্য সমাজ প্রতি মুহূর্ত্তে কালাকালের আবশ্যকতা অনুভব করেন। আর্য্য জাতি আদিম সভ্য। তাঁহাদের কালজ্ঞান বিদ্যাও আদিম একথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। আর্য্যলক্ষ ও সভ্যলক্ষ এক পর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে, অতএব উহা একার্থ বোধক। যথা,

"মহাকুল কুলীনার্য্য সভ্য সজ্জন সাধবঃ ."

(অমর কোষ)

য়ুরোপ খণ্ডের প্রসিদ্ধি অনুসারে মিসর দেশ প্রথম সভ্য হয়। য়ুরোপে এ প্রসিদ্ধি কোনও ক্রমে অসঙ্গত নহে। কারণ আর্য্যগণ বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে মিসর দেশে যাইতেন। তথায় আসিয়া য়ুরোপ ও আফ্রিকা এই দেশ ত্রয়ের লোক সকল সমবেত হইত। আর্য্যদিগের সাহায্য বশতঃ ব্রিটিশ রুসিয়া প্রভৃতি য়ুরোপবাসীরা সভ্যতা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রচারিত করিয়াছেন, আফ্রিকা ও য়ুরোপের সমস্ত প্রদেশে মিসর হইতে সভ্যতা নীত হইয়াছে। সুতরাং মিসর দেশ প্রথম সভ্য হন। এই কিংবদন্তি য়ুরোপে প্রচলিত থাকিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কালজ্ঞান জ্যোতির্ব্বিদ্যা সাপেক্ষ। বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ কালজ্ঞান ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব ভারতীয় জ্যোতি-র্ব্বিদ্যা যে কত প্রাচীন, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। প্রথমতঃ রোম রাজ্যে জ্যোতির্ব্বিদ্যার সূত্রপাত হয়। রোম রাজ্য ধ্বংসের পর আরব হইতে উহা য়ুরোপে নীত হয়। রোম ও আরব যে এ বিষয়ে ভারতের শিষ্য, তাহার প্রমাণ দুর্ল্লভ নহে। এ প্রস্তাবে আমরা তাহা প্রদর্শন করিতে চাহি না। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের ন্যায় প্রাচীন জ্যোতির্গ্রন্থ পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, আর্য্যদিগের জ্যোতির্ব্বিদ্যা ভ্রম সঙ্কুল। উহা কেবল জন্ম কালীন গ্রহগণের সংস্থান বিশেষ,— ফলতঃ শুভাশুভ ফল নির্ণয় সাধক, পৃথিবী আদর্শের ন্যায় সমান ও নাগ শূন্য অনন্ত প্রভৃতির আশ্রয়ে রহিয়াছে; ইত্যাদি কুসংস্কার জাল সমাচ্ছন্ন। উহাতে কোনও সার পদার্থ নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর্য্যদিগের বেদ হইতে আধুনিক কাব্য পর্য্যন্ত সমস্ত স্থলেই অদ্বিতীয় কুসংস্কারের আধিপত্য। যাঁহারা দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহা-দের জ্যোতির্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে ঈদৃশ সিদ্ধান্ত কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে। যাঁহারা এরূপ অভিযোগ করেন, তাঁহারা নিশ্চয় অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন মাত্র; বাস্তবিক বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্গণ যে সকল মত প্রচার করি-য়াছেন, অল্প দিন হইতে তাহা য়ুরোপে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এমত অবস্থায় য়ুরোপীয় বিদ্যা মদান্ধ হইয়া যাঁহারা জ্যোতির্ব্বিদ্যার উচ্চতম

সিংহাসনে যুরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীকে আসীন এবং আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণকে তাহার ত্রিসীমা সাধনের অধিকার হইতেও বঞ্চিত রাখিতে চাহেন, তাঁহাদের অদ্ভুত সিদ্ধান্তকে ধন্যবাদ।

পুরাণাদি শাস্ত্রে অন্যরূপ থাকিলেও প্রকৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্যোতির্ব্বিক সত্য সকল অতি উজ্জ্বল ও পরিষ্কার রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, পুরাণাদি শাস্ত্রে অন্যরূপ বর্ণনা অজ্ঞান বা ভ্রম নিবন্ধন নহে। ঐরূপ বর্ণনার তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ঐ সকল তাৎপর্য্যের সমীচীন রূপে প্রদর্শন সম্ভবে না। সুতরাং, কতিপয় জ্যোতির্ব্বিক সত্যের প্রদর্শন করাইয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

প্রায় সার্দ্ধ সপ্ত শতাব্দি পূর্ব্বে সুগৃহীত নামা ভাস্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন। তিনি স্বকৃত সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে যে সকল সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে কতিপয় দৃষ্টান্ত পাঠকগণের বিদিতার্থে উদ্ধৃত করিব। মহাত্মা ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীর গোলত্ব ও তাহার চতুর্দ্দিকে লোক বাস করে, ইহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন।

সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারাম গ্রামচৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ।
কদম্ব কুসুমগ্রন্থি কেশর প্রসরৈরিব (প্রসরৈরিব)

কদম্ব পুষ্পের চতুর্দ্দিক যেমন কেশর ব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ এই ভূপিণ্ডের সর্ব্বদিকে পর্ব্বত, আরাম, গ্রাম ও চৈত্য আছে।

যোযত্র তিষ্ঠত্যবনীং তলস্থামাত্মানমস্যা উপরি স্থিতংচ।
স মন্যতেঽতঃ কুচতুর্থসংস্থামিথশ্চ তে তির্য্যগি বামনন্তি॥

যিনি যেখানে থাকেন তিনি মনে করেন যে আমি পৃথিবীর উপরিভাগে আছি ও পৃথিবী তাহার নিম্নে রহিয়াছে। অতএব যাঁহারা পৃথিবীর চতুর্থাংশে বাস করেন তাঁহারা পরস্পরকে বক্রীভাবে অবস্থান করিতে মনে করেন।

ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীর আধারও স্বীকার করেন না।

মূর্ত্তো ধর্ত্তা চেদ্ধরিত্র্যাস্তদন্যস্তস্যাপ্যন্যোঽত্রৈবমত্রানবস্থা।
অন্তে কল্প্যা চেৎস্বশক্তিঃ কিমাদ্যে কিং নো ভূমেঃ সাষ্টমূর্ত্তেশ্চ মূর্ত্তিঃ॥
আকৃষ্টিশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ স্বস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎপততীব ভাতি সমে সমন্তাৎক্ক পতত্বিয়ং খে॥

তাঁহার মতে পৃথিবী স্বশক্তিতে শূন্যে অবস্থিত। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকেই

সমভাবে আকাশ রহিয়াছে। অতএব পৃথিবী কোথায় পতিত হইবে? তিনি পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তিও স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার মতে পৃথিবী গুরু দ্রব্যকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে। অতএব তাহার পতন প্রতীতি হয়। কিন্তু পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সমভাবে আকাশ থাকাতে পৃথিবী* কোন দিকেই পতিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

পৌরাণিক আর্য্যগণ পৃথিবী স্থিরা,—গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডলীর ভ্রমণ দ্বারা অহোরাত্র্যাদি নির্ব্বাহ হয়, এইরূপ লিখিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্যও ঐ মতই অবলম্বন করিয়াছেন। পৃথিবী বা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী এতদুভয়ের যে কোনটির গতি স্বীকার করিলেও গণনা এবং গণিতাগত বস্তুর কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে না। দয়ালু আর্য্যগণ সাহসিক অনুভব সিদ্ধ সূর্য্যাদির গতি পক্ষ অবলম্বন করিয়াই লোকদিগকে দুরূহ জ্যোতির্ব্বিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহাদের সাহজিক অনুভবের বিরুদ্ধ পক্ষ উপন্যাস করিয়া দুরভিগম্য জ্যোতির্ব্বিদ্যার দুরভিগম্যতরত্ব সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। জ্যোতির্ব্বিদ্যার সত্য আবিষ্কার করিয়া বাহাদুরী দেখান তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে, জ্যোতির্ব্বিদ্যার ফল নির্ণয় দ্বারা যথাভৎ ধর্ম্মাচরণের পথ পরিষ্কার করা পৌরাণিক আচার্য্যদিগের উদ্দেশ্য। লোকের সাহজিক অনুভবের অনুসরণ করাতে সে উদ্দেশের কিছু মাত্র অসামঞ্জস্য হয় নাই। প্রণিধান পূর্ব্বক আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে পৌরাণিক আচার্য্য দিগের যোড়শ মণ্ডলীর পরিভ্রমণোক্তি বিধি নহে। উহা লোক সিদ্ধির অনুবাদ মাত্র।

প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ্যাগ্রগণ্য আর্য্যগণ পৃথিবীর গতি পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন;—

"ভপঞ্জরঃ স্থিরোভূরেবাবৃত্ত্য বাবৃত্য উদয়াস্তময়ৌ প্রতিদিবসিকৌ সম্পাদয়তি গ্রহনক্ষত্রানাম্"।

নক্ষত্র চক্র স্থির। পৃথিবীই স্বকক্ষে আবর্ত্তন করিয়া প্রতিদিবস গ্রহণ নক্ষত্রগণের উদয় ও অস্ত সম্পাদন করিতেছে।

---

*যদি পৃথিবীকে কেহ ধারণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকেও অন্য কেহ ধারণ করিয়া আছে এইরূপে অনবস্থা দোষ হয়। অতএব যদি অনবস্থা দোষ পরিহারের নিমিত্ত শেষের স্বশক্তি কল্পনা করিতে হয় তবে পৃথিবীর সেই শক্তির স্বীকার করার দোষ কি? পৃথিবীও অষ্টমূর্ত্তি ঈশ্বরের এক মূর্ত্তি; অতএব তাহার শক্তি থাকা অসম্ভব নহে।

এই মতের উপপত্তি এবং অনুপপত্তি আলোচনা করিয়া প্রস্তাববাহুল্য করিবার আবশ্যক নাই।

"নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদাসতঃ।
উদয়াস্তময়াখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ।
যৈর্যত্রদৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ।

সর্ব্বদা বিদ্যমান সূর্য্যের অস্ত বা উদয় কিছুই নাই। রবির দর্শন ও অদর্শনের নাম উদয় ও অস্তময়। যাহারা যে সময় ভাস্কর দর্শন করে, তাহাদের পক্ষে সেই সময় উদয় কাল।

বিষ্ণুপুরাণের এই বাক্য সূর্য্যের স্থিরতাব ঈঙ্গিত আছে কিনা, বৈজ্ঞানীক পাঠকগণের উপর উহার মীমাংসার ভার রাখিয়া এখন আমরা লেখনীকে বিশ্রাম প্রদান করিলাম।

পঞ্জিকা বিভ্রাট।

আমরা যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না। যখন শুনিলাম বহুতর পণ্ডিত মণ্ডলীর একত্রে সমাবেশ হইয়া এত বড় একটা গুরুতর বিচার মিমাংসা হইবে তখন আর কোন সাহসে বিশ্বাস করিব যে এ উদ্যোগ কেবল বাহ্যাড়ম্বর ও বাক্‌চাতুর্য্যেই পর্য্যবেশিত হইবে। সুতরাং আমরা গতবারে যে আশা করিয়া লিখিয়াছিলাম, "শীঘ্রই জ্যোতির্ব্বিদ মণ্ডলীর এক মহতী সভা হইয়া এ বিষয়ে চূড়ান্ত মিমাংসা হইবে এবং আমরা আগামী বারে মিমাংসিত বিষয় পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করিব," সভার অবস্থা ও বিচার প্রনালী দেখিয়া আমাদের সে আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়াছে।

গত ২৭।শে ভাদ্র সোমবার শ্রদ্ধেয় বঙ্গবাসী সম্পাদক মহাশয়ের যত্নে ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজ গৃহে বঙ্গীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর একটী বৃহতী সভা হয়। সভায় অনেকগুলি ধনাঢ্য গণ্য মান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। নবদ্বীপ, ভট্টপল্লি প্রভৃতি স্থানের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য্য পর্য্যাবেক্ষণ করিয়াছিলেন। প্রথমে কাশীর প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের একজন উপযুক্ত শিষ্য নানাবিধ শাস্ত্রিয় যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেন যে আবহমান কাল হইতে প্রতি ৩৬০ তিনশত ষাট বৎসর অন্তর গ্রহ নক্ষত্রাদির সংস্থিতির পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে এবং সেই সেই পরিবর্ত্তন সময়ে দৃগগণিতের দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রাদির সংস্থিতির নিরূপণ করিয়া খণ্ডা সংস্কৃত হইয়াছে। শাস্ত্রও এইরূপ সংস্করণের অনুমোদন করিয়া বিধি দিয়াছেন। এখন, যখন আমরা দৃগ্‌গণিত দ্বারা দেখিতেছি যে গ্রহনক্ষত্রাদির স্থিতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে তখন কেননা শাস্ত্রাদেশ মান্য করিয়া আমাদের প্রচলিত খণ্ডার সংস্কার করিব?

তৎপর একজন উৎকলী পণ্ডিত এই মতের পোষকতা করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের দেশে এইরূপ সংস্কার করিয়া পঞ্জিকা ব্যবহৃত হইতেছে এবং সেই পঞ্জিকার সহিত বাপুদেব শাস্ত্রীর পঞ্জিকার প্রায়ই মিল আছে ইত্যাদি। ইহার উত্তরে বঙ্গীয় পণ্ডিত মণ্ডলী কোন সৎ প্রতিবাদ না করিয়া একটা গোলযোগ করিয়া উঠেন। গোলযোগ এতই বৃদ্ধি হয় যে, অবশেষে কোন মিংমাসা অসাধ্য হইয়া উঠে। অগত্যা এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে "আপাততঃ এবিষয়ে এই পর্য্যন্তই থাক, আগামী চন্দ্র গ্রহণোপলক্ষে বিশেষ বিচার করিয়া দেখা যাইবে কাহার পঞ্জিকা ঠিক হয়। সেই সময় যাহার পঞ্জিকা ঠিক হইবে তাহাকেই মানিয়া চলিতে হইবে"। অবশেষে পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় পণ্ডিত মহেশ্চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অনুরোধ উঠিয়া, বলেন, যে, যখন সন্দেহ জন্মিয়াছে তখন একটা সিদ্ধান্ত আবশ্যক; কিন্তু এ অবস্থায় সিদ্ধান্তই বা কি হইবে? যাইনা পঞ্জিকার পরস্পর অনৈক্য দেখিয়া সকলের যে একটা সন্দেহ হইয়াছে তাহা ঠিক। অতএব যাঁহার যে মতে অধিক বিশ্বাস হইবে তিনি সেইরূপই কার্য্য করিবেন।

এই ত গেল সে দিন কার ব্যাপার! এখন আমরা করি কি? কাহার মত অনুসরণ করিব? সর্ব্ব সমেত ১০ দশটী মত আমাদের হস্তগত হইয়াছে; এখন দশ মতেই ত আর সন্ধ্যা পূজা হয় না। সুতরাং কোনমত অবলম্বনীয়? বাপুদেব শাস্ত্রী জ্যোতিষ সম্বন্ধে একজন জগত প্রসিদ্ধ লোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি শাস্ত্রানুসারে দৃগ্‌গণিত দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রাদির স্থিতি নিরূপণ করিয়া যে গণনা করিয়াছেন তাহাই মানিয়া চলিব, না "নানা মনির নানা মত" যুক্ত বঙ্গীয় পঞ্জিকায় বিশ্বাস করিব? আবার দেখুন উৎকল দেশে শাস্ত্রানুসারে সংস্কৃত হইয়া যে পঞ্জিকা চলিতেছে তাহার সহিত বাপুদেব শাস্ত্রীর গণনার মিল হইতেছে। কিন্তু এদিকে বঙ্গদেশে যতগুলি পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে তাহার পরস্পরের কোনরূপ মিল নাই। দর্শনার্থ নিম্নে তালিকা দিলাম।

মহাষ্টমীর স্থিতি সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্যোতির্ব্বিদগণের গণনা ফল নিম্নে দেওয়া গেল,—

শ্রীযুক্ত বাপুদেব শাস্ত্রী সি, আই, ই, ... ৪১।৪২	সিদ্ধান্তদর্শন মতে ... ... ৪১।৩৮
শ্রীযুক্ত গুরুচরণ জ্যোতির্ব্বিদ্যাভূষণ ... ৫২।৩০	শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ বিদ্যাসাগর ভাস্বতীমতে ... ... ৫৬।৪১
গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা ... ... ৫৪।৩১	২৯শে ভাদ্র বুধবার সংস্কৃত কলেজে জ্যোতির্ব্বিদসভার সিদ্ধান্তমতে গণিতকাল ... ... ৫৪।২২
পঞ্জিকা ডাইরেক্টরী ... .. ৫৪।২৯	
মৈথিলী পঞ্জিকা ... ... ৫৪।২১	
মায়াবারী পঞ্জিকা ... ... ৫১।৪৮	
নবদ্বীপ পঞ্জিকা ... ... ৪৪।২৩	

এখন দেখুন ব্যাপারটা দাঁড়াইল কোথায়? এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমরাও শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির কথার প্রতিধ্বণি করিয়া বলি এই সব দেখিয়া শুনিয়া যাঁহার যেদিকে অধিক বিশ্বাস জন্মিবে তাঁহারা সেই রূপই পূজাদি করিবেন।

২য় ভাগ। সন ১২৯৪ সাল। ৭ম খণ্ড।

নবমী পূজা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভোলাদাস।—মা গো! ইন্দ্রিয়ভোগ্য সকল প্রকার উপহার প্রদানেরই নিয়ম, প্রণালী জানিতে পারিলাম, কিন্তু এখন আর কএকটি কথা শুনিবার নিমিত্ত মন বড় ঔৎসুক্য হইয়াছে, সেই বিষয়কটির মর্ম্ম না জানিতে পারিলে শান্তিলাভ করিতে পারি না। মাগো! বলিদান করা কোন্ প্রকৃতির লোকের কর্ত্তব্য, এবং উহা সত্ত্বাদি কোন গুণের উপহার, ইত্যাদি অনেকগুলি কথা মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে।

জগদম্বা। (ঈষৎ করুণাপ্রকাশক নেত্রে) বাবা! আমার প্রসাদে তুমি কোন কথাই বিস্মৃত হইবে না তোমার যত ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর, আমি প্রসন্না থাকিয়াই বলিব, আমার কিছুতেই ক্লেশ বোধ হয় না, আমি অপ্রতিহত-বীর্য্যা। বলিদানের বিষয়ে উত্তর শুন,—বলিদানটা রাজস উপহার; আবার প্রকার ভেদে, তামাসও হইতে পারে, কিন্তু উহা সাত্ত্বিক উপহার কোন মতেই হয় না। অতএব রাজস আর তামস পূজাতেই এবং রাজস তামস প্রকৃতির লোকেরাই বলিদান করিবে। যাঁহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতিক লোক এবং সাত্ত্বিক পূজা করেন, তাঁহারা নিরামিষ দধি দুগ্ধাদি হবিষ্য উপহার দিবেন। ইহা অন্যত্রও কথিত আছে, "সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ" এবং বিপ্রাণাং

ক্ষীরবলয়ঃ ইত্যাদি।” এবং “রাজসো বলিরাখ্যাতো মাংস শোণিত সংযুতঃ” ইত্যাদি। সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী পূজা আর তামস, রাজস, ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; ফলকথা ইদানীং আমার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য প্রভৃতি যত প্রকার পূজা হয় তন্মধ্যে প্রতি লক্ষেতে ৯৯৯৯০ জনের পূজা কিছুই নহে, সাত্ত্বিকও নহে, রাজসও নহে, তামসও নহে, উহা বালোন্মত্তাদিবৎ ক্রীড়া বিশেষ। তদ্ব্যতীত আর অবশিষ্ট দশজনের পূজার মধ্যেও, আবার ছয় জনের ঘোর তামস পূজা, তিন জনের রাজস পূজা আর এক জনের মাত্র হীনকল্পের সাত্ত্বিকী পূজা হয়, কিন্তু তাহাও কেবল ব্রাহ্মণের মধ্যে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোন জাতির সাত্ত্বিক পূজা কদাচ সম্ভবে না, কারণ ব্রাহ্মণের মধ্যেই কদাচিৎ কাহারও সাত্ত্বিক প্রকৃতি ঘটে।

ভোলাদাস।—মা! রাজস পূজায় বলিদানটা না দিলেই কি নয়?

জগদম্বা।—হাঁ, তাহাই সত্য, না দিলেই নয়। আমি অন্যত্র বলিয়াছি যে “বিনা মৎস্যৈর্বিনামাংসৈর্নার্চ্চয়েৎ পরদেবতাম্।” “মৎস্য মাংস ব্যতীত পরম দেবতার পূজা করিবে না”। বাস্তবিক বলিদান কার্য্যটা রূপান্তরিত সোম যাগ মাত্র, বলিদান ব্যতীত সোম যাগ হইতেই পারে না, ইহা স্থানান্তরে জানিতে পাইবে। অতএব বলিদান করা নিতান্ত আবশ্যক কিন্তু যাহাদের পূজা, সাত্ত্বিকী, রাজসী তামসী ইহার কিছুর মধ্যেই পড়ে না, কেবল একটা ক্রীড়া বিশেষ মাত্র, তাহারা যেন কখনই বলিদান করে না; একেত তাহারা আমাকে লইয়া ঐরূপ বিড়ম্বনা করার পাপেই কত যাতনা ভোগ করিবে, তৎপর আবার অতিরিক্ত একটা হিংসা পাপ জড়াইলে আরও ঘোরতর নিরয়ে নিপতিত হইবে।

ভোলাদাস।—মাগো! তামস ও রাজস পূজা কি কেবল তোর এই আকৃতিরই হয়, অন্য আকৃতির কি তাহা হয় না? ভগিনী পদ্মালয়া, ভগিনী বাণী এবং বিষ্ণু প্রভৃতি তোর যে সকল আকৃতি, তাঁহাদের কি সাত্ত্বিকী পূজা ব্যতীত তামস রাজস পূজা নাই?

জগদম্বা।—কেন বাবা? তোমার এ সন্দেহ হইল কেন?

ভোলাদাস।—মা! তুই বলিলি, বলিদান কেবল রাজস এবং

তামস পূজাতেই আবশ্যক হয়, উহা সাত্ত্বিক পূজার উপহার নহে! কিন্তু ভগিনী কমলা, সরস্বতী এবং বিষ্ণুদেবের পূজাতে কখনই বলিদান হইতে দেখিতে পাই না, অতএব ঐ সকল আকৃতির পূজা কেবল সাত্ত্বিকী পূজা বলিয়াই বিবেচনা হয়।

জগদম্বা।—না বাবা, তোমার ভুল হইয়াছে বিষ্ণু, লক্ষ্মী; বাণী প্রভৃতি সমস্তই যখন আমারই রূপান্তরমাত্র, তখন এরূপ বিসদৃশ নিয়ম কদাচ হইতে পারে না; আমার সকল আকৃতিরই সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ পূজা বিহিত আছে।

বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি সকল আকৃতরই সাত্ত্বিক, রাজসিক, এবং তামসিক এই তিন প্রকার উপাসনা আছে। এবং রাজসিক ও তামসিক পূজাতে যখন বলিদানের আবশ্যকতা, তখন আমার সকল আকৃতিরই রাজস এবং তামস পূজা করিলে বলিদান দিতে হইবে। বিষ্ণুরও রাজসও তামস পূজা করিলে বলিদান করা চাই, লক্ষ্মীরও চাই, সরস্বতীরও চাই, দেবদেবেরও চাই এবং অন্যান্য সকলেরও চাই। কিন্তু তম্মধ্যে কিছু কিছু ইতর বিশেষ আছে। বিষ্ণুর পূজাতে সাধারণ ছাগল বলি প্রশস্ত নহে, কিন্তু তিন বৎসরের কৃতক্লীব মেষ অথবা ছাগল তাঁহার নিকটে বলিদান করিতে হয়। আর লক্ষ্মী প্রভৃতির পূজাতে সাধারণ ছাগাদি বলি দিলেই চলিতে পারে! ইহা স্বয়ং আমি বিষ্ণুরূপেই শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে এবং সংহিতাদি গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছি,—"যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি প্রিয়মাত্মনঃ। তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্প্যতে॥" "যাহা সকলের প্রিয়বস্তু তাহা আমাকে নিবেদন করিবে, কিন্তু যাহা নিজের প্রিয়তম দ্রব্য তাহা সকলের অপ্রিয় হইলেও আমাকে নিবেদন করিবে। তাহাতে অনন্ত ফললাভ হইয়া থাকে। (ভাগবত) অতএব মাংস যাহার প্রিয় সে মাংস দ্বারাই বিষ্ণুরূপের আরাধনা করিতে পারে, ইহা এই শ্লোকের তাৎপর্য্যাগত ফল। তৎপর বিষ্ণু সংহিতায় লিখিত আছে,—"নাভক্ষ্যং দদ্যান্নৈবেদ্যার্থে * *" নিজের যাহা ভক্ষণীয় তাহাই বিষ্ণুকে নিবেদন করিবে। অতএব মাংসাদিও দিতে পারিবে। আবার বরাহ পুরাণেও, আমি বিষ্ণুরূপেই বলিয়াছি,—

"মার্গং মাংসং তথাছাগংশাশংসমনুগৃহ্যতে!
এতানিমে প্রিয়াণিস্যুঃ প্রযোজ্যানি বসুন্ধরে!॥"

"হে বসুন্ধরে! মৃগমাংস ছাগমাংস এবং শশক মাংস আমার প্রীতি

প্রিয় বস্তু, অতএব আমার পূজাতে উহা নিবেদন করিবে। এবং ত্রৈবার্ষিকঃ কৃতক্লীবঃ শ্বেতো বৃদ্ধোহজাপতিঃ। বার্দ্ধীনসঃ সবিজ্ঞেয়ো মম বিষ্ণোরতি প্রিয়ঃ। (নিরুত্তর তন্ত্র)। "শ্বেত বর্ণ, বৃদ্ধ এবং তিন বৎসর যাবৎ কৃতক্লীব, এইরূপ মেষ বা ছাগলের নাম বার্দ্ধীনস। বার্দ্ধীনস আমার নিতান্ত প্রিয় দ্রব্য" ইহাও আমার বিষ্ণুরূপেরই উক্তি। অতএব মাংসাদি ব্যতীত আমার বিষ্ণু প্রভৃতি কোন আকৃতিরই তামস ও রাজস পূজা হয় না। ঐ সকল আকৃতির রাজস ও তামস পূজা বিষয়ে মাংসাদি দেওয়ার নিষেধ কুত্রাপি নাই। অতএব তাহা দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। তবে যে কোনখানে নিষেধ দেখিতে পাও তাহা সাত্ত্বিক পূজা লক্ষ্য করিয়া, সাত্ত্বিক পূজাতে আমার কোন আকৃতির নিকটেই বলিদান করিতে পারে না।

ভোলাদাস।—মাগো! তোর আকৃতি ভেদে যদি সাত্ত্বিকাদি ভিন্ন ভিন্ন পূজা বিধি না হয়, তোর সকল আকৃতিরই যদি ত্রিবিধ পূজাই বিহিত থাকে, তবে সকল আকৃতিতে সমান উপহার দেওয়ার বিধি না করিয়া, এক-এক প্রকার পূজোপকরণ বিহিত করিলি কেন? মা, তোর এই আকৃতির পূজা করিতে হইলে জবাফুল, বিল্বদল, রক্তচন্দন, রুদ্রাক্ষ, ও ভস্মাদি নিতান্ত আবশ্যক হয়, এবং তুলসী পত্রাদি নিতান্ত নিষিদ্ধ, আবার বাবার পূজাতে শুক্ল পুষ্পই প্রশস্ত, এবং জবা পুষ্প রক্ত চন্দনাদি নিষিদ্ধ। তৎপর বিষ্ণু পূজাতে তুলসীদল ও তুলসী মালা নিতান্ত আবশ্যক, আবার বিল্বপত্র ও রুদ্রাক্ষাদি অপ্রশস্ত, ইত্যাদি প্রভেদ হইল কেন?

জগদম্বা।—বৎস! ঐ সকল উপকরণাদির প্রভেদ সাত্ত্বিক পূজাদির কোন চিহ্ন নহে। কারণ আমার যে যে আকৃতির পূজায় বিশেষ বিশেষ রূপে যে যে উপহারের আবশ্যকতা বিষয়ে বিধি আছে, সেই সেই উপকরণ আমার সেই সেই আকৃতির ত্রিবিধ পূজাতেই আবশ্যক হয়। জবা বিল্ব-পত্রাদি, আমার তামস, রাজস, সাত্ত্বিক, এই ত্রিবিধ পূজাতেই আবশ্যক। দেবদেবেরও সাত্ত্বিকাদি সকল প্রকার পূজাতেই ভস্ম, রুদ্রাক্ষাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এবং বিষ্ণুর সকল পূজাতেই তুলসী পত্রাদি প্রয়োজনীয় হয়। কিন্তু যদি উহা সাত্ত্বিকাদি পূজার চিহ্ন হইত; তবে আমার এই আকৃতিরও এক এক প্রকার পূজাতে ইহার পার্থক্য দেখিতে পাইতে। বাস্তবিক আমার ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ভাবের পরিস্ফুরণের নিমিত্তই তুলসী জবা বিল্বদলাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কতকগুলি উপহারের বিশেষ বিশেষ নিয়ম

আছে। আমার প্রত্যেক আকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ভাব আছে। আমার এই বর্ত্তমান আকৃতির এক প্রকার ভাব আছে, আবার দেবদেব আকৃতির আর একভাব, এবং বিষ্ণু আকৃতির আর এক ভাব ইত্যাদি। এই এক এক ভাবের স্ফুরণের জন্য এক এক দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ভস্ম রুদ্রাক্ষাদি আমার শৈবভাবপরিস্ফুরণের সহায়তা করে, জবা রক্ত চন্দনাদি আমার এই মাতৃভাবপরিস্ফুরণের সাহায্য করে, এবং তুলসী তিলকাদি আমার বৈষ্ণবভাবোদ্রেকের সাহায্য করে, এই নিমিত্ত এক এক আকৃতিতে এক এক দ্রব্যের দ্বারা পূজা বিধি আছে। অতএব উহা সাত্ত্বিকাদি পূজার চিহ্ন নহে।

ভোলাদাস।—মা! ইদানীং তোর বিষ্ণু আকৃতির যত উপাসক আছে, তাহারা সকলেরই কি সাত্ত্বিক উপাসনা করে?

জগদম্বা না বাবা! তাহা কিরূপে হইবে, আজ কাল দশ সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যেও জকজন মাত্র লোক সাত্ত্বিক উপাসনায় অধিকারী হয়, কি না, তাহা বিচার্য্যস্থল। কিন্তু অন্য জাতির মধ্যে সাত্ত্বিক উপাসনা এক কালেই বিরল। তাহাতে আবার, ইদানীং আমার বিষ্ণু আকৃতির উপাসকদিগের মধ্যে প্রায় সমস্তই অপর জাতীয় লোক, তাহাতে ব্রাহ্মণ জাতি অতীব অল্প। সুতরাং তাহাদের মধ্যে সাত্ত্বিক উপাসনা কোথা হইতে হইবে? সাত্ত্বিক উপাসনা যেরূপ গুরুতর বিষয় তাহাতো পূর্ব্বেই বলিয়াছি! তাহা কি এদের পক্ষে কদাচ সম্ভবপর হয়? কখনই না। ফলপক্ষে কেবল কৃষ্ণাদি আকৃতির উপাসক সঙ্খ্যার শ্রেণীভেদ করিলে উহার পাঁচ লক্ষের মধ্যে কেবল দশ জন মাত্র বাদে আর সমস্তই "কিছুই না" র মধ্যে পরিগণিত হইবে, তাহারা বাস্তবিক কোন প্রকার উপাসক নহে, কোন প্রকার ভক্তও নহে। সুতরাং তাহাদের সহিত, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস পূজাদির কিছুমাত্র সংস্রব নাই, ধর্ম্ম কর্ম্মের সঙ্গেও কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। অতএব তাহাদিগকে একেবারেই বাদ দেও; কিন্তু অবশিষ্ট দশ জনের মধ্যেও ছয় জন তামস উপাসক, তিন জন রাজস উপাসক, এবং একজন মাত্র হীনকল্পের সাত্ত্বিক উপাসক হইতে পারে, কিন্তু তাহাও ব্রাহ্মণের মধ্যেই পাইবে, অতএব বৈষ্ণব নামধারী হইলেই সাত্ত্বিক উপাসক হয় না।

ভোলাদাস।—মা তবে উহাদের মধ্যেই বলিদান করিতে দেখিতে পাই না কেন?

জগদম্বা।—যাহারা “কিছুই না” বলিয়াছি তাহারা ঈর্ষা ও স্পর্দ্ধাদি নীচ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বলিদান করেনা আর যাহারা প্রকৃতপক্ষে তামসাদি উপাসক, তাহারা অজ্ঞতাদি নিবন্ধনই করে না। আর যাঁহারা জ্ঞানবান তাঁহারাও অধিকতর পরিশ্রম চেষ্টাদি করার আলস্যে বলিদান করেন না। কারণ একটি মেষ ক্লীব করিয়া তিন বৎসর প্রতিপালন না করিলে বিষ্ণু পূজার বলি হওয়ার উপায় নাই। এই জন্যই বিষ্ণু পূজার বলিদান এত বিরল দেখিতে পাও। কিন্তু কুত্রাপি যে, না হয় তাহা নহে। আর যাঁহারা সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদেরতো বলিদান করার সম্ভাবনাই নাই।

ভোলাদাস।—মাগো! নিরামিষাদি সাত্ত্বিক আহার্য্য দ্রব্যের দ্বারা পূজা করিলেও কি তাহা সাত্ত্বিক পূজা হইবে না?

জগদম্বা।—না বাবা! তাহা কেমন করিয়া হইবে?—তুমি কি পূর্ব্ব কথা গুলি সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছ?

ভোলাদাস।—না মা, হইনাই তবে এখনও তোর সকল কথার যোজনা করিয়া হৃদয় মধ্যে গ্রথিত করিতে পারি নাই।

জগদম্বা।—তবে আমিই যোজনা করিয়া নিষ্কৃষ্টার্থ বলিতেছি, তুমি শুন,—পূর্ব্বোক্ত সত্ত্ব প্রাকৃতিক লোক পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক কামনা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক ভক্তির সহিত পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক ভাবের ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে, যদি গন্ধ পুষ্প পরিচ্ছদ ও শয্যাসনাদি সমস্তগুলি উপকরণই সাত্ত্বিক রূপে সাত্ত্বিক ভাবে এবং সাত্ত্বিক মতে, আহরণ করিয়া, আমার কোন আকৃতির পূজা করে, তাহাই সত্ত্বিকী পূজা। এবং পূর্ব্বোক্ত রাজস অধিকারী বা রাজস প্রকৃতিক লোক, রাজস ভক্তি সম্পন্ন হইয়া, রাজস কামনা ও রাজস ভাবের সহিত, রাজস অনুষ্ঠানে সমস্ত গুলি রাজস উপকরণের দ্বারা যদি আমার কোন আকৃতির পূজা করে, তাহাই রাজসী পূজা হইবে। আর পূর্ব্বোক্ত তামসিক কামনায়, তামসিক ভাব ও তামসিক ভক্তির সহিত, তামসিক অনুষ্ঠানে যদি কোন তামসা অধিকারী সমস্তগুলি তামসিক উপহারের দ্বারা আমার কোন আকৃতির পূজা করে তাহাই তামসী পূজা। সাত্ত্বিকী, রাজসী, বা তামসী, যে কোন পূজাই হউক তাহাতেই এই সমস্তগুলি উপকরণ সমভাবে থাকা আবশ্যক; তদ্ব্যতীত, তাহা কোন পূজার লক্ষণ মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না। অতএব তামস কামনা, তামস ভাব এবং তামস ভক্তি সম্পন্ন

কোন তামস প্রকৃতিক লোক যদি অন্য সমস্ত গুলি উপহারই তামস লক্ষণান্বিত করে, আর কেবল নৈবেদ্যের বেলায় নিরামিষ দেয় তাহা সাত্ত্বিকী পূজা নহে, তাহা অঙ্গহীন তামস পূজা অথবা বিড়ম্বনা, কিম্বা একটা ক্রীড়া বিশেষ মাত্র। অতএব যথা নির্দ্দিষ্ট পূজা করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইতেই জীব ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে পারে। তামস পূজাদি করিতে করিতে, যখন তামস প্রকৃতি ক্ষীণ হইয়া রজো গুণের বৃদ্ধি হইবে, তখন তামস ভাব, তামস ভক্তি, তামস কামনা, তামস অনুষ্ঠান, এবং তামস দ্রব্যের প্রতি অনুরাগাদি সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এবং রাজস কামনা রাজস ভাব, রাজস প্রকৃতি, রাজস ভক্তি, রাজস অনুষ্ঠান, এবং রাজস দ্রব্যের প্রতি অনুরাগ হইবে। তখন হইতে রাজস পূজাই করিবে। তৎপর রাজস পূজা করিতে করিতে আবার ঐ সকল রাজস বিষয় বিনষ্ট হইয়া সাত্ত্বিক কামনা, সাত্ত্বিক ভক্তি, সাত্ত্বিক প্রকৃতি, সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান এবং সাত্ত্বিক দ্রব্যের প্রতি অনুরক্তি হইবে। তখন আমার সাত্ত্বিকী পূজা করিবে। তৎপর, ঐ অবস্থাও অতীত হইয়া যাইবে, তখন জীব নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থায় উপস্থিত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। চিরকালের নিমিত্ত আমাকে পাইতে পারিবে। কিন্তু ইহার বিপরীত অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই অধঃপাত হইবে।

ভোলাদাস।—মাগো! তোর নিজের কি ভাল মন্দ বোধ কিছুমাত্রই নাই? ভাল মন্দ সমস্তই কি তোর সমান?

জগদম্বা।—(প্রসন্নাস্যে) কেন বাবা? একথা কেন জিজ্ঞাসা করিলে?

ভোলাদাস। কেন জিজ্ঞাসিলাম তাহা তুই বুঝিস নাই কি? না বুঝিলে তোর মুখখানি হাসি-হাসি হইল কেন? তথাপি তোর আমার নিকট শুনিবার ইচ্ছা! তা বলি; মা! তুই বলিলি, আপনাপন প্রকৃতি অনুসারে যে জাতীয় উপহার যাহার প্রিয়, সে সেই জাতীয় ভোগ্য দ্রব্যের দ্বারা তোর পরিচর্য্যা করিবে, তাহাই তুই সাদরে গ্রহণ করিবি। কিন্তু তোর নিজের ভাল মন্দ বোধ থাকিলে তাহা হইবে কেন? যাহার ভাল মন্দ বোধ থাকে সে আপনার প্রিয়দ্রব্যের দ্বারাই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

জগদম্বা। বৎস! "বোধ" আমারই রূপান্তর মাত্র, এবং বোধবতীও একমাত্র আমি। ইহা দেবগণও বলিয়াছেন,—"ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা। ভূতেষু সততন্তস্যৈ ব্যাপ্তি দেব্যৈনমোনমঃ॥ চিতি রূপেণ

যাহুৎমনেতৎ ব্যাপ্তস্থিতাজগৎ ! * * ” যাদেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধি রূপেণ সংস্থিতা ইত্যাদি ”। অতএব এই অনন্ত কোটীভুবনের মধ্যে, যাহার যাহা কিছু বোধ হইতেছে, সেই সমস্তবোধ স্বরূপাই আমি, এবং সেই সমস্তবোধ আমারই হইতেছে, সুতরাং আমি ভাল-মন্দ সমস্তই বুঝি। কিন্তু সে ভাল মন্দ বোধ, তোমাদের ন্যায় ভাল-মন্দ বোধ নহে, এবং সে ভাল-মন্দ বোধ সকলকে বুঝানও সম্ভবে না। ফল কথা; আমার ভাল-মন্দ বোধ থাকিলেও ভক্তের ভাল-মন্দই আমার ভাল এবং মন্দ।

ভোলাদাস।—মা গো! তুই যাহাকে বুঝাইবি তাহার কিছুতেই ভ্রান্তি থাকিতে পারে না, মা! তোর এই অদ্ভুত তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুকতা হইয়াছে, ইহা আমাকে না বলিলে, কোনমতেও ছাড়িব না।

জগদম্বা।—বৎস! তোমার অনুরোধ ক্রমে এই গুরুতর বিষয় বলিতে হইল, কিন্তু সাধারণ লোক ইহার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে না তুমিও মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করিও। প্রথমে, তুমিই একটি কথার উত্তর কর; তুমি বল দেখি, কি কারণে কোন বিষয় ভাল বা মন্দ বলিয়া অনুভূত হয়?

ভোলাদাস।—সুখবোধ এবং দুঃখবোধ হওয়াই ভাল-মন্দ অনুভবের কারণ। যে বিষয়ের দ্বারা সুখানুভব হয় তাহাকেই লোকে ভাল বলিয়া থাকে, আর যে বিষয়ের দ্বারা দুঃখানুভব হয় তাহাকে মন্দ বলিয়া থাকে।

জগদম্বা।—সুখ আর দুঃখ কাহাকে বলে তাহা অবগত আছ?

ভোলাদাস।—তাহা একরূপ জানি, কিন্তু তাহা অভ্রান্ত কি, না, তুই ই জানিস। মা! শাস্ত্রে শুনিয়াছি যে, “অনুকূল বেদনীয়ং সুখম্” এবং “বাধনা লক্ষণং দুঃখম্” ইহার অর্থ এই জানি যে, আত্মার অনুকূলভাবে যাহার অনুভব হয় সেইই সুখ, এবং প্রতিকূল বা বাধার ভাবে যাহার অনুভব হয় সেইই দুঃখ।

জগদম্বা।—তাহাই সত্য; কিন্তু তাহার মর্ম্ম জানা আবশ্যক; তাহা আমার নিকট শুন, নচেৎ প্রকৃত বিষয় বুঝিতে পারিবে না। লৌকিক এবং অলৌকিক ভেদে, সুখ, দুঃখ ও মোহ এই প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে, সত্ত্বগুণ, রজোগুণ আর তমোগুণকে স্বভাবতঃই অলৌকিক সুখ, দুঃখ এবং মোহস্বরূপ বলা গিয়া থাকে। এই জন্যই আমার প্রিয় পুত্রগণ বলিয়াছেন “প্রীত্যপ্রীতি বিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ ইত্যাদি”

(স্বাধ্য দঃ ১ অঃ ১২৭ সূ)। আত্মার দর্শন ও স্পর্শনাদি শক্তিগুলি পরি-স্ফুরিত হইয়া, রূপ, রস, গন্ধস্পর্শাদি বাহ্যবিষয়ের সাহায্যে যখন অবাধিত বা অনর্গলভাবে প্রবাহিত হইয়া যায়, তখন তাহার সেই অনর্গল বা অবাধিত অবস্থাকেই "লৌকিকসুখ" বলে। এবং আত্মার পরিস্ফুরিত শক্তিগুলি যখন ঐ সকল বাহ্য বিষয়ের প্রতিকূলতায় রীতিমতে প্রবাহিত হইতেবাধা প্রাপ্ত হয় তখন সেই শক্তি গুলির বাধিত অবস্থাকেই "লৌকিক দুঃখ" বলা গিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, লৌকিকসুখ দুঃখাদির আর কোনরূপ লক্ষণ হইতে পারে না। কেমন ইহা বুঝিতে পারিলে?

ক্রমশঃ

"পরকাল"।

বিশ্বসংসার প্রাণিপুঞ্জে পরিবৃত। ধর্ম্মাধীনে কেহ দেবতা, কেহ মানুষ, কেহ পশু, কেহ বা বৃক্ষ বল্লরী প্রভৃতিতে পরিণত। প্রত্যেকে এক একটী দেহ আশ্রয় করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে। শরীরী শরীর আশ্রয় না করিয়া ভোগ করিতে পারে না। এজন্য শরীরকে ভোগায়তন, বা ভোগা-ধিষ্ঠান বলে। আত্মা ভোগ সাধন শরীরে উপহিত হইয়া এক একটী জীব শব্দে অভিহিত হয়। যখন সেই উপাধি বিনষ্ট হইয়া যায় তখন আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। সেই শরীর ত্রিবিধ, কারণ-শরীর, লিঙ্গ-শরীর ও স্থূল-শরীর। পরমেশ্বর, সত্য জ্ঞান ও আনন্দময়, মুক্ত, নির্গুণ নিরঞ্জন। ইহা স্বরূপ। যখন তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতির সঙ্কল্প করেন, তখন তিনি মায়াময়, তিনি লোকবৎ লীলা করিবার জন্য কখন মায়াপট বিস্তৃত করিয়া অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশল প্রকাশ করিয়া রক্ষা করেন, কখন তাহার উপসংহার করিয়া স্বরূপে অবস্থান করেন। সর্ব্বশক্তিমান, নিত্য সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্মে কিছুই অসম্ভব হইতে পারে না। ঊর্ণনাভ যেমন স্বীয় শরীর হইতে তন্তু বিনির্গত করিয়া অপূর্ব্ব জাল রচনা করে। পরমেশ্বরও তেমন মায়াজাল বিস্তার করিয়া জগৎ সর্জ্জনাদি ব্যাপারে ব্যাপৃত হন। ঐ মায়া ত্রিগুণময়ী। সত্ব, রজ ও তমোময়। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি বা মায়া প্রভৃতি আখ্যায়

আখ্যাত। গুণের আধিক্যানুসারে ঐ প্রকৃতি দুইভাগে বিভক্ত, মায়াও অবিদ্যা। সত্ত্বগুণের নৈর্ম্মল্য হেতু প্রথম প্রকারের নাম মায়া, এবং মালিন্য প্রযুক্ত, দ্বিতীয় প্রকারের নাম অবিদ্যা। এই অবিদ্যাকে কারণ শরীর বলা যায়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব সমষ্টির নাম সূক্ষ্ম শরীর। সূক্ষ্ম-শরীরকেই লিঙ্গ-শরীর বলা যায়। দৃশ্যমান পঞ্চভূতের প্রত্যেক ভূত পঞ্চ ভূতের সমষ্টিতে, পঞ্চীকরণ রীতিতে সংগঠিত। পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গ-শরীর অপঞ্চীকৃত ভূতগ্রাম হইতে উৎপাদিত উহাদের মূল উপাদান অবিদ্যা, এই জন্য অবিদ্যাকে কারণ-শরীর বলা যায়। আর পঞ্চীকৃত স্থূল ভূত হইতে দৃশ্যমান স্থূল শরীর উৎপন্ন। এই শরীর ত্রয়ের মধ্যে কার্য্য সৌকর্য্যার্থে সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীরের কথা এ স্থলে সময়ে সময়ে বলা হইবে এবং ত্রিবিধ হইলেও আপাততঃ দ্বিবিধ শরীরের কথাই উপন্যস্ত হইবে।

জীব কাহাকে বলে ইহা একরূপ বুঝান চলে, আরও বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য, কঠবল্লীর একটী শ্রুতি এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। উহা রূপক আকারে বিন্যস্ত।

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহ মেবচ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াং স্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্ত ভোক্তেত্যাহু র্মনীষিণঃ॥"

জীব ও তাহার দেহ, রথী ও রথাকারে রূপিত হইয়াছে। আত্মাকে অর্থাৎ জীবকে * রথী বলিয়া জানিও। শরীর তাহার রথ। ইন্দ্রিয়গণ অশ্বস্থানীয়, বুদ্ধি সারথি, মন প্রগ্রহ (লাগাম), বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটীকে বিষয় বলে) উহার পথ স্বরূপ। অতএব দেহ ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত ভোক্তা। ভোক্তা জীব সংসারী। কেবল আত্মার ভোক্তৃত্ব নাই, বুদ্ধ্যাদি উপাধিতে উপহিত হইয়া জীব ভোক্তা, সাংসার ও বদ্ধ।

"নহি কেবল স্যাত্মানো ভোক্তৃত্বমস্তি
বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিকৃত মেব তস্য ভোক্তৃত্বম্।" শঙ্কর ভাষ্যম্।

---

* আত্মা জীবে ধৃতৌ দেহে স্বভাবে পরমাত্মনীতি; বিশ্বঃ

এখন স্পষ্টই দেখান যাইতে পারে, যে, ঈশ্বর যখন কোনও দেহে উপহিত হন তখন উহা ভোক্তা জীব বলিয়া পরিগণিত হন। কোন বিষয়ে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ ঘটিলে উহা আমরা অনুভব করিতে সমর্থ হই। পৃথিবীতে দেহিগণ ইন্দ্রিয় সাহায্য ভিন্ন কোন কিছু অনুভব করিতে পারে না, ইহা বুঝাইবার প্রয়াস পাইতে হয় না, কারণ উহা সকলেই অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। সুতরাং সুখ দুঃখাদিও তদ্রূপেই ভোক্তা ভোগ করিয়া থাকে। তুমি সন্তানের কমনীয় সুকুমার দেহ-যষ্টি সন্দর্শন করিলে, স্নেহ বশতঃ আদরে তাহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিলে, স্পর্শ করিয়া শরীর জুড়াইল। তাহার মৃদু মধুর কোমল বচনাবলীতে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইল, দেহ আঘ্রাণ করিলে, সুকোমল গণ্ডদেশে চুম্বন করিলে, এই ক্রিয়াগুলির প্রত্যেক কার্য্যেই সুখানুভব হইতে লাগিল, ইহার প্রত্যেক কার্য্য এক একটী ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ। যদি কোন ইন্দ্রিয়ের অভাব হইত, তবে অবশ্যই তদিন্দ্রিয়জ সুখানুভব হইত না। চক্ষু না থাকিলে কখনই স্নেহ পুত্তলিকা সন্তানের রূপ মাধুরী পরিগ্রহ হইত না, সুতরাং সেই সুখে বঞ্চিত থাকিতে হইত। ইহা প্রতিপাদিত হইল যে, ইন্দ্রিয়, শ্রবণ, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি অবয়বগুলি আত্মাধ্যাসে এক একটী জীব বলিয়া গণিত হয়। জীব যখন সুখ দুঃখাদি ভোগ করে, তখন জীব দেহী। অর্থাৎ আত্মা উপাধি সম্বন্ধে জীব, আর উপাধি সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে মুক্ত। যিনি ভোগ করেন তাহাকে ভোক্তা বলে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে সুস্পষ্ট রূপে উক্ত আছে দেহ ইন্দ্রিয় ও মন নিয়া ভোক্তা জীব। উহার কোন অবয়বের অভাব থাকিলে সম্পূর্ণ জীবত্ব থাকে না। অবনীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া উন্নতি কি অবনতি, সুখ বা দুঃখ, যাহা কিছু ভোগ করিবে, কোন দেহ অবলম্বন না করিয়া ভোগ করিতে পারে না ইহা যেন শ্রুতি বলিয়া দিয়াছে, যুক্তি কি তর্ক যে কোন অস্ত্র প্রয়োগ কর, ঐ সদুক্তি কোনও রূপে বিচলিত হইবার নহে। ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি প্রভৃতি না থাকিলে সে কখনও কিছু উপভোগ করিতে পারে না, ইহা সম্পূর্ণ প্রমাণিক, যৌক্তিক, নিশ্চয় স্থির সত্য ও অকাট্য কথা।

এখন দেখা আবশ্যক পরকাল কি? জীব কর্ম্ম বশে যে দেহ অবলম্বন করিল তাহা তাহার একজন্ম, কতকদিন পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া আবার অন্যদেহ অবলম্বন করিল উহা পুনর্জন্ম। উহাই পরকাল। জন্ম মৃত্যু, পরকাল নিয়ত চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, যতদিন প্রারব্ধ

নাশ না হইবে, ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মিবে, ততদিন মুক্তি হইবেনা, সুতরাং বদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে। গীতাতে ভগবান অর্জ্জুনকে উহা বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত শ্রৌত জ্ঞান পূর্ণ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

দেহিনোঽস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র নমুহ্যতি॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায়জীর্ণা।
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিহার করিয়া নূতন বস্ত্র পরিগ্রহ করে, তেমন ভোক্তা জীর্ণ ভুক্তদেহ পরিত্যাগ করিয়া আর একটি দেহ গ্রহণ করে। এখন যাহার মৃত্যু হইল তাহার পূর্ব্ব হইতেই তাহার ভাবনাময় একটী দেহের বীজ সূচিত হইল। ভোক্তা ভাবিতে ভাবিতে পূর্ব্ব দেহ পরিত্যাগ করিয়া নবীন দেহ গ্রহণ করিল। কর্ম্মবশে, তপস্যার গতিতে, সুকৃতি সঞ্চয়ের তারতম্যে অথবা দুষ্কৃতির উপচয়ে দেহের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে এবং ভোগস্থানেরও বিভিন্নতা হইয়া থাকে। ফল কথা জন্ম হইলে মৃত্যু, এবং মৃত্যু হইলেও জন্ম ইহা নিশ্চয়। যত দিন মুক্তি নাহইবে এই চক্র ভ্রমণের বিরাম নাই।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্যচ।
তস্মাদপরিহার্য্যার্থে ন ত্বং শোচিতু মর্হসি॥

ভগবদ্গীতা।

জন্ম মৃত্যু ভোক্তার অবশ্যম্ভাবী। আজ যাহার মৃত্যু হইল, স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া, সূক্ষ্ম দেহসহ অন্য স্থূল দেহের অঙ্কুরে প্রবেশ করিল, ভোক্তা ইহ জগতের কর্ম্মাকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে, এই যে দেহ গ্রহণ করিল, উহা পুনর্জন্ম, উহাই প্রেত্য ভাব। মৃত্যুর অর্থাৎ দেহ পরিত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছে তাহার কালাকাল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। ভোগ করিতে হইলে দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির প্রয়োজন, সুতরাং দেহী নাহইলে ভোক্তার ভোগ হয় না। মৃত্যু হইলেই তৎক্ষণাৎ জন্ম হইবে ইহা উক্ত গীতা বাক্যে প্রকটী কৃত হইয়াছে

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত একজন্ম ইহ কাল। আবার উহার পরবর্ত্তী জন্ম পুনর্জ্জন্ম পরকাল। ইহা নিয়ত ঘূর্ণায়মান।

এই শ্রৌত তত্ত্ব অতি পুরাকালে ঈশ্বর প্রমুখে বিনির্গত হইয়াছে, ঋষিসঙ্গ তাহাই জনসমাজে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আস্থাবান লোকগণ ভবিষ্যৎ সুখ আশায় ইহকালে কত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, কেহ প্রারব্ধ] নাশ করিয়া ভূমানন্দ পানে চিরবিভোর হইয়াছেন, কেহ সুকৃতি রাশির সঞ্চয় করিয়াক্রমে উর্দ্ধে উঠিয়াছেন। কেহবা উর্দ্ধে উঠিয়া দেবতাদি জন্ম ভোগ করিতেছেন, কেহবা তাহাও অকিঞ্চিতকর বোধে নির্ব্বাণ জন্য সমস্ত জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মসাৎ করিতেছেন।

পরকাল সম্বন্ধীয় এই প্রকৃত তত্ত্ব যাহারা মানিয়া চলেন নাই, তাহারাই নাস্তিক। পরকালে বিশ্বাস না থাকিলে পুরাকালে নাস্তিক বলিয়া জন সমাজে হতাদর হইত। যাহারা পরকাল বিশ্বাস নাকরিত তাহারা নাস্তিক ইহা সভাষ্য পাণিনি সূত্রে ও জানাযায়।

অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ। ৪। ৪। ৬০ পং।

এই সূত্রের টীকায় ভট্টোজি দীক্ষিত স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন, তদস্যেত্যেব। অস্তি পরলোকে ইত্যেবং মতির্যস্য স আস্তিকঃ নাস্তীতি মতির্যস্য স নাস্তিকঃ। দিষ্ট মিতি মতি র্যস্যস দৈষ্টিকঃ।

অত এব পর লোক-মতি-শূন্য লোক প্রকৃত পক্ষে নাস্তিক। যাহারা জগৎ স্রষ্টার সত্তা মানিতনা তাহাদিগকে বৈনাশিক বলিত। ছান্দোগ্য শ্রুতির ষষ্ঠ প্রপাঠকে " তদ্ধৈক আহুঃ " (তদ্ হ একে আহুঃ,) এই শ্রুতির ভাষ্যে ভগবান ভাষ্য কার সুস্পষ্ট রূপে লিখিয়াছেন" একে বৈনাশিকা আহুঃ সুতরাং জগৎ কর্ত্তার সত্তা নামানিলে বৈনাশিক সংজ্ঞা লাভ করিত। আস্তিক ও সাধকগণ তাহাদিগের হইতে দূরে অবস্থান করিতে ভাল বাসিতেন। অধুনা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেই নাস্তিক বলে এমন কি অধস্তন আধুনিক কোনও কোষ সংগ্রাহক স্বসঙ্কলিত অভিধানে উহার আভাস দিয়াছেন প্রকৃত পক্ষে উহা আর্য্য তাৎপর্য্যনহে। কারণ বর্ত্তমান সময়ে পরকাল সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা শুনাযায়না আস্থাও কম, সুতরাং নাস্তিক সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। আমরা পরে পরে তাহা বলিতেছি। প্রকৃত নাস্তিক কি তাহাও বলাহইল। আবার এবে ঐ পরকাল তত্ত্বের ও সর্ব্ব বিদ্যার নিদান, উহা অপৌরুষেয় সেই

বেদ না মানিলে ও নাস্তিক হইতে হয় বরং তাহারা পাষণ্ড বলিয়া অনাদৃত।

"পাষণ্ড—পাতি রক্ষতি দুরিতেভ্যঃ পাধাতোঃক্বিপ্
পাঃ বেদধর্ম্মস্তং ষণ্ডয়তি নিষ্ফলং করোতি।
পালনাচ্চ ত্রয়ীধর্ম্মঃ পাশব্দেন নিগদ্যতে।
ষণ্ডয়ন্তিতুভংযস্মাৎ পাষণ্ডাস্তেন কীর্ত্তিতাঃ॥ ইত্যুক্তে বেদাচার ত্যাগিনি। নবীন বৈদিকগণ প্রায়ই ত্রয়ীধর্ম্ম বিবর্জ্জিত অথবা ত্রয়ীধর্ম্ম ভ্রষ্ট এবং বিরোধী সুতরাং তাহারা পাষণ্ড এই কথা স্পষ্টরূপে বলাযাইতে-পারে। কালবশে পাষণ্ডগণের বচন রচনা ও আর্য্যভূমিতে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে, কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

পাষণ্ডগণ সংপ্রতি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে বিশেষ ব্যগ্র, ইহা বলা হইল। এখন নাস্তিক সংখ্যা যে বৃদ্ধি হইতেছে তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং প্রতিপাদন করিয়াছি যে পরলোক-মতি-শূন্য লোকগণ নাস্তিক। হিন্দু ভিন্ন প্রায় সম্প্রদায়ই নাস্তিক, যদি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পরকাল তত্ত্বের বিচার করা যায় তবে উহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইবে। এখন তত সময় হইবে কিনা সন্দেহ, তবে বাবু ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব; কারণ বাবুগণ বলিয়া থাকেন তাহারা সকল ধর্ম্মের সার গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। কিন্তু তাহারা নাস্তিক কিনা একবার দেখা যাউক

বাবুগণ পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করেন না এবং পুনর্জ্জন্ম মানেন না; সুতরাং বলিতে পারা যায় পরকালও মানেন না অতএব নাস্তিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর গর্ব্বিত বাবুগণ আপাততঃ এই কথায় অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু অতর্কিত রূপে অসন্তোষ দুঃখে কাতর না হইয়া একটু বিবেচনা করিলেই আমাদের কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন। পুনর্জ্জন্ম ভিন্ন পরকাল হয় না। যদি কেহ পুনর্জ্জন্ম ভিন্ন পরকাল ভোগ (মুক্ত ভিন্ন) প্রমাণ করিতে পারেন তবে একান্ত উপকার প্রাপ্তি বোধ করিব। কেবল "পরকাল" এই শব্দটীর আবৃত্তি করিলেই পরকালে বিশ্বাস আছে, সুতরাং আস্তিক এরূপ বলিতে পারা যায় না। একজন বাবু পরকাল স্বীকার করেন কিন্তু উহার স্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে প্রথমতঃ "বেন্থাম" "স্পেনসার" কতকগুলি ম্লেচ্ছনাম উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, কেন? পুন-

ধর্ম কেন? ইহা কি আর উনবিংশ সেন্সুরীতে খাটে? পরকালে আত্মার অনন্ত উন্নতি হইবে। আত্মা কি "সোল" (soul)? ইহার পর বাবুর বিশ্বাস যে তাঁহার অধীতবিষয়েরও পরম উন্নতি হইবে, যাহা তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন তাহাও স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া পরলোকে বাবুকে পরম বাবু করিবে। ভালই, বাবু যেন পরম হইলেন। পরলোকে বসিয়া বাবু যে ঐ সময়ে উন্নতি-সুখভোগ করিবেন, তখন কি বাবু কোনরূপ দেহ অবলম্বন করিয়া এক প্রকার জীবরূপে ভোগ করিবেন? না অন্যোপায়ে? যদি কোন জীবদেহে তাহার ভোগ হয়. তবে অবশ্য পুনর্জন্ম হইল; কারণ পূর্ব্বোক্ত দেহ পরিত্যাগ করিয়া নবীন দেহ অবলম্বন করিতে হইতেছে। আর যদি তাহা স্বীকার না করিতে ইচ্ছা করেন তবে বড় বিষম সমস্যা। কারণ, কেবল আত্মা, পরমাত্মা বলিয়া কথিত হয়, তাঁহার বিষয় সুখ ভোক্তৃত্ব বা উন্নতি অবনতি নাই। যদি জীব ভোক্তা, তবে তাহার দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণ চাই, নচেৎ ভোক্তৃত্ব সাধন হয় না। বাবু যাহাকে "সোল" বলেন তাহার দেহেন্দ্রিয়াদি আছে কিনা বাবু তাহা বিশেষ বলিতে পারেন না। অথচ "অনন্ত উন্নতি" বলিয়া ধ্বনি করেন। যদি দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি রহিত আত্মা হয় তবে তাহার ভোগ সাধন অভাবে জড়পদার্থ বিশেষ হইয়া থাকিতে হয় তাহার সুখ দুঃখ ভোগ কি? আর অনন্ত উন্নতিই বা কি? সে কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ। আবার প্রথম জন্মে যে সমস্ত সুকৃতি করিয়াছিল পরকালে তাহার ভোগ হইবে, আর দুষ্কৃতি ভোগ হইবে না, এরূপ হইলে "পরকাল" একথাটীও স্বীকার না করিলে ভাল হয়। কারণ, দোষের দণ্ড হইবে না, কেবল সুখের ভোগ হইবে, ইহা কোন্ দেশীয় যুক্তি? শত দোষে দোষী ব্যক্তিও মরিলেই নিষ্কৃতি, ইহা লোকায়ত চার্ব্বাক মত। আস্তিকের নহে। বিশেষতঃ উহার কোন যুক্তিও নাই। অপরঞ্চ বাবুগণের মতে যোগ তপস্যা অকিঞ্চিৎকর সুতরাং তপস্যায় অলৌকিক ক্ষমতা জন্মে ইহাও অযৌক্তিক। সুতরাং বাবুগণ কেবল যুক্তির ভরসায় পরকাল এই কথাটী স্বীকার করিতে চাহেন, কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত, কেবল যুক্তিতে প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ হয় না। তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছ, উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া পদমদ ভরে ধরাখানা শরারমত দেখ, যুক্তি বাগীস হইয়া, একটী তত্ত্ব যুক্তিতে স্থির কর কিন্তু তোমা অপেক্ষা বুদ্ধিমান তাহার খণ্ডন করিয়া নব্য যুক্তির উপন্যাস করিবে, সুতরাং কেবল যৌক্তিকের প্রতিষ্ঠা নাই, পরং

কেবল যুক্তি বল নিরূপিত নবীন পরকাল, প্রকৃত পরকাল নহে। পরকাল ভোগ স্বীকার করিতে হইলেই একটি পুনর্জন্ম স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই।

এখন দেখা যাইতেছে নূতন পরকালে যাহারা বিশ্বাস করেন, উহা আকাশ কুসুমবৎ। সুতরাং তাহাতে যাহারা আস্থা স্থাপন করিতেছেন, তাহারা নাস্তিকতার বৃদ্ধি করিতেছেন। বাবুধর্ম্মে নাস্তিকতার বৃদ্ধি, ইহা আর বলিতে হইবে না। পরকাল তত্ত্ব প্রথমে যাহা লিখিত হইয়াছে, যদিও তাহা স্থূল ভাবে লিখিত হইয়াছে তথাপি বোধ হয় এস্থলে এই মাত্রই পর্য্যাপ্ত হইবে। সময়ান্তরে এতৎ সম্বন্ধে ভোগ ও গতির বিষয় বলিব।*

---

* শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধটী অতি সংক্ষেপে সমাপ্ত করায় ইহার সৌন্দর্য্যের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। পরকাল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সংক্ষেপে শেষ করা সম্ভব নহে, বিধেয়ও নহে। বিশেষতঃ আজ কাল যে সময় পড়িয়াছে তাহাতে লোকে সহজে পরকাল মানিতে চাহে না। সুতরাং, এসম্বন্ধে একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিষয়টী যেরূপ ভাবে আলোচিত হইয়াছে ইহাতে সকলের বোধগম্য হইবে না, সন্তোষও জন্মিবে না। অতএব আমাদের অনুরোধ শাস্ত্রী মহাসয় যখন বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন যাহাতে সুবিচার হয় তজ্জন্য বিধিমত যত্ন সহকারে চেষ্টা করেন। তিনি যেরূপ শাস্ত্রদর্শী ও তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন তাহাতে আমাদের বিশ্বাস তাঁহার লেখনী প্রসূত প্রবন্ধে গতির গবেষনার পরিচয় পাইব। বেঃ সং—

পূজনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস।

ভক্তকুল চূড়ামণি মহাত্মা নারদ ভক্তিব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রথমেই বলিয়াছেন ভক্তি কিরূপ? "সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা অমৃতস্বরূপা চ। যল্লব্ধ পুমান্ সিদ্ধোভবত্যমৃতী ভবতি তৃপ্তো ভবতি। যৎ প্রাপ্যন কিং চিদ্বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি। যদ্‌জ্ঞানাম্মত্তোভবতি

স্তব্ধো ভবত্যাত্মারামো ভবতি। অর্থ,—ভগবানে পরম প্রেম স্বরূপা ও অমৃত স্বরূপা যে ভক্তি লাভ করিলে মনুষ্য সিদ্ধ হয়, অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় এবং পরম তৃপ্ত হইয়া যায়। যাহা পাইলে মনুষ্যের চিত্তের আকাঙ্ক্ষা শোক, দ্বেষ যাবতীয় বস্তুতে রতি ও উৎসাহ বিহীন হইয়া যায়। যে জ্ঞান লাভ করিলে মনুষ্য উন্মত্ত হয়, স্তব্ধ হইয়া যায় এবং আত্মারাম হয়।

এইরূপে ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে করিতে স্বয়ং ভক্তাদর্শ নারদ বলিলেন "অনির্ব্বচনীয়ং প্রেম স্বরূপং ; মূকাস্বাদনবৎ প্রকাশতে ক্বাপি পাত্রে"।

যখন দেবর্ষি নারদই এই কথা বলিলেন তখন আমাদের ন্যায় মূঢ় ব্যক্তির ভক্তি কথা লইয়া আলোচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু সাধু মুখে শুনিয়াছি, যে, সকল কথাই শাস্ত্র সম্মত বলিতে পার আর নাইপার, সাধু প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই সাধ্যমত সদভিপ্রায়ে তাহা লইয়া আলোচনা করিবে। তাহাতেও আত্মার কল্যাণ সংসাধিত হইবে।

অনাদি কাল হইতেই সাধু ভক্তগণ জগতের কল্যাণ কামনায় ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই মহাতত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সকল সাধুভক্তগণ উন্মত্ত ও স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছেন "অনির্ব্বচনীয়ম্। কুমার (সনকাদি) বেদব্যাস, শুকদেব, নারদ, শাণ্ডিল্য, গর্গাচার্য্য, বিষ্ণু, কৌণ্ডিল্য, শেষ, উদ্ধব, আরুণি, বলি, হনুমান, বিভীষণাদি ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা আচার্য্যগণ কত ভাবে কত প্রকারে ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিলেন কিন্তু ভক্তি সুধা পানে জগৎ মাতিল কৈ? বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। নূতন কথা নাই, নূতন ভাব নাই কেবল আচার্য্যদিগের উক্তির চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র। অরে পাগল? ভক্ত কি ব্যাখ্যার জিনিস, না মুখে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান যায়। যদি ভক্তিরত্ন লাভ করিতে চাও তবে সূত্র ব্যাখ্যা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, ভক্তের নিত্য সহচর হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হও ভক্তের অমৃতময়ী লীলা শ্রবণ কর, ভক্তের দাসানুদাস হইয়া তাঁহাদেরই কার্য্যে আত্ম সমর্পণ কর। যখন স্বয়ং নারদ ঋষিই ভক্তি ব্যাখ্যায় অক্ষম, তখন তুমি আমি তাহা লইয়া নাড়াচাড়া করি কোন সাহসে? দেবর্ষি নারদ ভক্তি সূত্র লিখিয়া জগতের অধিক ভক্তি ভাজন হইয়াছেন, না সুর-লয়-তাল সংযুক্ত বীণার মৃদু মধুর ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে হরিগুণ গান করিয়া আপন ভাবে আপনি বিভোর হইয়া যে দ্বারে দ্বারে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেন, তাহার দ্বারা জগতের

অধিক ভক্তি ভাজন হইয়াছেন? আমরা বলি নারদ কৃত লক্ষ লক্ষ ভক্তি সূত্রে যাহা না করিয়াছে, নারদের সেই সনৃত্যে বীণার ঝঙ্কার সহ একবার হরিনামোচ্চারণে তাহার সহস্রাধিক মঙ্গল সংসাধিত হইয়াছে। সে বীণার ঝঙ্কার সে সনৃত্য হরি নামোচ্চারণ অদ্যাবধি ভক্তের সুবিমল কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যাঁহারা ভগবানের প্রকৃত ভক্ত তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর, আমাদের উক্তির সত্যতা বুঝিতে পারিবে।

ভগবান শাণ্ডিল্য ভক্তির লক্ষণ করিতে গিয়া বলিলেন;—

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।

আমি মূঢ়, আমার হৃদয় তমসাচ্ছন্ন; আমি পরানুরক্তি বলিলে কিছুই বুঝিলাম না। আমি যেমন "ভক্তি" বুঝি না সেইরূপ "পরানুরক্তি-রীশ্বরে" ও বুঝি না। সুতরাং আমার ন্যায় অজ্ঞানীর পক্ষে ভক্তি সূত্র কোন কার্য্যেই আসিল না। কিন্তু যখন শুনিলাম ভক্তকুলরবি হরিদাস কাজি কর্ত্তৃক নিষ্ঠুররূপে প্রহারিত হইয়াও ক্ষত বিক্ষত অঙ্গে অটল অথচ নির্ভীক হৃদয়ে হরিপাদপঙ্কে আত্ম সমর্পণ করিয়া তাঁহাতে চিত্ত সমাধান করিয়াছেন। কাজির প্রহরীগণ ভীষণরূপে প্রহার করিতে করিতে সমস্ত গ্রাম বেষ্টন করাইয়া লইয়া ফিরিতেছে। আপাদ মস্তক রুধিরে প্লাবিত হইয়া পড়িয়াছে। রক্তাক্ত কলেবরে হরিদাস কোন আপত্তিই না করিয়া প্রহরীদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন আর মুখে হরিনাম উচ্চারণ করিতেছেন। সে ধ্বনি, গ্রাম, প্রান্তর কাঁপাইয়া গ্রামবাসীর কর্ণে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য। এই অলৌকিক ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া দর্শক বৃন্দের বক্ষঃ ভাসাইয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, আর সহ্য করিতে না পারিয়া সকলে হৃদয় খুলিয়া ডাকিতেছে "কোথায় ভক্তের প্রভু তোমার প্রিয় পুত্র হরিদাসকে আজ রক্ষা কর। এইরূপে ঘোর পরীক্ষায় হরিদাস উত্তীর্ণ হইলেন। হরিদাসের জয় হইল। ভক্তের সখা ভক্তের সমস্ত কষ্ট নিজে বুক পাতিয়া সহ্য করিলেন। তখন আমার ন্যায় মূঢ়ের জ্ঞান জন্মিল। আমি ভক্ত হরিদাসের এইঅদ্ভুত চরিত্রে যাহা বুঝিলাম, সহস্র সূত্র পড়িয়াও তাহা বুঝিতে পারি না। অহো! পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুব! সরল নিষ্পাপ হৃদয়, সংসারের কুটিলতা তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই, ধ্রুব মাতা সুনীতির বাক্যে ধ্রুব বিশ্বাস করিয়া

ছুটিল,—অরণ্য প্রান্তর, পর্ব্বত গহ্বর, নদ নদী, কিছুরই প্রতি লক্ষ্য নাই,—ধ্রুবের ধ্রুব বিশ্বাস পদ্মপলাশলোচন হরিকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবেন। আহা! বিশ্বাসী ভক্তের কি মহিমা! অরণ্যের হিংস্র জন্তুও আজ নিজ হিংসাবৃত্তি বিস্মৃত হইয়া বাৎসল্য ভাবে দৌড়িয়া গিয়া ভগবদ্ভক্তের পদলেহন করিতেছে। ধ্রুবের কণ্ঠধ্বনি যতদূর পর্য্যন্ত গমন করিতেছে ততদূরস্থ কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী সমস্তই সেই ভক্তের কণ্ঠ নিঃসৃত হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে। এইরূপে একমাত্র বিশ্বাসের বলে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নির্ভীক শিশু জয়লাভ করিল। পদ্মপলাশলোচন দর্শন করিয়া অমরত্ব লাভ করিল। তখন ব্রহ্মাণ্ড বিকম্পিত করিয়া শব্দিত হইল "জয় বিশ্বাসীর জয়"। আবার ঐ দেখুন দৈত্য কুলে প্রহ্লাদ! পিতার নিষ্ঠুর তাড়নায় ভ্রূক্ষেপ করিয়া হরির জন্য সকল যন্ত্রনা অক্লেশে সহ্য করিতেছে। কখন বা উচ্চ পর্ব্বত হইতে নিক্ষিপ্ত হইতেছেন, কখন জলন্ত বহ্নি মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, কখন অতলস্পর্শী অসীম সমুদ্রে ভাসিতেছেন। কিছুতেই ভক্তের চিত্ত বিচলিত নহে। প্রহ্লাদ অচল অটল হৃদয়ে হরির শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান নিমগ্ন। নির্ম্মম পিতা সন্তান বধের জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিল, কিন্তু কিছুতেই হরিভক্তের অনিষ্ট করিতে পারিলনা। প্রহ্লাদ বীরের ন্যায় সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়া জয়লাভ করিলেন। বিপদের কাণ্ডারী হরি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের মনবাঞ্ছা পূর্ণকরিলেন। হরিদাস, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, সকলেই শাস্ত্র সম্বন্ধে "নিরক্ষর" বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অথচ শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ শাস্ত্র চর্চ্চায়ও যাহা লাভ করিতে পারিল না ভক্ত একবারমাত্র সকরুণ আহ্বানে তাহা প্রাপ্ত হইলেন। তাই বলি, ভগবান্ ভক্তের নিকট বিদ্যা জ্ঞান চান না, তিনি বলেন, "(ভক্ত) ভক্তিভরে ডাক্‌লে পরে, আমি তারই হ'য়ে র'ই ; আবাহমানকাল হইতেই সকল স্থানেই ভক্তেরই জয় হইয়া আসিতেছে, এবং সাংসারিক জীব সেই ভক্ত চরিত্রের অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। এমনকি ভক্তেরই জন্য স্বয়ং ভগবানকে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইতে হয়।

যখনই পৃথিবী পাপ ভারে অবসন্ন হন, তখনই ভগবানের আবির্ভাব না হইলে এই অনন্ত সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যায়। সুতরাং, সময়ে সময়ে ভগবান্ হরি স্বয়ং অবতীর্ণ না হইলে সৃষ্টি রক্ষার অন্য উপায় নাই। কিন্তু তাঁহাকে

অবতীর্ণ করায় কে ? পাপীত তাঁহাকে চায় না, সুতরাং পায়ও না। তিনি বলিয়াছেন।.

যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।

সুতরাং যে যাহাচাহে কল্পতরু হরি তৎক্ষণাৎ তাহাই তাহাকে দিয়া থাকেন। আমি পাপী আমার পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ জন্য সর্ব্বদা আমি তাঁহার নিকট লালায়িত, তাহাই আমি দিন দিন পাপের ঘোর নরকে নিপতিত হইতেছি। তামস শক্তিতে আমার অন্তর বাহির অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তামসিক শক্তির গুণ সংহারকরণ; তামসের ক্রিয়া বৃদ্ধি হইলে ধ্বংসের কার্য্যও সন্নিকট হইবে। অতএব, একমাত্র সত্বের আশ্রয় ভিন্ন সৃষ্টি রক্ষার উপায় নাই। কারণ, সত্বের বলেই এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড রক্ষিত ও পালিত হইতেছে। হরিই পূর্ণ মাত্রায় সত্বের আধার। সুতরাং, পৃথিবী যখন পাপীর ক্রিড়া ভূমি হয় তখন স্বয়ং ভগবান্ হরি ভিন্ন আর রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই। কিন্তু হরি যে ভক্তের অধীন। সমপ্রকৃতিক শক্তি ভিন্নত পরস্পরে আকর্ষিত হয় না। ভক্ত যেখানে নাই হরি সেখানে থাকিয়াও থাকেন না। তাহাই যখনই পৃথিবীর পাপভারহরণ করিবার জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, তৎপুর্ব্বে ভগবস্তক্তগণ আসিয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ভক্তবৎ-সল হরি সেই সাত্বিক ভক্তগণের আকর্ষণ বলে তাঁহাদের রক্ষার্থ মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া অবতীর্ণ হন। প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সুতরাং যতই জগতে সাধু ভক্তের অভাব পরিলক্ষিত হইবে ততই বুঝিতে হইবে পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষের শোচনীয় অবস্থা সমুপস্থিত। এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া চিত্ত বড়ই অবশ হইয়া পরে, হৃদয়ে শান্তি থাকে না। কিন্তু এই নিরাশার ঘোর অন্ধকারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় যখন ভাবিতে থাকি তখন সুদূরে আশার দুই একটি ক্ষীণালোক দেখিতে পাই। দেখিতে-পাই ভারত জননী এখনও প্রাতঃস্মরণীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস, বামাচরণ, রমানন্দ, ত্রৈলঙ্গ, ভাস্করানন্দ প্রভৃতির ন্যায় কৃতিপুত্র প্রসব করিতেছেন। অহো! আজ আমরা যে মহাত্মার জীবন চরিত লিখিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, এইরূপ ভক্তের সংখ্যা যদি ভারতে দিন দিন বৃদ্ধি পাইত তাহা হইলে কি এই সোণার ভারতের এ দুর্দ্দশা থাকিত! কখনই না।

রামকৃষ্ণকে লোকে চিনিয়াও চিনিল না, হাতে পাইয়াও হেলায় হারা-

হইল। রামকৃষ্ণ সূত্র অভ্যাস করেননাই, তন্ন তন্ন করিয়া ভক্তিতত্ত্বেরও বিচার করেন নাই। ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি একেবারে "নিরক্ষর" ছিলেন। অথচ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পর সেরূপ ভগবদ্ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। রামকৃষ্ণ যেরূপ অহেতুকী ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে তাঁহাকে কোনরূপেই মানুষ বলিতে সাহস হয় না। এই মহানুভব ভক্তির অবতার রামকৃষ্ণকে যিনি একবার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনি যেকোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন রামকৃষ্ণের অমানুষী ব্যবহারে স্তম্ভিত হইয়াছেন। আমরা যথাজ্ঞান সংক্ষেপে পরমহংসের জীবনী আলোচনা করিব।

পরমহংসের বাল্যাবস্থা।

হুগলী জেলার অধীনে শ্রীপুর কামারপুকুর নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রামে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নামক একজন সরল প্রকৃতির ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। শুনা যায় ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অতিশয় অমায়িক, দয়ালু ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্বধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল এবং অনুরাগের সহিত ক্রিয়া অনুষ্ঠানও করিতেন। সাধু পিতা না হইলে সৎপুত্র জন্মাইতে পারে না। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের প্রকৃতি দিন দিন এত উন্নত হইতে থাকে, যে, শেষ অবস্থায় তিনি প্রকৃত তপস্বী হইয়া উঠেন এবং ভগবানের কৃপায় নিজ পরিশ্রমের ফলও প্রাপ্ত হন। আত্মীয় স্বজন ও গ্রামবাসী সকল লোকেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত সম্মান করিত। শুনা যায় ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় যে পুষ্করিণীতে স্নান করিতেন গ্রামবাসী কেহই তাহাতে স্নান করিতে সাহস করিত না। এমনই তাঁহার তপস্তেজের প্রভাব ছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রীও স্বামীর অনুরূপই ছিলেন। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি পুত্র জন্মে। মধ্যমের নাম শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং কনিষ্ঠের নাম রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ১৭৫৬ শকের ১০ই ফাল্গুন শুক্ল পক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীপুর কামারপুকুর গ্রামে কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। শুনা যায় রামকৃষ্ণের জন্ম কালীন অনেক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হয়। আমরা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সে

সমস্ত ঘটনার উল্লেখ অনাবশ্যক মনে করিয়া এস্থলে সে সমস্ত সন্নিবেশিত করিতে বিরত হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রামবাসী সকলেই ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়কে পরম ভক্তি করিত, সুতরাং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক অতি সুন্দর পুত্র সন্তান হইয়াছে শুনিয়া দলে দলে প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকেরা আসিয়া সূতিকাগৃহ বেষ্টন করিয়া মহানন্দে হুলুধ্বনি দিতে লাগিল। বহির্বাটিতে প্রতিবাসী ভদ্রাভদ্র সকল লোকই একত্রিত হইয়া নব প্রসূত সন্তানের লগ্ন গণনায় ব্যস্ত হইয়া নানারূপ বিচার করিতে লাগিলেন। সন্তান অতি সুলগ্নে জন্মিয়াছে দেখিয়া পরম ধার্ম্মিক পিতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং গণনায় যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার আনন্দ শতাধিক বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু সাহস করিয়া কাহাকেও নিজ গণনার ফল বলিলেন না। নবজাত শিশু শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পিতা মাতার আনন্দের সীমা নাই। মাতা আদর করিয়া সন্তানের নাম রাখিলেন "গদাই"। গদাইয়ের সর্ব্বদা হাস্য বদন। কদাচিৎ কেহ কখন গদাইকে কাঁদিতে দেখিয়াছিল কি না সন্দেহ। ক্রমে অন্নপ্রাশনাদি শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইল ; তখন মাতার আদরের গদাইয়ের নাম করণ হইল রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। রামকৃষ্ণের যতই বয়ঃবৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই তাঁহার প্রকৃতির নির্ম্মলতা ও সাধু জনোচিত ব্যবহারে সকলে বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি মায়ের অত্যন্ত আদরের সন্তান, কেহ তাঁহাকে কখন তাড়না করিতে সাহস করিত না, লেখা পড়ার জন্যও বড় বেশী জোর করা হইত না। তিনি আপন মনে আপন ভাবে সর্ব্বদা খেলিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার বাল্যক্রীড়া অতি সুন্দর ছিল। তাঁহার সমবয়স্ক বালক বালিকাদের লইয়া অতি নির্জ্জন প্রান্তরে যাইয়া নিজে কৃষ্ণ সাজিতেন এবং বয়স্যের মধ্যে কাহাকে শ্রীদাম কাহাকে সুবল কোন কোন বালিকাকে গোপীকা প্রভৃতি সাজাইয়া বড়ই সরল উচ্ছ্বাসের সহিত বাল্যলীলা করিতেন। এতই সুন্দররূপে কৃষ্ণলীলা করিতেন, যে, অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার লীলাভিজ্ঞতা দেখিয়া অবাক হইতেন। বৃন্দাবনের গোকুলবিহারী এমনিই সুন্দররূপে অভিনয় করিতেন যে বয়ঃবৃদ্ধ জ্ঞানীরও তাহা অসাধ্য বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার বাল্য লীলার ভঙ্গি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইত যে তিনি পূর্ব্ব জন্মে একজন অতি উচ্চ অঙ্গের সাধক ছিলেন। এবং সেই সমস্ত

সাধনার সংস্কার রাশি যেন বাল্য জীবনেই উজ্জ্বল রূপে পরিস্ফুরিত হইতেছে।

মানুষ সংস্কারের দাস। কারণ, কেবল মাত্র অসংখ্য সংস্কার রাশির উপরেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব অবস্থিত।

নসদুৎ পাদোনৃশৃঙ্গবৎ, নাপঃ কাকা লয়ঃ ॥

সাঙ্খ্য দর্শন।

যাহা নাই তাহা কদাচ উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং যাহা আছে তাহাও একবারে শূন্য ভাবে বিনষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং, আমরা যাহা কিছু করি তাহার কোনটীই একবারে নূতন নহে। আমাতে যে অসংখ্য সংস্কার রাশি সঞ্চিত রহিয়াছে উহারা যখন কোন উদ্দীপক কারণের সাহায্য পায় তখনই পুনঃ পুনঃ স্ফুরিত হইয়া উঠে মাত্র। আমরা এখন যাহা কিছু করি তাহা, পূর্ব্বে যাহা কিছু করিয়া আসিয়াছিলাম তাহারই স্ফূর্ত্তি বিশেষ মাত্র। আবার এখন যাহা করিতেছি পরকালে সেই সমস্তেরই স্ফূর্ত্তি পাইবে মাত্র। কেহ নূতন কিছু আনিও নাই এবং নূতন কিছু লইয়াও যাইব না। এইরূপে যদি সর্ব্বদা সংস্কারের ক্রিয়া না হইত তাহা হইলে এই অনন্ত সৃষ্টিই সম্ভাবিত না। প্রত্যেক মনুষ্যই পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কারের বলে নিজ অবস্থা গঠন করিয়া লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। সুতরাং যিনি যে অবস্থায় পতিত হন তাহা তাঁহার নিজ কর্ম্মানুযায়ী ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আবার পূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত সংস্কার অধিক বদ্ধমূল হয় পরজন্মে প্রারম্ভ হইতেই সেই সমস্ত সংস্কারের ক্রিয়া অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হয়, যে, যে সকল বালক শৈশব কাল হইতেই নানা সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত হয় তাহা কেবল তাহাদের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কারের বলে মাত্র। এইরূপ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কার বলেই ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, শুকদেব প্রভৃতি মহাত্মা আজন্ম হরিপরায়ণ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণেরও বাল্যজীবনের ঘটনাবলি ও ব্যবহার চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে তিনি পূর্ব্ব জন্ম হইতে নানাবিধ সুসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সামান্য আহার ও সামান্যরূপ পরিধেয় বস্ত্রতেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিতেন। আশৈশব তাঁহার কোনরূপ আড়ম্বর ভাল লাগিত না। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার নৃত্য ও গীত বিষয়ে

বিশেষ অনুরাগ ছিল। বিনা সহায়তায় কেবল মাত্র নিজের চেষ্টায় তিনি, সুন্দর রূপে নৃত্য গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার কণ্ঠস্বর এতই সুমধুর ছিল যে তাঁহার গান শুনিবার জন্য সকলে আগ্রহের সহিত সর্ব্বদা তাঁহাকে শ্যামা বিষয়ে গান করিতে অনুরোধ করিতেন। রামকৃষ্ণের কখন গানে অরুচি ছিল না। কি ভদ্র কি অভদ্র যে অবস্থার লোক হউন না কেন গান শুনিতে চাহিলে বিনা আপত্তিতে গান করিতেন। এবং গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার "শ্রোতার" দিকে বড় দৃষ্টি থাকিত না, তিনি আপন গানে আপনি মোহিত হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন। রামকৃষ্ণের জীবনের একটি প্রধান লক্ষ এই ছিল যে তিনি সকল অবস্থার লোককেই সন্তুষ্ট করিয়া পরম সুখানুভব করিতেন।

এইরূপে সদানন্দে শৈশবকাল অতিবাহিত করিয়া যখন প্রায় ১০।১২ বৎসর বয়ঃক্রমে উপনীত হইলেন তখন তাঁহাকে জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে হয়। এই সময় তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কলিকাতায় ঝামাপুকুর নামক স্থানে একখানি চতুষ্পাঠী ছিল। রামকৃষ্ণ সেই চতুষ্পাঠীতে শাস্ত্রাভ্যাসের জন্য আনীত হন। কিন্তু শাস্ত্রচর্চ্চায় তাঁহার কিছুতেই মনোনিবেশ হইল না। এখানে আসিয়াও তিনি তাঁহার অতি প্রীতিকরী বাল্যক্রীড়া ছাড়িতে পারিলেন না। তৎপর ১২৫৯ সালের আষাঢ় মাসে মাড়বংশের গৌরব-স্বরূপা রাণি রাসমনি দাসী কলিকাতার উত্তর দক্ষিণেশ্বর নামক স্থানে বহুব্যয় করিয়া একখানি কালী প্রতিমা স্থাপন করেন। সেই সময় শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় পূজকরূপে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। সুতরাং রামকৃষ্ণকেও তাঁহার ভ্রাতার অনুগমন করিতে হয়। রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দুই তিন বৎসর যাবৎমাত্র মায়ের পূজার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পান। এই সময়ে রামকৃষ্ণের কোন কার্য্যই ছিল না। অনন্ত লীলাময়ীর অদ্ভুত লীলা কে বুঝিতে সক্ষম। হঠাৎ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। সুতরাং রামকৃষ্ণ তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইলেন। যাঁহার, তাঁহাকেই সাজিল। নির্ম্মল হৃদয় রামকৃষ্ণ মায়ের পূজার ভার লইয়া বড়ই অনুরাগের সহিত মায়ের পূজার্চ্চনাদি করিতে লাগিলেন। এই সময় অর্থাৎ অনুমান যখন তিনি ষোড়শবর্ষে উপনীত হন তখন হুগলী জেলার অন্তঃর্গত জয়রাম বাটি নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সপ্তম বর্ষীয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী

সারদা সুন্দরী দেবীর সহিত তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর পুনরায় তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়া স্বকার্য্যে নিযুক্ত হন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রামকৃষ্ণ নিরক্ষর ছিলেন। সংস্কৃত ত দূরাস্তাং, তাঁহার বাঙ্গালা ভাষাতেও ভালরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল না। কিন্তু তাঁহার উপর মায়ের পূজার ভার অর্পিত হইলে তিনি যথাশাস্ত্র মন্ত্রাদি অভ্যাস করিয়া যথাজ্ঞান পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূজার প্রধান উপকরণ একমাত্র অকপট ভক্তি। তিনি যে দিবস হইতে পূজায় বৃতি হন, সেই দিবস হইতেই পরম ভক্তি সহকারে মায়ের পূজার কার্য্য সমাপন করিতেন। পূজান্তে একদৃষ্টে অনিমেষ লোচনে মায়ের মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন এবং সজল নেত্রে নানাবিধ শক্তি বিষয়ক গান করিয়া নিজ জীবনের অসারত্ব ব্যঞ্জক আক্ষেপ করিতেন। একদিন তিনি সন্ধ্যার পর দেবীর আরতি সমাপ্ত করিয়া অনুরাগের সহিত ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদের রচিত একখানি সঙ্গীত করিতে করিতে এতই বিহ্বল হইয়া পড়েন যে অশ্রুধারায় গণ্ড ও বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া ভূমে নিপতিত হইতে লাগিল, মায়ের দয়ামাখা ভুবন মুগ্ধকর মুখের উপর দুইটী নয়ন নিন্যস্ত করিয়া নিস্পন্দের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন, কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ প্রায় যেন অন্তর্দ্দৃষ্টি ও বহির্দ্দৃষ্টি এক হইয়া গিয়া বাহিরের বিষয়ে একবারে উপলব্ধি বিহীন হইয়া পড়িলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন,—"মা রাম-প্রসাদকে দেখা দিলি, তবে আমায় কেন দেখা দিবিনি মা?" এইরূপ বলিতে বলিতে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; সে ক্রন্দন আর শীঘ্র থামিল না। যেন রামকৃষ্ণের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত প্রবল সাধনার সংস্কার রাশি উদ্দীপক কারণের সহায় পাইয়া শতগুণ বেগে পরিস্ফুরিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বজন্মের সাধনলব্ধ যে ভক্তি নদীর প্রবাহ জন্মান্তর গ্রহণরূপ প্রবল অন্তরায়ে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল অদ্য যেন তাহা কি কৌশলে অপসারিত হইয়া গেল; কালি-সমুদ্রে মিলিবার নিমিত্ত ভক্তির প্রবাহ উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া ছুটীতে লাগিল। রামকৃষ্ণের অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। রামকৃষ্ণ কখন কাঁদেন কখন হাসেন, কখন নৃত্য করেন, কখন বা মা মা বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে থাকেন। সাধারণ চক্ষে তিনি প্রকৃত উন্মাদের ন্যায় ফিরিতে লাগিলেন। কখন গঙ্গাতীরে উত্তপ্ত বালুকার উপর মুখ ঘর্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার কেবল বলিতেন মা আমার ভক্তি

দে ”, কখন গভীর নিশিতে শ্মশান মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেহ খানি সাষ্টাঙ্গে ভূমিসাৎ করিয়া কাঁদিতেন আর বলিতেন মা শ্মশানবাসিনী তুই নাকি ভয়ঙ্করী-রূপে শ্মশানে আসিয়া সাধকদিগকে ভয় দেখাস, আজ আমাকেও একবার সেইরূপে এসে দেখা দে মা। এইরূপে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে সকলেই তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্থ স্থির করিয়া নানারূপ চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। ডাক্তার রাম নারায়ণ রায় বাহাদূর প্রভৃতি অনেক কৃতবিদ্য চিকিৎসক নানারূপ চিকিৎসা করিয়াও তাঁহাকে শান্ত করিতে পারেন নাই। ডাক্তারের ঔষধ দেখিয়া তিনি নাকি এক দিন বলিয়াছিলেন, যে আমি যার জন্য পাগল তোমার এ ঔষধ খাইলে কি তাহাকে পাইব?” অহো! যিনি ভবরোগ হইতে মুক্ত হইতে চান, তাঁহাকে সামান্য ডাক্তারে কি করিবে, সুতরাং তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। ভক্তির ভগবান, বিশ্বাসীর ঠাকুর। আর কি তিনি থাকিতে পারেন। রামকৃষ্ণের অকপট ও অহেতুকী ভক্তি দেখিয়া যেন তিনি তাঁহার ঈশ্বর দর্শন বাসনা চরিতার্থ করিলেন। রামকৃষ্ণের উন্মত্ততার কিঞ্চিৎ উপসম হইল। ক্রমে চিত্ত স্থির হইয়া আসিল। তখন তিনি প্রবল অনুরাগের সহিত সাধন ভজনের দিকে চিত্ত নিয়োজিত করিলেন।

সাধনাবস্থা।

কলিকাতার উত্তর ন্যূনাধিক ক্রোশত্রয় ব্যবধানে ভাগিরথীর পূর্ব্ব তীরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের দক্ষিণ সীমায় একটি অতি সুন্দর ও সুবৃহৎ কালী মন্দির [illegible]ন ভাগিরথীর গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে দ্বাদশটি শিব মন্দির সারি সারি শোভা পাইতেছে। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান। স্থান জনশূন্য ও অতি নিস্তব্ধ। যে দ্বাদশটী মন্দিরের কথা বলিলাম তাহারা গঙ্গার সহিত সংলগ্নভাবে সংস্থাপিত। এই মন্দির গুলির উত্তরে একটী ক্ষুদ্র গৃহ আছে। সেই গৃহেই পরমহংস দেব সর্ব্বদাই থাকিতেন ও নিজ কার্য্য করিতেন। এই গৃহের সন্নিহিত উত্তরে কএকটী সুবৃহৎ ও অতি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষতলই পরমহংসের সাধনার স্থান। এই স্থানে তিনি নানাবিধ সাধনা করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি তিনি গোকুল হইতে বেদ পুরাণ, তন্ত্র,

কোরাণ এবং অন্যান্য প্রত্যেক শাখা ধর্ম্ম প্রণালীর কোন প্রক্রিয়া করিতে বাকী রাখেন নাই। সকল অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, তিনি যখন যে প্রণালীর সাধনা করিতে সংকল্প করিতেন, তখনই সেইরূপ সাধন-প্রণালীর একজন করিয়া সিদ্ধ গুরু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিহিত দীক্ষা দিয়া যাইতেন। রামকৃষ্ণও উপদিষ্ট হইয়া ঐকান্তিক সাধন বলে দিবসত্রয় মধ্যে সিদ্ধি লাভ করিতেন। ধর্ম্মপথের পথিক মাত্রেই বিখ্যাত সাধক তোতাপুরীর নাম শ্রবণ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ সেই তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি বিষয়ে উপদেশ লাভ করেন। শুনিয়াছি ঐ দিবসত্রয় মাত্র সাধনায় তিনি সর্ব্বসজ্জনবাঞ্ছনীয় নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। কথিত আছে, যে, এই সময় তোতাপুরী তাঁহাকে পরমহংস উপাধি দিয়া যান।

এই সময়ে রামকৃষ্ণের কার্য্য কলাপ কেহ দেখিতেও পাইত না বুঝিতেও পারিত না। পূর্ব্ব হইতেই লোকে তাঁহাকে উন্মাদ স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, এখন আবার নূতন নূতন ভাব ভঙ্গি দেখিয়া সাধারণে তাঁহাকে আরও পাগল, বুজরুক প্রভৃতি নানা অভিধানে, অভিহিত করিতে লাগিল। এইরূপ ভাবে কিছুদিন গত হইলে এক নবীনা তান্ত্রিক সাধিকা যোগিনী আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি কিছুদিন ধরিয়া অতি সাবধানের সহিত রামকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং নানাবিধ কঠোর সাধন প্রক্রিয়া শিক্ষা দিয়া যান। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে রামকৃষ্ণের প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করেন। এবং রামকৃষ্ণের বাক্য ও মানসিক লক্ষণ দেখিয়া বৈষ্ণবগণের সিদ্ধাবস্থায় মহাভাবের লক্ষণের সহিত মিলাইয়া দেখাইয়া দেন, যে, ভক্তি সাধনে ভক্তের এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে। যোগিনী, রামকৃষ্ণকে লোকে পাগল ভাবিয়া তাঁহার উপর অন্যায়াচরণ না করে, তজ্জন্য নানা ভাবে তাহাদের তাঁহার মহাভাবের বিষয় বুঝাইয়া বলিতেন। কিন্তু তাহাতে সাধারণের বিশ্বাস জন্মিল না,—তামসিক প্রকৃতিতে সাত্ত্বিক উক্তি স্থান পাইবে কেন? সকলেই তাঁহাকে বাতুল বলিয়া উপহাস করিত।

ক্রমশঃ।

———
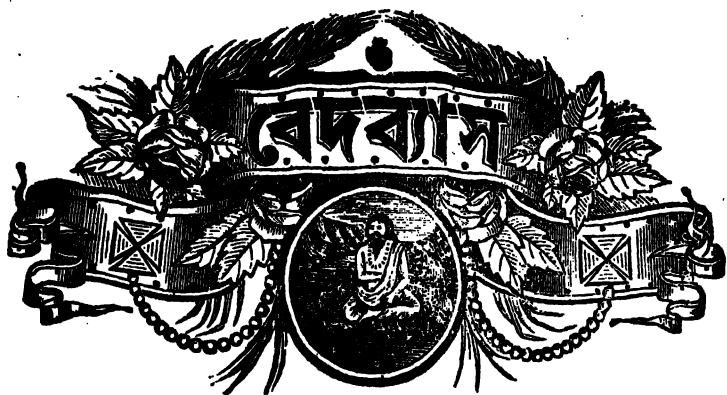
২য় ভাগ। সন ১২৯৪ সাল। ৮ম খণ্ড।

পূজনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সাধনকালে তিনি অহং ত্যাগ করিবার জন্য দন্তে সম্মার্জ্জনী ধারণ পূর্ব্বক মল মূত্রের স্থান পরিষ্কার করিতে করিতে রোদন করিয়া বলিতেন "মা, আমার অহঙ্কার নাশ করে দে, আমার শুচি অশুচি বোধকে বিনষ্ট করে দে, মা! আমি হীনের হীন, দীনের দীন, রেণুর রেণু সকলের দাসানুদাস, এই ভাব যেন প্রাপ্ত হই। বৈরাগ্য সাধনের নিমিত্ত তিনি একাকী জাহ্নবী তটে উপবেশন করিতেন এবং এক হস্তে মুদ্রা ও অপর হস্তে মৃত্তিকা লইয়া মনকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেন "মন একে বলে টাকা, ইহা জড় পদার্থ। রূপার চাক্তি এবং বিবির মুখ আছে। ইহার দ্বারা চাল হয়, ডাল হয়, ঘর বাড়ী হয়, হাতি ঘোড়া হয়। জড়ে জড়ই লাভ হয়, কিন্তু সচ্চিদানন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে টাকাও যা মাটিও তা। মাটিতে ধান হয়, অন্যান্য ফল মূলাদি হয়, তাহাও ত জড়, তাহাতেও সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না। যদি টাকা ও মাটি একই হইল, তবে টাকার প্রতি মনের আসক্তি থাকিবে কেম? টাকা মাটি, মাটি টাকা একই বস্তু। এই বলিয়া উহাদের

জলে নিক্ষেপ করিয়া দিতেন। কামিনী আর কাঞ্চন সাধন তাঁহার জীবনের এক প্রধান ব্রত ছিল। তিনি স্ত্রীলোক মাত্রেতেই শক্তিরূপিণী মহামায়ার আবির্ভাব দেখিতে পারিতেন এবং স্ত্রীলোক দর্শন মাত্রেই তাঁহার বাহ্য চৈতন্য বিলুপ্ত হইত। তিনি বাল্যকাল হইতেই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বিবাহান্তর তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে একবার মাত্রও অবসর হয় নাই; কারণ, বিবাহের অব্যবহিত পরেই তিনি ঈশ্বর প্রেমে মত্ত হইয়া পড়েন। তিনি বলিতেন, "যে, স্ত্রীযোনি হইতে মনুষ্য প্রসব হইয়া দুর্ল্লভ মনুষ্যজীবন লাভ করে, সুতরাং উহা মাতৃস্থানীয়া। সাধকের পক্ষে উহার অন্যরূপ ব্যবহার অবিধেয়"।

যাহা তাঁহার সাধনার অন্তরায় বোধ হইত তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিতেন। এক দিবস তাঁহার কোন ভক্ত একখানি মূল্যবান পট্ট বস্ত্র ক্রয় করিয়া লইয়া তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধার সহিত পরাইয়া দেন। তিনিও আনন্দের সহিত পরিধান করিয়া তাঁহার সাধনার স্থান বৃক্ষতলে যাইয়া বৃক্ষটী প্রদক্ষিণ করিয়া যেমন ভগবানের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবেন, অমনি তাঁহার বস্ত্রের দিকে চিত্তের আকর্ষণ জন্মিল,—যে, পাছে উহাতে ধুলা লাগে। ভক্তের প্রণামে বাধা পড়িল, আর কি ভক্ত স্থির থাকিতে পারেন, তৎক্ষণাৎ পরিধেয় পট্ট বস্ত্র সজোরে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপর শান্ত চিত্ত হইয়া মায়ের চরণ বন্দন করিতে করিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

এই সময় রাণি রাসমণির জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস মহাশয় রামকৃষ্ণের অবস্থা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার কার্য্য কলাপ পর্য্যাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে মথুর বাবু তাঁহার সমুদায় ব্যাপার অবলোকন করিয়া সমস্তই যে রামকৃষ্ণের ভণ্ডামী ইহাই স্থির করিলেন। এবং সেই বিশ্বাসের উপর দৃঢ় হইয়া তিনি নানারূপে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি বাছিয়া বাছিয়া নবযৌবন সম্পন্না সুরূপা সুবেশা ব্যাশ্যাব্যবসায় বিশেষরূপে পারদর্শিনী বারাঙ্গনাদিগকে নিজ বাগান বাটীতে লইয়া আসিয়া তাঁহার সুসজ্জিত ও মনোরম বৈটকখানায় মনোমত ভাবে সাজাইয়া বসাইতেন। তৎসঙ্গে উহাদের নিত্য সহচর সুরারও অভাব থাকিত না। যাহাতে রামকৃষ্ণের চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় তজ্জন্য সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে তাহাদের আদেশ করিতেন। এইরূপে সমস্ত স্থির করিয়া রামকৃষ্ণকে ডাকিতে পাঠাইতেন। এই সময় রামকৃষ্ণের

এরূপ অবস্থা হইয়াছিল, যে, স্ত্রীলোক দেখিবামাত্র তাহার সম্পূর্ণ সমাধি হইয়া যাইত। মথুর বাবুকে তিনি প্রথম হইতেই বিশেষ স্নেহ করিতেন। সুতরাং তাঁহার আহ্বানে কোন দ্বিধা না করিয়া ধীরে ধীরে বৈটকখানা মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগকে দেখিবামাত্র তাঁহার সমাধি হইয়া যায়। এবং বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থায় ভূমিতে বসিয়া পড়েন। মথুর বাবুর আদেশ ক্রমে সেই অবস্থাই তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বসান হইত। তৎপর উপস্থিত ব্যাশ্যাগণ নানারূপ ভাব ভঙ্গি ও বিবিধ চেষ্টা করিয়াও তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করিতে পারিত না। এইরূপে মথুর বাবু তাঁহাকে আরও কলিকাতার নানাস্থানের ব্যাশ্যালয়ে লইয়া ফিরিয়াছিলেন কিন্তু কোথায় তাঁহার মন চাঞ্চল্য করাইতে পারেন নাই। পরমহংসদেব বলিতেন কি মনুষ্য কি পশু কি পক্ষী যাহারা স্ত্রীশ্রেণীভুক্ত তাহারাই প্রকৃতির অংশ বিশেষ, অতএব মাতা। সুতরাং যিনি এই ভাবে স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টি করিতেন তাঁহার কি আবার স্ত্রীলোক দর্শনে মন চাঞ্চলা হইবার সম্ভব ?

মথুর বাবু এইরূপ নানাপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা যখন রামকৃষ্ণকে কিছুতেই ভ্রষ্ট করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহার মনের ভাব অন্যরূপ ধারণ করিল। তিনি তখন আর রামকৃষ্ণকে সামান্য মনুষ্য ভাবে দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাস এতদূর দৃঢ় হইয়া পড়িল যে তিনি তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এমন কি তিনি রামকৃষ্ণকে স্বীয় অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গিয়া নিজ স্ত্রী কন্যাদিগের দ্বারা তাঁহার সেবা সুশ্রূষাদি কার্য্য করাইতেন। স্ত্রীলোকেরাও অতি আনন্দে পরম ভক্তি সহকারে সাধু সেবা করিয়া আপনাদের কৃতার্থ বোধ করিতেন। তাঁহারা রামকৃষ্ণকে যেন আপনাদের কোলের শিশু মনে করিতেন এবং সেই ভাবেই সেবা সুশ্রূষা ও আহারাদি করাইতেন। রামকৃষ্ণও মায়ের ছেলের মত হাসিয়া খেলিয়া তাঁহাদের সহিত দিন কাটাইতেন।

তৎপরে মথুর বাবু তাঁহাকে লইয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন। ক্রমে কাশী বৃন্দাবন গয়া প্রভৃতি মহাতীর্থ সকল ভ্রমণ করেন। তীর্থাদি দর্শন কালীন তিনি তথাকার দেবালয়াদি দর্শন করিয়া বলিয়া ছিলেন, যে, মা আমার সেখানেও যেমন এখানেও সেইরূপই, তবে সেখানে আর এখানেত কিছুই প্রভেদ দেখিতেছি না। মায়ের সেখানকার তেঁতুল গাছটীরও যেমন পাতা, ডাল, এখানকার তেঁতুল গাছটীরও সেইরূপই পাতা ডাল"।

রামকৃষ্ণের নির্ম্মল চক্ষু দিব্যভাব ধারণ করিয়াছে! সে চক্ষে কি আর প্রভেদ দৃষ্টি হইতে পারে? তিনি তখন জগৎময় এক জগন্ময়ীরই সত্তা অবলোকন করিতেছেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ রাধিকা, কাশীতে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা, গয়ায় গদাধর সকলই কেবল এক মায়েরই রূপান্তর মাত্র বলিয়া তাঁহার চক্ষে দিব্য আভাসিত হইতে লাগিল,—ভক্তের দৃষ্টিই এইরূপ। গয়ায় গদাধরজীউর শ্রীপাদপদ্ম প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাঁহার চিত্তের এক অপূর্ব্ব অবস্থা হয়। তখন তিনি সেই অবস্থায় নাচিতে নাচিতে কি যেন কি এক ভাবে বিভোর হইয়া গেলেন। তাঁহার সে অবস্থা যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তিনি ভিন্ন সেই অপূর্ব্ব ভাবাবেশের ব্যাখ্যা করিতে অন্য কেহই সক্ষম নহে। এইরূপে তীর্থাদি পর্য্যটন করিয়া তিনি পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আপন সাধন পীঠে আসিয়া বসিলেন। এই সময় হইতে তিনি দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়েই সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেন। মধ্যে মধ্যে কোন ভক্ত কর্ত্তৃক নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া স্থানান্তরে যাইতেন মাত্র। কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটী নিবাসী শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিক মহাশয় পরমহংসকে দেবতা তুল্য জ্ঞান করিতেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহাকে সিন্দুরিয়াপটীর নিজ আবাসে লইয়া গিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে সেবা করিতেন। যখন তিনি শম্ভু বাবুর বাড়ীতে আসিতেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহুলোকের জনতা হইত। নানালোক নানা ভাবে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। পরমহংসের নিকট কেহ উপস্থিত হইলেই, তিনি যে শ্রেণীর যে জাতীয় লোক হউন না কেন, তিনি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন। একদিন বৈষ্ণবচরণ নামক একজন পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি পণ্ডিতকে দেখিবা-মাত্র ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহার স্কন্ধোপরি আরোহণ করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাঁহার অভূতপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। কিন্তু পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ তাঁহার মহাভাবের লক্ষণ দেখিয়া ভক্তি ভরে নানা ভাবে পরমহংসের স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমেই রামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব ভাবের কথা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল রামকৃষ্ণকে জানিতেন না এরূপ সাধু সন্ন্যাসী ভারতে অতি বিরল। আমরা হরিদ্বারে একজন ব্রহ্মচারীর নিকট রামকৃষ্ণের বিষয় যেরূপ শুনিয়াছিলাম তাহাতে আমাদের আশ্চর্য্য হইতে হইয়াছিল। আমরা তৎপূর্ব্ব হইতেই রামকৃষ্ণের নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিতাম কিন্তু তখন তিনি আমাদের তত মনাকর্ষণ করিতে

পারেন নাই। কিন্তু হরিদ্বার হইতে ফিরিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। তৎপর আমরা প্রায়ই তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার অমৃতময় উপদেশ সকল শ্রবণ করিতাম এবং তাঁহার ক্ষণে ক্ষণে নব নব ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিতাম। আমরা এই সময় তাঁহার নিকট নানা ধর্ম্মাবলম্বী দর্শককে পরিপূর্ণ দেখিতাম। খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, জৈন, হিন্দুত আছেই, আরও কত সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া পরমহংসদেবের চরণে মস্তক অবনত করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বিখ্যাত নববিধানীব্রাহ্মধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কেও ভক্তি গদ্‌গদ্‌ভরে তাঁহার চরণ প্রান্তে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। পরমহংসদেবের আশ্রম পাইয়া কেশব বাবুর হৃদয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। সেই পরিবর্ত্তনের ফলে "নব বিধান" প্রসব হয়। কেশব বাবুর শিষ্যেরা যাহাই বলুন আমাদের বিশ্বাস, যে, যদি কেশবচন্দ্র জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার নির্ভীক হৃদয় এ সত্য প্রকাশে কদাচ কুণ্ঠিত হইত না, আমাদের সহিত কেশব বাবুর বিশেষ রূপই পরিচয় ছিল; এবং অনেক সময় তাঁহার সহিত পরমহংসদেবের প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিয়াও দেখিয়াছিলাম, তাহাতে যাহা বুঝিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কেশব বাবু পরমহংসদেবকে গুরু অপেক্ষাও অধিক ভক্তি করিতেন। এই সম্বন্ধে আর একজন পরমহংসদেবের ভক্ত কি বলিতেছেন, দেখুন—

"রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দ্বারা কেশবচন্দ্র সেন সাধারণ ভক্তি সাধন প্রণালী* প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন পরমহংসদেবের প্রত্যক্ষ ধর্ম্মোপদেশের পরাক্রমে কেশব বাবুর পাশ্চাত্য ভাব সংযুক্ত বৈদান্তিক ব্রাহ্মধর্ম্মের ভক্তি ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল, তখন তাহা রক্ষার জন্য অগত্যা পরমহংসদেবের প্রকৃত হিন্দু ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ কথা অধিক দিন অপ্রকাশিত ছিল না।

কেশব বাবু যে সময়ে পরমহংসদেবের সহিত সম্মিলিত হন, তখন তিনি ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য ভক্ত ছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি সাকার নিরাকার ও ব্রহ্ম শক্তি লইয়া অতিশয় তর্ক বিতর্ক করিতেন। এই তর্কের দ্বারা কেশব বাবু শক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং তদবধি মাতৃভাবে উপাসনা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তদবধি ভক্তির মাধুর্য্য রস তাঁহার মধ্যে রক্ষিত হইতে দেখা গিয়াছে। কেশব বাবু নব বিধান বলিয়া যে নূতন ধর্ম্ম-

ভাব প্রচলিত করিয়াছেন তাহা নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে রাম-কৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধন ফলের আভাষ মাত্র বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। কথিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব নিজে সাধন দ্বারা সকল ধর্ম্মের সত্ত্বা প্রতক্ষ্য করিয়া নিশ্চিত ভাবে বসিয়াছিলেন। কেশব বাবু তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি হয় পরমহংসদেবের প্রকৃত ভাব অনুধাবন করিতে পারেন নাই, না হয় নিজের বুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্য তাহাতে কিঞ্চিৎ কারিগরি করিয়া অর্থাৎ যে ধর্ম্মে যেটুকু সার বলিয়া তিনি বুঝাইলেন তাহা সংগ্রহ করিয়া এক নূতন বিধানের সৃষ্টি করেন। যেমন ঈশা হইতে প্রেম, চৈতন্য হইতে ভক্তি, বুদ্ধ, নামক মহাত্মা হইতে জ্ঞান ইত্যাদি। কিন্তু পরমহংসদেব তাহা বলিতেন না তাঁহার মনে প্রত্যেক মতই সত্য। যে মতে প্রেমের কাহিনী কথিত হইয়াছে তাহা হইতে প্রেম বিচ্যুত করিয়া লইলে তাহার কি অবস্থা হইবে? যেমন কোন ব্যক্তির শরীর, কাহার হস্ত এবং কাহার পদ কর্ত্তন করিয়া একটী কিম্ভূত কিমাকার মুর্ত্তি সংগঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সেই খণ্ডিত অঙ্গ যে যে শরীরে ছিল, তাহা সেই সেই শরীরেরই উপযোগী হইয়া স্বভাব হইতে প্রসূত হইয়াছে। তাহার শোভা স্বাভাবিক কৃত্রিম নহে। সেইরূপ যে যে ধর্ম্ম যত প্রচলিত আছে, তাহাতে একটী একটী স্বতন্ত্র ভাবের প্রথমাবস্থা হইতে পূর্ণ পুষ্ঠীকাল পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের যে অংশ বিশেষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, তাহারই থাকে। ইহাদের যে অংশ বিশেষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, তাহা তাহারই প্রথম হইতে গণনা না করিলে সে ভাব কস্মিনকালে প্রস্ফুটিত হইবে না। যেমন সন্তানের বাৎসল্য প্রেম সন্তান ব্যতীত স্ত্রী কিম্বা ভ্রাতা অথবা মাতা পিতা কল্পনা করিয়া প্রকাশ করিলে কখনই বিকশিত হইতে পারে না, তেমনই ধর্ম্মের ভাব জানিতে হইবে। ঈশার প্রেম ঈশার প্রণালীতে, চৈতন্যের ভক্তি চৈতন্য সম্প্রদায়ে, বুদ্ধের জ্ঞান বৌদ্ধমতে পরিচালিত না হইলে সেই সেই বিশেষ ভাব কদাপি লাভ করিবার কি সম্ভাবনা আছে? পরমহংস দেব সেই জন্য যখন যে যে মতে সাধন করিয়া ছিলেন তখন সেই সেই মতের কোন প্রক্রিয়া স্বেচ্ছাচারীর বশবর্ত্তী হইয়া পরিত্যাগ করেন নাই। যাঁহারা পরমহংসদেবকে নব বিধানের প্রবর্ত্তনকর্ত্তা বলিয়া সংবাদ

পত্রে আন্দোলন করিতেছেন তাঁহাদের এইজন্য বলি যে তাহা তাঁহাদের বুঝিবার ভুল হইয়াছে। পরমহংসদেব সেরূপ সর্ব্বধর্ম্ম বিশ্লিষ্ট করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে এক অপূর্ব্ব ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহাতে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী এককালে চূর্ণী কৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে যে কেহ কোন মত বিশেষকে ঈশ্বরের একমাত্র ধর্ম্মপথ বলিয়া উল্লেখ করেন তাহা তাঁহাদের ভ্রম জ্ঞান করিতে হইবে। ইহা ভুরি ভুরি প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা তিনি সাব্যস্থ করিয়া দিয়াছেন।"

ক্রমশঃ

নবমী পূজা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভোলাদাস। মা ; তুই আড়ালে থাকিয়াও, একবার ভালরূপে তাকাইলেই, লোকে "যাহা বুঝিবার" তাহা বুঝে, তখন তোর নিজ মুখে শুনিয়াও কিছুই বুঝিবে না কেন ?

জগদম্বা। (স্মিতমুখে) এখন ইহার দুই একটি উদাহরণও বুঝিয়া লও, —আত্মার শক্তি পরিচালনার যন্ত্রস্বরূপ ঐ শরীরের অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত্ত, উহাতে কএকটি ভৌতিক পদার্থ কিছু অধিক পরিমাণে থাকা নিতান্তই আবশ্যক হয়, যেমন যবক্ষার (আজোট) স্নেহ, গুড়, লবণ ইত্যাদি। এই সকল পদার্থগুলি না থাকিলে, মানব শরীরের অস্তিত্ব থাকে না, মস্তিষ্ক ও স্নায়ু প্রভৃতি সমস্ত শরীরাবয়বই অকর্ম্মণ্য ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, আত্মার কোন প্রকার শক্তিরই পরিচালন করিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত, আরও অনেকগুলি পদার্থ আছে, তাহা অতি অল্পমাত্রায় থাকিলেও চলে, যেমন লৌহ, সীসক, চূর্ণ, গন্ধক ও ক্ষার ইত্যাদি। এই সকল পদার্থও দেহের অস্তিত্ব রক্ষার বিশেষ সাহায্য করে। এদিকে আবার প্রতিক্ষণই শ্বাস প্রশ্বাসাদি নানাবিধ কারণে, শরীরস্থিত উক্ত সমস্ত প্রকার পদার্থের ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, উহারা শরীরের মধ্য হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া চারিদিকে উড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রাণীগণ নানারূপ আহারের দ্বারা আবার সেই

অভাবের সম্পূর্ণরূপ পূরণ করিয়া থাকে। ইহাই আহার এবং শরীরের পরস্পরের ক্রিয়া। তন্মধ্যে, যে যে দ্রব্যগুলি শরীরের নিতান্ত প্রয়োজনীয়, যে যে বস্তুর অভাবে শরীরাবয়বগুলি শিথিল ও ক্ষীণবীর্য্য হইয়া, আত্মার শক্তি পরিচালনে অশক্ত হয়, উহারা যথোচিত রূপে প্রবাহিত হইতে পারে না, সেই সকল বস্তুগুলি উদরস্থ বা মুখস্থ করা মাত্রেই, শরীরের সেই সকল বস্তুর অভাব বিদূরিত হয়, তখন ঐ সকল দ্রব্যগুলি শরীরের সহিত সমবেত হয়, তখন শরীরটা বীর্য্য-সম্পন্ন এবং আত্মার শক্তি সমূহের রীতিমত পরিচালনে সমর্থ হয়; সুতরাং আত্মার শক্তিগুলিও, তখন উপযুক্ত অবলম্বন পাইয়া, অনর্গল ও অবাধভাবে স্নায়ুমণ্ডলাদির দ্বারা চলিয়া ফিরিয়া আপনাপন কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে। অতএব ঐ সকল বস্তু আহার করা কালে, আত্মা সুখ বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে। আর যে সকল দ্রব্যের দ্বারা, শরীরের মধ্যে, ইহার বিপরীত ঘটনা হয়, তদ্দ্বারা আত্মার শক্তিরও ইহার বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ বাধিত অবস্থা হয়; সুতরাং তখন দুঃখ বলিয়া অনুভূত হয়।

ভাবিয়া দেখ! দুগ্ধ, ঘৃত, ও মৎস্য, মাংসপ্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য, প্রায় সাধারণতঃ সকলেরই বিশেষরূপে সুখবর্দ্ধন করে। তৎপর, কিছু কম পরিমাণে হইলেও, আলু, পটোল, বেগুণ প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যও সুখজনক স্বাদযুক্ত হয়। আবার কুইনাইন, অহিফেণ প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য আছে, তাহা সকলেরই অতিশয় অতৃপ্তিজনক হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, দুগ্ধাদির মধ্যে মনুষ্য শরীরের পোষক ও রক্ষক পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনেকগুলি পদার্থ আছে। আর কুইনাইনের মধ্যে "কোয়াসিয়া" নামে এক প্রকার বিষ পদার্থ আছে। এবং আফিঙের মধ্যে "মরফিয়া" নামক বিষ বিশেষ আছে। এজন্যই, স্বভাবাবস্থায় কুইনাইন এবং অহিফেণাদি খাইলে শরীর বিষাক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং আত্মার শক্তি পরিচালনে অনুপযুক্ত হয়, আত্মার শক্তি প্রবাহের বাধা হইতে থাকে। তাদৃশ ব্যাধিতাবস্থার নামই দুঃখ। সেই জন্যই কুইনাইন খাইলে দুঃখের অনুভব হইয়া থাকে। আর দুগ্ধাদি দ্রব্যগুলি রসনাসংযোগ করা মাত্রেই উহার গুড়াংশ, স্নেহাংশ, লবণাংশ ও প্রস্ফুরকাদির অংশটা রসনার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাদির দ্বারা শরীরে পরিগৃহীত হয় তৎপর উদরস্থ হইলে, পাকস্থলী-সংলগ্ন সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম শিরাদির দ্বারা, উহার প্রায় সকলগুলি অংশই পরিগৃহীত হয়, এবং তৎক্ষণাৎ রসনা,

উদরাদি স্থূল অবয়বগুলি আর রসনা-সংলগ্ন ও উদরাদির সন্নিহিত শিরা, ধমনী, নাড়ী, ও স্নায়ু প্রভৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবয়ব গুলি, সকলেরই ঐ সকল দ্রব্যের অভাব পূরণ হয়। তখন উহারা ঐ সকল খাদ্য দ্রব্য হইতে আপনাপন প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি পাইয়া, আপনাপন অবয়ব পরিপুষ্ট করে, তখন উহারা পুনর্ব্বার আত্মার শক্তি পরিচালনায়, পূর্ব্বের মত, সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব আহারের পূর্ব্বে, উহাদের ক্ষীণতা প্রযুক্ত যে, আত্মার শক্তি পরিচালনায় বাধা ছিল তাহা দূরীভূত হয়, আত্মার শক্তিগুলি তখন আপনাপন নির্দ্দিষ্ট বিষয় লক্ষ্য করিয়া অনর্গল ও অবিরোধ ভাবে গতায়াত করিতে থাকে, দেহের সমস্ত অবয়বেই, আত্মার সমস্ত গুলি শক্তি, যথাবৎ অনর্গল ও অবিরোধ ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। ঈদৃশ অনর্গল ভাবে প্রবাহিত অবস্থার নামই সুখ; তাই দুগ্ধাদি পান করিলে সুখবোধ হইয়া থাকে।

খাদ্য বস্তু সকল উদরসাৎ হইলে, দেহ ক্রমেই আরও অধিক মাত্রায় উহার অংশগুলি গ্রহণ করিতে থাকে, ক্রমে, দেহে ঐ সকল বস্তুর অভাব একবারেই বিদূরিত হয়, সমস্ত গুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গই আত্মার শক্তি পরিচালন করিতে আরও উত্তম রূপে উপযুক্ত হয়, সুতরাং আত্মার সমস্তগুলি শক্তিই অবাধে দেহের মধ্যে ইতস্ততঃ বিসর্পিত হইতে থাকে, তখন সেই অবস্থাকেই "আপ্যায়িত ভাব" বা "তৃপ্তিসুখ" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই হইল আহার জনিত সুখ ও দুঃখের তত্ত্ব। তৎপর অন্যান্য যত প্রকার বিষয়-জনিত সুখদুঃখাদি আছে, তৎ সমস্তই এইরূপ আত্মার শক্তির অনর্গল-প্রবাহাবস্থা এবং বাধিত-প্রবাহাবস্থা ব্যতীত আর কিছুই না। ইহাই সুখ-দুঃখের সংক্ষিপ্ত রহস্য। বৎস! তুমি ইহা বেশ বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ ত?

ভোলাদাস।—হাঁ মা, সুখ দুঃখের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছি, এখন অন্য কথা বল।

জগদম্বা। এখন তুমি বল দেখি, যদি এসংসারে এমন কোন ব্যক্তি থাকে,—যাহার দেহ চিরদিন অনাহারেও কিছুমাত্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, এবং আহারের দ্বারাও কিছুমাত্র পরিপুষ্ট হয় না, সুতরাং আত্মার শক্তি পরিচালনে কখনও অসমর্থ বা অনুপযুক্ত হয় না; অতএব কোন বস্তু আহারের দ্বারা আত্মার শক্তি কখন বাধা প্রাপ্তও হয় না, কিম্বা কখনও নূতন করিয়া

অনর্গলভাবাপন্নও হয় না; কিন্তু চিরদিনই একরূপ ভাবে চলিয়া আসি-তেছে; তবে সেই অবস্থার লোকটি যদি কুইনাইন বা দুগ্ধাদি কোন বস্তু খায়, তবে তাহার কোনরূপ দুঃখ বা সুখ হইবে কি না?

ভোলাদাস।—(কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া) না মা, তাহার কোনরূপ সুখ বোধও হইবে না, দুঃখ বোধও হইবে না। কেননা, কোন বস্তু আহার করিয়া তাহার আত্মার শক্তি কথনও বাধা প্রাপ্ত হইতেছে না, কিম্বা কোন বস্তুর সাহায্যেও অনর্গল ভ'বে প্রবাহিত হইতেছে না। সুতরাং তাহার লৌকিক দুঃখাবস্থা কিরূপে হইবে?

জগদম্বা।—তবে সে কিরূপ অনুভব করিবে?

ভোলাদাস।—যাহাকে ভালও বাসিনা মন্দও বাসিনা, এমন একজন লোক নিকটে উপস্থিত হইলে, যেমন, তাহার আকৃতিটির জ্ঞান বা দর্শন মাত্র হয়, কিন্তু সুভাব বা কুভাব, কিছুই মনের মধ্যে বিকসিত হয় না; সেইরূপ কুইনাইন বা মধু শর্করাদি খাইলেও, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে, সুখ বা দুঃখ কিছুই অনুভব হয় না, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের কেবল তিক্ত ও মধুরাদি রসটি মাত্রই অনুভূত হইবে, সুতরাং "এইটি ভাল" "এইটি মন্দ" এরূপ বোধ হইবে না। কিন্তু তাহাদের তিক্ত আর মিষ্ট, এতদুভয়ের পার্থক্য বোধটি, বিলক্ষণ রূপে থাকিবে, তাহাতে সংশয় নাই।

জগদম্বা।—এখন আমার অবস্থা শ্রবণ কর,—বাবা! আমার দেহ কথনও, কোন কারণে, কোন ঘটনায় ক্ষীণও হয় না, দুর্ব্বলও হয় না, অশক্তও হয় না, আবার কোন কারণে কথনও নূতন করিয়া পরিপুষ্টও হয় না, এবং আমার শক্তিও কথন বাধিত কিম্বা নূতন করিয়া অনর্গলভাবে প্রবাহিতও হয় না, আমার শক্তি সর্ব্বদাই সমস্ত বস্তুতে অনর্গল ভাবে প্রবাহিত হইয়া ক্রিয়া করিতেছে। আমি সর্ব্বদাই অব্যাহত বীর্য্যা, অব্যাহত শক্তি, সুতরাং নূতন কোন ঘটনার দ্বারা আমার শক্তি অনর্গল বা অবাধিত-ভাবাপন্নও হয় না, আবার বাধা প্রাপ্তও হয় না, সুতরাং কোন বিষয়ের দ্বারা আমার কোনরূপ লৌকিক সুখ বা লৌকিক দুঃখ হইতে পারে না। অতএব আমার নিকট কোন বিষয় বা কোন বস্তু ভাল বা মন্দ হইতে পারে না। বৎস! তোমার কথিত সেই কল্পিত ব্যক্তির স্থায়, আমিও কেবল প্রত্যেক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন গুণ, ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি, ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিটি মাত্র পৃথক্ পৃথক্ রূপে অনুভব করিয়া থাকি। আমার সম্বন্ধে

কান বস্তুই ভাল বা মন্দ হইতে পারে না, আমার নিকট সমস্তই সমান। তবে সেই যে, সত্ব, রজঃ আর তমঃ, এই ত্রিগুণস্বরূপ অলৌকিক সুখ ও অলৌকিক দুঃখাদির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা আমার কাছে। কারণ আমি ত্রিগুণময়ী এবং ত্রিগুণবতী। কিন্তু তথাপি আমার সত্ব শক্তি সর্ব্বদাই পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে বলিয়া আমি রজঃ আর তমোগুণের সংস্রষ্টা হইলেও তদ্দারা কিছুমাত্র পরিভূতা হই না, আমার সত্বগুণ কথনই রজস্তমের দ্বারা পরিভূত বা পরাজিত হয় না, সত্বশক্তি সর্ব্বদাই প্রবল ভাবে থাকে, রজঃ আর তমঃ তাহার অন্তরালে অবস্থিতি করে, এবং তদ্দারা অভিভূত থাকে। তাহারই মধ্যে, সময়ে সময়ে যখন রজঃ আর তমঃ ঈষৎ পরিস্ফুরিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু একটু উত্তেজিত হয়, তথনই আমি সৃষ্টি এবং লয়াদি কার্য্য করিয়া থাকি, কিন্তু সেই সৃষ্ট্যাদি কালেও আমার সত্বশক্তি কিছুমাত্র অভিভূত হয় না। সুতরাং রজঃ শক্তির দুঃখ কিম্বা তমঃ শক্তির মোহ আমার প্রবলতরসত্ব শক্তিস্বরূপ সুখের অভ্যন্তরে অনুভূত হয়, সুতরাং তাহা গ্রাহ্যে আসে না। অতএব আমার সর্ব্বদাই সুখ, আমি সর্ব্বদাই সুখময়ী। এজন্যই, প্রিয় তনয় পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"ক্লেশকর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ।" ইহার অর্থ এই যে,— ভগবান ত্রিগুণময়, তাঁহাতে যেমন সুখস্বরূপ সত্বগুণ আছে, তেমন দুঃখস্বরূপ রজোগুণ এবং মোহ স্বরূপ তমোগুণও আছে। কিন্তু তিনি ক্লেশাদি দ্বারা কখনই পরামৃষ্ট অর্থাৎ আহত বা পরিভূত হয়েন না। তৎপরে বেদব্যাসও ঐ সূত্রের ভাষ্যে, "যোঽসৌ প্রকৃষ্ট সত্ত্বোপাদানাৎ ঈশ্বরস্য শাশ্বতিক উৎকর্ষ" ইত্যাদি দ্বারা, স্বভাবতঃই আমার সত্বগুণের উৎকর্ষতা বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অতএব আমার কোন প্রকার দুঃখাদিও নাই, এবং ভাল বা মন্দ বোধে কোন বস্তুর প্রতি অনুরাগ বিরক্তিও নাই। কিন্তু আমার ভক্তের যাহা প্রিয় তাহাই আমার ভাল এবং ভক্তের যাহা অপ্রিয় তাহাই আমার মন্দ, অতএব ভক্তের প্রিয় বস্তুর দ্বারা আমার পূজা করিলেই আমি তাহা সাদরে গ্রহণ করি।

ভোলাদাস। (অতি দীন ভাবে) মাগো! ওমা! তোর নিদারুণ কথায় যে, আমার আশা ভরসা সমস্তই ভূয়ো হইয়া গেল। মা, তুই পূর্ব্বে বলিয়াছিলি যে, তোর ভোগের নিমিত্তই তুই এই সমস্ত দ্রব্যাদি সৃষ্টি করিয়াছিস, তখন ভাবিয়াছিলাম, তবে প্রাণপণে তোর নিমিত্তই এই সকল

দ্রব্য আহরণ করিয়া, তোকে আনিয়া দিয়া কৃতার্থ হইব; কিন্তু মা, তুই এখন আবার বলিলি যে, কোন বস্তুর দ্বারা তোর মুখরূপ সুখ বা দুঃখ বোধ হয় না, সুতরাং তোর নিকট কোন দ্রব্যই ভাল বা মন্দ নাই, তবে তো তোর ক্ষুধাও নাই পিপাসাও নাই, এবং ভোগও নাই, বিলাসও নাই, তবে আর তোর নিকট এ সকল দ্রব্য আনিয়া প্রয়োজন কি? আর পূর্ব্বেই বা তুই ওকথা বলিলি কেন? মা গো! আমি সত্যই বলিতেছি, তোর এই কথা শুনিয়া আমার চিত্ত অত্যন্ত অধীর হইয়াছে, ইহা তুইও জানিতেছিস; অতএব শীঘ্র শীঘ্র এবিষয়ের দ্বৈধ ভাঙ্গিয়া দে?

জগদম্বা। (সাম্ত্বনার ভাবে) বাবা! তুমি ধীর হও, তোমার নিরাশস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই, তুমি স্থির হইয়া আমার কথা শুন, তবেই ভাবনা চিন্তা বিদূরিত হইবে। বাবা! আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহাও সত্য, এবং এইক্ষণে যাহা বলিলাম, তাহাও সত্য; কিন্তু এবিষয়ে আরও কিছু বলিতে অবশিষ্ট আছে, তাহা শুন।—বৎস! আমি কিছুই ভোগ করি না তাহা একবারও বলি নাই, কিন্তু কোন বিষয়ভোগের দ্বারা লৌকিকভাবে আমার কোনরূপ সুখবোধ বা দুঃখবোধ হয় না, সুতরাং লৌকিকভাবে ক্ষুধা পিপাসাও হয় না, ভাল মন্দ প্রতীতিও নাই, ইহাই ঐ কথার মর্ম্ম। পরন্তু অন্য প্রকারে আবার আমার সমস্তই আছে, আমার ক্ষুধাও আছে, পিপাসাও আছে, ভোগ্য বস্তুর ভোগের দ্বারা সুখ দুঃখও আছে। কিন্তু ভোলাদাস! একথাটি কিছু বিস্তীর্ণ হইবে, এখন আরতির সময়ও হইয়া আসিল, অনেক লোক জন আসিবে, অতএব এখন বলা হইতে পারে না, তুমি আজই রাত্রিতে আর একবার আসিও তখন ইহা বলিব।

মায়ের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ভোলাদাস মস্তকের দ্বারা মায়ের চরণ কমলের রেণু গ্রহণ করিয়া চলিলেন, এমন সময়ে জ্ঞানানন্দও বাহির হইতে প্রত্যাগত হইলেন, এবং ভোলাদাসকে বলিলেন,—

জ্ঞানানন্দ।—দাদা মহাশয়! আবার কখন আপনার দর্শন পাইব? আমি অন্যান্য বাড়ীতে মায়ের দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, আপনি একাকী ছিলেন।

ভোলাদাস।—ভ্রাতঃ! সর্ব্বদাই তোমার দর্শন ভালবাসি; আমি একাকী ছিলাম না, মায়ের নিকটে ছিলাম, এখন চলিলাম। ভ্রাতঃ! আমি তো সততই মায়ের নিকটে থাকিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু তাহাতে মায়ের ইচ্ছ

না হইলে অগত্যাই একএকবার গিয়া একএকবার আসিতে হয়; সুতরাং আরও কতবার গতায়াত করিতে হয়, কতবার নূতন নূতন দেখা সাক্ষাৎ করিতে হয়, নিশ্চয় কি? তুমি কি শিবানন্দের ওখানে গিয়াছিলে? *

জ্ঞানানন্দ।—দাদা মহাশয়! বুঝিতে পারিলে, আপনার কথাই বেদ-বাক্য! আমি প্রতিদিন পাঁচ, সাতবার আপনার বাড়ী গিয়া থাকি; এই মাত্র আপনার বাড়ী হইতেই আসিলাম।

ভোলাদাস।—শিব সাধ্যমতে মায়ের পরিচর্য্যা করিতেছে কি?

জ্ঞানানন্দ।—শিবানন্দ এবং তারানন্দ † মায়ের যেরূপ অনুরাগী যেরূপ মাতৃ-পরায়ণ, তাহাতে মায়ের শুশ্রূষার পক্ষে কোনও ত্রুটির সম্ভব নাই। তৎপর, গৃহত্যাগকালে আপনি যে যে আদেশ করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহারা হৃদয়-সর্ব্বস্ব করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং মায়ের অশুশ্রূষার সম্ভাবনা কি? আপনার সহধর্ম্মিণী এবং শিবানন্দ, তারানন্দ, যেরূপ প্রাণপণে মায়ের আরাধনা করিতেছেন, তাহা অস্মদাদির শিক্ষণীয়। আপনার বাড়ীতে গেলে অতি পাপ-হৃদয় নাস্তিকগণও পুতুল না দেখিয়া, মাকেই দেখিতে পায়। দাদা মহাশয়! তাঁহারা যেরূপ বেশ ভূষাদির দ্বারা মাকে সুসজ্জিত করিয়াছেন, যেরূপ ভক্ষণীয় দ্রব্যাদির দ্বারা মায়ের পরিচর্য্যা করিতেছেন, তাহা অবিকল আপনার অভিপ্রায়, এবং শাস্ত্রের অনুমোদিত, আর মায়েরও অভিমত। শিবানন্দের পূজা প্রকৃত শ্রদ্ধা ও প্রকৃত অনুরাগের পরিচয়প্রদ, আর দর্শকগণের পাষাণ হৃদয় হইতেও তাহাতে মায়ের অনুরাগ আকর্ষণে সম্পূর্ণ সমর্থ। কারণ, আপনার বাড়ীতে, রাঙ্‌তা, চুম্‌কী, অভ্রাদির নাম গন্ধও নাই, রাঙ্গের গুণে-জড়িত শোলাকাষ্ঠের দ্বারা এবং রাঙ জড়িত ছিন্ন ভিন্ন বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা, মায়ের অঙ্গ অপবিত্র করিয়া মাকে একটা খেলার দ্রব্যের ন্যায় সাজানও হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের যথাসাধ্য সংগৃহীত স্বর্ণ-রজতের আভরণ এবং বস্ত্রাদির দ্বারাই মায়ের সুবর্ণময় তনু যষ্টির লাবণ্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আবার তাহাও বড় অল্প নয়, অব্যবহার্য্যও নয়, কিম্বা রমণীদাসের ন্যায় লোক দেখান মত সাজানও নয়। শিবানন্দ যাহা কিছু মাকে পরাইয়াছেন, মা অন্তর্হিতা হইলে, তৎ সমস্তই ব্রাহ্মণসাৎ হইবে।

---

* শিবানন্দ—ভোলাদাসের কনিষ্ঠের নাম।

† ভোলাদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র তারানন্দ।

এতদ্ব্যতীত, অন্য যে যে উপহার মাকে দিয়াছেন তাহারও কোনটিই অনুকল্প কিম্বা খেলনার ন্যায় অকর্ম্মণ্য নহে ; সমস্তই ব্যবহারের যোগ্য। বরং যে দ্রব্যটি তাঁহাদের সামর্থ্যের আয়ত্ত হয় নাই, তাহা একবারেই দেন নাই; কিন্তু তথাপি, অগ্রাহ্য কোন দ্রব্য মায়ের নিকট উপস্থিত করা হয় নাই। দা দামহাশয়! আর অধিক কি বলিব, অবলাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির পূজা দেখিয়া মনে যে কষ্ট অনুভূত হয়, আপনার বাড়ীর পূজা দেখিলে তাহা কিছুই থাকে না, এবং পরম তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

ক্রমে হলো কি ?

আমরা সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিগণের প্রণীত যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করি, তৎসমস্তেরই এক উদ্দেশ্য দেখা যায়—উদ্দেশ্য "জ্ঞান" প্রদান করা। শ্রুতিতে আছে "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"—একমাত্র পরমাত্মাকে জানিতে পারিলেই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে অর্থাৎ সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তদ্ভিন্ন আর অন্য পন্থা নাই। কি বেদ, কি বেদান্ত, কি দর্শন, কি পুরাণ শাস্ত্র এই মহদুদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। গুরুমুখে শুনিয়াছি এবং শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের গ্রন্থ পাঠেও ইহা দেখা যায়, যে, অধিকারী ভেদে বেদ মধ্যে দ্বিবিধ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে ; যথা—প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ। অন্য কথায়, শাস্ত্রোক্ত যাগ যজ্ঞাদি কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত উপদেশ, আর ঐ সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উপদেশ ; এস্থলে মনে রাখিতে হইবে, যে, যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবার সময়ও যেরূপ বিধি বিধান অনুসারে করিতে হইবে, ত্যাগ করিবার সময়েও সেইরূপ শাস্ত্রাদিষ্ট বিধি বিহিত মতে ত্যাগ করিতে হইবে। স্বেচ্ছাচারী হইয়া ত্যাগ করিলে তদ্দ্বারা জ্ঞান হওয়া দূরে থাকুক বৈধ-কর্ম্ম ত্যাগ জন্য ভয়ানক অন্ধকারময় স্থানে অর্থাৎ স্থাবর বা তীর্য্যগ্-যোনি প্রভৃতি নীচ যোনিতে গমন করিতে হইবে। যদি এরূপ জিজ্ঞাসা

করেন যে এইরূপ বিরুদ্ধ উপদেশ প্রদান করার উদ্দেশ্য কি? তদুত্তরে আমরা ইহা বলিতে চাহি যে জীবগণের প্রকৃতিগত বিভিন্নতাই এইরূপ উপদেশ প্রদানের হেতু। বেদরচয়িতা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার শ্রোতা, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষিগণ প্রধান অনুষ্ঠাতা, স্বর্গভোগ বা মোক্ষলাভ তাহার ফল।

মনুষ্য যতই বুদ্ধিমান নীতিজ্ঞ হউক না কেন তাহাদের কৃত "আইন" কোন না কোন অংশ ভ্রমযুক্ত হইবেই হইবে, কিন্তু সেই বিশ্বপতির এইটীই ঈশিত্ব ও অলৌকিক ঐশ্বর্য্য যে তদীয় বেদরূপ "আইনে" কোন প্রকার ভ্রম প্রমাদাদি দোষ দৃষ্ট হয় না। ভগবান্ স্বীয় বাক্যরূপ-বেদ শাস্ত্রানুসারেই সৃজন পালন ও ব্রহ্মাণ্ডের লয় করিয়া থাকেন। জীব-গণ বেদের মর্ম্মানুসারেই স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। বেদের অবজ্ঞাকারীগণ অসুর বলিয়া গণ্য হয়, তাহারা কখনই শান্তি সুখ লাভে অধিকারী হইতে পারে না।

উপরে যে "জ্ঞান" শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং যাহা লাভ করিবার জন্য শ্রুতি সকল জীবগণকে বিবিধ প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা শাস্ত্রজ্ঞান বা শিল্পজ্ঞান নহে ঐ শব্দটী ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, বেদ ইহাকে বিদ্যা বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্ম বিদ্যা ব্যতীত শাস্ত্রাদি জ্ঞানকে বেদে অবিদ্যা, শিল্পজ্ঞান, অজ্ঞান, সাংসারিক জ্ঞান প্রভৃতি নানা শব্দে বাচ্য করিয়াছেন। যে শিল্পজ্ঞান বা সাংসারিক জ্ঞানের উন্নতি দেখিয়া আমরা ইউরোপীয় মনুষ্যগণকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া থাকি, যে শাস্ত্রজ্ঞান কথঞ্চিৎ লাভ করিয়া আমরা অহঙ্কারে মাটীতে পা ফেলিতে চাহিনা, জ্ঞানীগণ ঐ শিল্প ও শাস্ত্র জ্ঞানকে অবিদ্যা অর্থাৎ মোহকারিণী বলিয়া নিরতিশয় ঘৃণা করিয়া থাকেন। অহো! সংসারের কি বিচিত্র গতি! যে মূত্র পুরিষকে কোন জীব ঘৃণায় স্পর্শ করেনা অন্য জীব তাহাই মস্তকে বহন বা ভক্ষণ করিতেছে! শ্রুতি ও বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্র সকল এই ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের জন্য মুক্তিকামী জীবগণকে সংক্ষেপে তিনটী পথ দেখাইয়াছেন—(১) ক্রিয়া যোগ অর্থাৎ সন্ধ্যা, তর্পণ, বেদাধ্যয়ন বা শ্রবণ, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্ম, ঈশ্বরোদ্দেশে সম্পাদন করিয়া কর্ম্মফল তাঁহাতেই সমর্পণ করা। স্ব স্ব বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রাদি) স্ব

স্ব আশ্রম (গৃহস্থ ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু) নির্দ্দিষ্ট বৈদিক কর্ম্ম সকল যথা বিধি সম্পাদন করিয়া কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিলে সেই নিষ্কামী মহাত্মা অনায়াসে এই ক্রিয়া যোগ দ্বারা জ্ঞান লাভ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারেন। (২) জ্ঞান যোগ—ষড় দর্শন রচয়িতাগণ এই জ্ঞান যোগ সম্বন্ধে বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহা তিন অঙ্গে বিভক্ত, শ্রবণ অর্থাৎ গুরুমুখে আত্ম তত্ত্ব শুনিবে, (খ) মনন দর্শন—শাস্ত্রীয় সূত্র সকলের সাহায্যে আত্মার বিষয় মীমাংসা করিবে ঐ মীমাংসা এতদূর দৃঢ় হওয়া উচিত যে, কোন নাস্তিক তর্কে যেন সেই মীমাংসোদ্ভব বিশ্বাসকে আন্দোলিত করিতে না পারে। নিদিধ্যাসন যোগ শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে পরমাত্মার ধ্যান করিবে এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেই জীব মুক্তিরূপ পরম পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া যোগ ও শেষোক্ত জ্ঞান যোগের যে ফল একই—অর্থাৎ মুক্তিলাভ, তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই গীতাতে বলিয়াছেন

সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্বালা প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ,

এক মপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়ো র্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥ (গীতা ৫ম অধ্যায়)

সন্ন্যাস অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ এ উভয়েরই ফল এক,—অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তি। তথাচ যাহারা এ দুইকে স্বতন্ত্র বলে তাহারা অজ্ঞান, পণ্ডিতেরা কদাচও পৃথক্ বলেন না; যেহেতু ইহার এক পক্ষ সম্যক্ রূপ অবলম্বন করিলেই উভয়েরই ফল যে মোক্ষ তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রম বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই ক্রমে ২ চিত্ত শুদ্ধি হইয়া তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে থাকে এবং তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। অতএব ক্রিয়াযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়েরই উদ্দেশ্য ও ফল এক হইল॥

আজ কাল, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে, যোগ সম্বন্ধে অনেকানেক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রচারক মহাশয়গণ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন—তাঁহারা যোগী নহেন এবং তৎসম্বন্ধে উপদেশ ও দিতে পারেন না, অতএব হুজুক প্রিয় বঙ্গ যুবক অগত্যা পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াই যোগ বিদ্যা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন আর বলিতে লাগিলেন "গুরু কে? গুরুত শিব! অজ্ঞা-

নীর জন্যই মানুষ-গুরুর আবশ্যক আমাদের জন্য নহে। এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া ৩। ৪ মাস হইল সারদা বাবু নামক হাইকোর্টের জনৈক কর্ম্মচারী অকালে প্রাণায়াম শিক্ষা দ্বারা কাল কবলে পতিত হইয়াছেন। অদ্য একমাস হইল আমার পরিচিত কলিকাতা বাগবাজার নিবাসি "হরিমোহন" নামক একজন কায়েস্থের সন্তান "প্রণব" সাধিতে গিয়া উন্মাদ হইয়াছেন। এইরূপ রোগগ্রস্থ আরও ৩। ৪ জন ব্যক্তি মদীয় গুরুর নিকট আরোগ্য লাভ করিতে আসিয়াছেন। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই লিখিলাম, পাঠকগণ সাবধান হইবেন। দ্বিতীয় এক সম্প্রদায় বঙ্গ যুবক যোগ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াই ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছেন, ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ বংশীয়গণ সন্ধ্যা তর্পণাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, কারণ জ্ঞান লাভ হইলে ক্রিয়ার আবশ্যক নাই। কলির কি মাহাত্ম্য! ইংরেজি শিক্ষার কি অপার শক্তি! যে "ব্রহ্মজ্ঞান" সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে ভিন্ন অন্য প্রকারে উৎপন্ন হইবার নহে যে "জ্ঞান" লাভ করিবার জন্য মহর্ষিগণ কত উৎকট তপস্যা অবলম্বন করিয়াছেন বহুজন্ম ও আয়াসলভ্য "জ্ঞান" পুস্তক দর্শন মাত্রেই লাভ করিতেছি। আমাদের ন্যায় "কলির চেলা" গণের পক্ষে এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান অধঃপতনের প্রশস্ত সোপান স্বরূপ সন্দেহ নাই। আমার পরিচিত অপর ২। ৩ জন কায়স্থের সন্তান কোন "অকাল কুষ্মাণ্ড গুরুর" নিকট হইতে "প্রণবযুক্ত" মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছে; ইহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এইরূপ অবমাননা করিয়া উন্মাদাদি রোগগ্রস্থ হইতেছে দেখিয়া বোধ হয় যে জ্ঞানোপদেশযুক্ত ঋষি প্রণীত গ্রন্থ সকল দুর্ভাগ্যক্রমে কি নরকের দ্বার হইয়া দাঁড়াইল? এ দৃশ্য অতি শোচনীয় ও ভয়ানক! পাঠক মহোদয়গণ—যেন এরূপ মনে না করেন যে এতদ্দ্বারা আমি জ্ঞানোপদেশ পূর্ণ এই সকল ঋষি প্রণীত গ্রন্থের অধ্যয়ন করাতে দোষারোপ করিতেছি। দোষ দেওয়া দূরে থাকুক আমি বিনয় করিয়া বলিতেছি আপনাদের মধ্যে যাহার যতটুকু অবকাশ থাকে তিনি গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়া তাহা অতিবাহিত করুণ।—পুস্তক পড়িয়াই জ্ঞানী হইলাম এইরূপ মনে করিয়া যাহারা বর্ণাশ্রমোচিত ক্রিয়া কলাপ ত্যাগ করে তাহাদিগকেই "কলির চেলা" ও ঘোর মূর্খ বলিয়া হাস্য না করিয়া থাকিতে পারি না।

উপযুক্ত গুরু প্রাপ্ত না হইয়া যোগ শিক্ষা করা মৃত্যুর কারণ মাত্র। এতদ্বারা ঐহিক পারত্রিক কোন ও মঙ্গল সাধিত হয় না যথা পুস্তক দেখিয়া কোন মন্ত্র জপ করিলে তদ্দ্বারা সিদ্ধি না হইয়া বিপরিত ঘটিয়া থাকে। অজ্ঞানীর অর্থাৎ যিনি জীবন্মুক্ত নহেন এরূপ ব্যক্তির নিকট ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা আর এক অন্ধের নিকট অন্য এক অন্ধের পথ জিজ্ঞাসা করা একই কথা। তাই শ্রুতি বলিতেছেন " অন্ধেন নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ, সাখ্যকার বলিতেছেন " ইতরথা অন্ধ পরম্পরা"।— আজ কাল অধিক স্থলেই এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পথ দেখাইয়া দিতেছেন, ফল যে কি হইবে পাঠকগণই বিচার করুন।

৩ ভক্তিযোগ—শাণ্ডিল্য মুনি বলিতেছেন " ভক্তি, পরানুরক্তি রীশ্বরে ", জগদীশ্বরে অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেবে ঐকান্তিক অনুরক্তিকে ভক্তি বলা যায়। জগদীশ্বর স্বয়ংই গীতা শাস্ত্রের ষষ্ঠ, দ্বাদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে উহা সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। বিস্তার ভয়ে ঐ সকল শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল না। যাহা হউক ভক্তি যোগকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে এক সাধন লক্ষণা বা সগুণা; ২য় প্রেম লক্ষণা বা নির্গুণা। সাধন লক্ষণা ভক্তি যোগ অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রেম লক্ষণা ভক্তি স্বয়ংই উদিত হয়। প্রেম লক্ষণা ভক্তি হইতেই বিবেক বৈরাগ্য, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। উহাদের জন্য পৃথক্ যত্ন করিতে হয় না। সাধন বা সগুণা ভক্তি ৩৪ অঙ্গে বিভক্ত (১) শ্রবণ অর্থাৎ ভগবদ্বিষয় যে সকল শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহা স্বয়ং অধ্যয়ন বা গুরুর নিকট শ্রবণ করিবে। (২) কীর্ত্তন অর্থাৎ ঈশ্বরের সৃষ্টাদি ঐশ্বর্য্যের বিষয় পরস্পর কথোপকথন; ভগবানের অবতার সম্বন্ধীয় গুণানুবাদ এবং সঙ্গীত দ্বারা তদীয় নাম কীর্ত্তনাদি ও কীর্ত্তন বলিয়া গণ্য হয়। (৩) বন্দনা অর্থাৎ ঈশ্বরের স্তব পাঠ। (৪) পদসেবন অর্থাৎ ফল পুষ্পাদির দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা ও ধ্যান করা।

দ্বিতীয় প্রকার প্রেম লক্ষণা ভক্তি পাঁচ অঙ্গে বিভক্ত হয়? (১) মনন, অর্থাৎ ভগবানের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এবং অবয়ব প্রভৃতির গূঢ় মর্ম্ম করণাদির সহিত বুদ্ধি দ্বারা মনে মনে মীমাংসা করা। (২) পূজন, অর্থাৎ মানসোপচারে ভগবানকে অর্চ্চনা করা। (৩) দাস্য ভাব, অর্থাৎ সর্ব্বদা স্বীয় জীবাত্মাকে পরমাত্মার অধীন বলিয়া জ্ঞান করা স্বীয়

শুভাশুভ কার্য্য সকল তাঁহারই ইচ্ছায় হইতেছে; আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অধীন আমার কিছুই স্বাধীনতা নাই এইরূপ ভাবে অহঙ্কার ত্যাগকে শাস্ত্রকারগণ দাস্য পদে বাচ্য করিয়াছেন। (৪) সখ্য, অর্থাৎ সর্ব্বদা ভগবানকে সখার ন্যায় বোধ করা। মহাত্মা অর্জ্জুন, পুজ্যা গোপিনীগণ জগদীশ্বরকে এই ভাবে ভক্তি করিয়াছিলেন; ইহা পূর্ব্বোক্ত দাস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (৫) আত্ম নিবেদন, অর্থাৎ সোঽহংভাব—এঅবস্থায় উপাসক স্বীয় আত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্নরূপে দর্শন করেন। জ্ঞান যোগের ইহাই নির্ব্বিকল্প সমাধি। অতএব নির্গুণ ভক্তি আর জ্ঞান যোগ উভয়ের যে এক ফল তাহা বলা বাহুল্য। ক্রিয়া যোগের চরমাবস্থায় উপাসক যেরূপ ভাবাপন্ন হন ভক্তি যোগে ও জ্ঞান যোগের চরমাবস্থায়ও সেইরূপ ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন অর্থাৎ সমাধিবান্ হন অতএব তিন পক্ষেরই গম্য স্থান এক।

কি জ্ঞানযোগ অভ্যাসকারী, কি ভক্তিযোগ অভ্যাসকারী কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে কাহার ও স্ব স্ব বর্ণাশ্রম বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক বৈদিক কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি আছে। যিনি মোহ বশতঃ এই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন তাহার জ্ঞান লাভ হওয়া দূরে থাকুক অধঃপতন হইবার সম্ভাবনা। ভগবান্ স্বয়ংই গীতাতে এই বিষয় বিশেষ রূপে বলিয়াছেন;

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে
মোহাত্তস্য পরিত্যাগ স্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৭ ॥ অধ্যায়তে

কাম্য কর্ম্ম সংসার বন্ধনের কারণ অতএব কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করা যুক্তি যুক্ত। কিন্তু নিত্য কর্ম্ম সন্ধ্যাতর্পনাদি কদাচও পরিত্যাগ করিবে না। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করিলে ঐ ত্যাগকে তামস ত্যাগ বলা যায়, অর্থাৎ তমোগুণ হইতে ঐরূপ ত্যাগ বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, এজন্য উহা অধঃপতনের হেতু বলিয়া জানিবে।

স্মৃতি বলিতেছেন—

"জ্ঞানিনা জ্ঞানিনা বা পি যাবদ্দেহস্য ধারণং
তাবৎ বর্ণাশ্রমং প্রোক্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্ম মুক্তয়ে॥"

জ্ঞানীই হউন অজ্ঞানীই হউক তিনি যে আশ্রম অবলম্বন করিয়া আছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র পক্ষে সেই সেই আশ্রম বিহিত

শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম তাহার যাবৎ দেহ থাকে তাবৎ করা কর্ত্তব্য : কারণ উহা দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া থাকে। বেদান্ত দর্শনে ইহা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে যে, জ্ঞান হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় না হইলে কাহারও মুক্তি হয় না। বামদেব ঋষির জ্ঞান উৎপত্তির পরে অন্য এক জন্মে প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হয়? ভরত ঋষির উহা তিন জন্মে ক্ষয় হইয়াছিল।

যে দিন হইতে আমরা ঈশ্বর আজ্ঞা বেদ বাক্য ও গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র বাক্য এবং মহর্ষিগণের মন্বাদি শাস্ত্র সকলের বিধি নিষেধ বাক্য অবমাননা করিয়াছি, যে দিন হইতে হিন্দুগণ ধর্ম্ম কার্য্যের প্রকৃত মর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া কেবল নকলে এবং বাহিরের চাকচিক্যে রত হইয়াছেন, যে দিন হইতে যোগ ভুলিয়া গিয়া ভোগকে জীবনের সার মনে করিয়াছেন সেই দিন হইতেই আমাদের অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে। পাঠকগণ এস্থলে অধঃপতন বলিতে কেবল রাজ নৈতিক অবনতি বুঝিবেন না; রাজনৈতিক অবনতি মনুষ্য জাতির প্রকৃত অবনতি নহে; বস্তুত পক্ষে আধ্যাত্মিক তেজ হারাইলেই মনুষ্য জাতি অধঃপতিত, এমন কি পশুত্বে পরিণত হয়। ধর্ম্মবল শূন্য স্বাধীনতা, স্বাধীনতা নহে। বন্ধুগণ! একবার উত্থিত হও তোমাদের গৃহের রত্ন চিনিতে শিখ। তোমরা কোন্ বংশে জন্মিয়া কোন্ অবস্থা হইতে কোন্ অবস্থায় আসিয়াছ, তৎপ্রতি একবার দৃষ্টি কর। গৃহ লক্ষ্মীকে অবমাননা করিয়া কি জন্য বিদেশীয় অলক্ষ্মীর লাভ আশায় অমূল্য জীবন বৃথা কাটাইতেছ? দেখ আজ বহু দূরস্থ জার্ম্মন্ জাতি ঋষিগণের গ্রন্থ সমূহকে কিরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিতেছে। আর তোমরাই সেই ঋষি প্রণীত গ্রন্থ সকলের কিরূপ মর্য্যাদা করিয়া থাক। হায়! জগদীশ! এ দুঃখরজনী কি প্রভাত হইবেনা, ভারতের এ দুর্দিন কি সুদিন হইবে না?

২য় ভাগ। সন ১২৯৪ সাল। ৯ম খণ্ড।

ব্রহ্মযজ্ঞ।

বিশ্বসংসারের অনেক স্থল প্রাণি-সঙ্ঘে পরিবেষ্টিত। প্রাণি-সকল বহুভাগে বিভক্ত, তাহার মধ্যে একভাগ মনুষ্য। মনুষ্যগণ কর্ম্মবশে দেশ-ভেদে জন্মগ্রহণ করিয়া আকৃতি প্রকৃতি প্রভৃতিতে বিভিন্ন। কেহ আর্য্য, কেহ অনার্য্য, যবন, ম্লেচ্ছ, বর্ব্বর ইত্যাদি। এতন্মধ্যে আর্য্যগণ সর্ব্ব বিষয়ে প্রধান। আর্য্যবর্গের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ ও পরম পূজনীয়। ক্ষমা, দয়া, দম, দান, ধর্ম্ম, সত্য, বিদ্যা, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য প্রভৃতি যদি সুগুণ ও মানব ধর্ম্মের সার হয়, তবে উহা ব্রাহ্মণগণে পরিলক্ষিত হইবে। উদারতা ও নির্লোভতা যদি পুরুষকারের ভূষণ হয়, স্বার্থ-ত্যাগ ও আত্মোৎকর্ষে যদি প্রাধান্য হয়, তবে উহা ব্রাহ্মণের নিকটে বিরাজিত। পরমেশ্বরকে নিয়ত হৃদয়ে রাখিয়া তাঁহার ভৃত্যভাবে যাব-তীয় কার্য্য সাধন যদি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে উহা ব্রাহ্মণজীবনেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা গম্ভীরভাবে সত্যকাম হইয়া ব্রাহ্মণাচার সন্দর্শন করিয়াছেন, চিন্তা করিয়া প্রতিকার্য্য পর্য্য-বেক্ষণ করিয়াছেন, জঘন্যকাম-দাস না হইয়া পবিত্রতা পূর্ণলোচনে

পূর্ব্বাপর ভাবিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই ইহার যাথার্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ। অন্যথারিদ্বেষকষায়িত নেত্রে ও অসংযত চিত্তে কখনই প্রকৃত কার্য্য বিভাসিত হইবার নহে। ব্রাহ্মণগণের এই সমস্ত গুণ রাশিতেই জগৎ মুগ্ধ হইয়া প্রণত ছিল। কল কৌশলে তাঁহাদের ক্ষমতা পরিচালিত হইতনা। বলের মধ্যে তপোবল, কৌশলের মধ্যে, সারগর্ভ উপদেশ-পরিপূর্ণ-মৃদু-মধুর-বচন। সেই সমস্ত কার্য্যাবলীর মধ্যে আজ আমরা ব্রহ্ম-যজ্ঞের কথা এস্থলে উপন্যাস করিলাম।

ব্রাহ্মণগণ প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিত্যকর্ম্ম।

"পঞ্চানামমসত্রাণাং মহতামুচ্যতে বিধিঃ।
যৈরিষ্ট্বা সততং বিপ্রঃ প্রাপ্নুয়াৎ সদ্ম শাশ্বতম্ ॥১॥
দেবভূত পিতৃ ব্রহ্ম মনুষ্যাণামনুক্রমাৎ।
মহাসত্রাণি জানীয়াৎ তু এবেহ মহামখাঃ ॥২॥
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞ পিতৃ যজ্ঞস্তু, তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥৩॥
ইত্যাদি ছন্দোগ পরিশিষ্টে মহামতি কাত্যায়ন।

ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ। আমরা অতি সংক্ষেপে চারিটী মহাযজ্ঞের কথা লিখিয়া পরে ব্রহ্মযজ্ঞের কথা লিখিব। পিতৃযজ্ঞ—তর্পণ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি। পিতৃ প্রসাদে অবনীতে অবতীর্ণ, রক্ষিত, জীবিত ও শিক্ষিত। জননী-জঠরে প্রবেশ অবধি ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত জননী অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন। প্রসব সময়ে কত যাতনা ও ভাবনা। পরে সন্তানের মূত্র পুরীষে ক্লিন্ন থাকিয়া ও অবিরক্তভাবে তাহাদিগকে লালন পালন করেন। কিছুকালের জন্য নয়নের অন্তরাল হইলেই কত উদ্বেগ বোধ করেন। কার্য্যবশে বিদেশে গেলে আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথের দিক্ নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। এবংবিধ পরমারাধ্য পিতা মাতার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেই হইবে। কেবল মুখের কথায় দুই একটী ধন্যবাদ দিলে উহা হয় না। সেই বরনীয় মাতা পিতা পরলোকে প্রস্থান করিলে ঊর্দ্ধ দৈহিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা কথঞ্চিৎ নিষ্কৃত হয় মাত্র। প্রতিদিন তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া কোন সৎকার্য্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আবার সেই জন্য পিতৃকুল ও মাতৃকুল অবশ্যই পূজার্হ। সেই জন্য উহাদেরও শ্রাদ্ধ ও তর্পণ বিধেয়। কেবল পিতৃ মাতৃকুলের তৃপ্তি সাধন করিলেই পর্য্যাপ্ত হয় না এজন্য দেব তর্পণ ঋষি তর্পণ, যম তর্পণ, প্রভৃতি বহুবিধ তর্পণ করিতে হইবে। যাঁহার নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া শান্তভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক অন্তিমে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাঁহারও তর্পণ করিতে হয়। উহাতে কেহই বাকি থাকেনা। শত্রু, মিত্র, পশু পক্ষি প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের তর্পণ করিতে হয়, এমন কি অন্য জন্মের বন্ধু বান্ধবাদির পর্য্যন্ত তর্পণ করিতে হয়। কাহারও বৈমুখ নাই। তর্পণের মন্ত্রাদিই তাহার প্রমাণ।

ব্রাহ্মণের অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়াই ভাবিতে হইবে

"অহং দেবো ন চান্যোস্মি ব্রহ্মবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোহং নিত্য মুক্ত স্বভাব বান্॥"

পরে যথারীতি অন্যান্য কার্য্য শেষ করিয়া অনাতুর ব্যক্তি প্রাতঃস্নায়ী হইবে। স্নান করিয়া আমিই কেবল তৃপ্ত ও বিশুদ্ধ হইব তাহা নহে, এজন্য স্নানাভ্যা তর্পণ করিতে হয়। পরে স্ব স্ব শাখোক্ত বিধানানুসারে সন্ধ্যাদি উপাসনা কাণ্ডের মধ্যে বা অন্তে সম্পূর্ণ রূপে তর্পণ করিতে হয়। উপাসনা দ্বারা চিত্তের পবিত্রতা উপস্থিত হয়, তখন তর্পণ দ্বারা আবার "সোহম্" ভাবটী চেতিত করিয়া দেয়। আমি কে? কোথা হইতে হইলাম, আবার অন্তিমে কোথায় যাইব? আমার মাতৃকুল ও পিতৃকুল কোথায়? সংসার-মোহ-চক্রে অতি অল্প দিনই অতিবাহিত করিতে হইবে, তর্পন এই সমস্ত কার্য্যের স্মারক। উহা নিত্য কর্ম্ম, অকরণে প্রত্যবায় হইয়া থাকে। প্রতিদিন শুচি হইয়া সংযত চিত্তে তর্পণ কার্য্য করিতে হইবে। তর্পণান্তে—

"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা কর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

বলিয়া প্রণাম করিতে হয়।

শ্রুতিতেও "পিতৃদেবোভব, মাতৃদেবোভব" ইত্যাদি বিস্তর আছে।

এরূপ ভক্তি কৃতজ্ঞতা, ও পরলোক শ্রেয়ঃসাধন কার্য্য সভ্য মাত্রের কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ বা আর্য্য জাতি ভিন্ন যবন, ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্ম প্রভৃতিগণ প্রতিদিন পিতৃ মাতৃ উদ্দেশে কিছু করিয়া থাকেন কি?

আর্য্যগণ কেবল স্বার্থোদর পরিপূর্ণ জন্য কোন কার্য্য করেন না। যথা সাধ্য পরের ভরণ পোষনান্তে যজ্ঞাবশেষ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেবল স্বার্থোদর পরিপূরণ তির্য্যগ্ জাতিই করিয়া থাকে, আর তত্তুল্য মানবাখ্যাধারী মোহ-মদমত্ত প্রাণিগণ করিয়া থাকে। তর্পণে যেমন উদার ভাব লক্ষিত হয় এরূপ অন্যান্য যজ্ঞেও হইয়া থাকে। এমন বিশ্বোদার সর্ব্বজনীন ভাব আর কোন জাতির নাই। তাহাদের মনেও স্থান পায় না। কিঞ্চিৎ অনুধাবনা করিলেই উহার প্রতীতি হইবে। তর্পন একটি যজ্ঞ। উহা করিতেই হইবে, না করিলে পাপ হয়, এইজন্য কাত্যায়ন ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে বলিয়াছেন—

"তস্মাদ্ সদৈব কর্ত্তব্য মকুর্ব্বন্মহতৈনসা।
যুজ্যতে ব্রাহ্মণঃ কুর্ব্বন্ বিশ্বমেতদ্বিভর্ত্তিহি"॥

নিত্যই তর্পণ করা কর্ত্তব্য, না করিলে মহৎ পাপ ঘটে। তর্পণ দ্বারা বিশ্ব সংসারের ভরণ হইয়া থাকে।

সূর্য্য তেজোময় পদার্থ। সূর্য্য ভিন্ন জগৎসৃষ্টি রক্ষিত হয় না। প্রাণিগণ জীবিত থাকিতে পারে না, ভক্ত সাধক পরমেশ্বরের তেজোময় বরণীয় ভাব সূর্য্য দৃষ্টেই কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারেন। সূর্য্য ভিন্ন সৃষ্টি প্রবাহের কীদৃশী দশা ঘটিত একটু চিন্তা করিলে অনেকেই অনুভব করিতে পারেন। আর্য্যগণ ব্রহ্মবলে উহা সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। বেদে সূর্য্য সম্বন্ধে বহুবিধ উপস্থাপন আছে উহাতে স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ। হোম করিতে সূর্য্যাদি দেবতার উপলক্ষ করিয়া অগ্নি পরিচর্য্যা করিতে হয়। উহা দৈব যজ্ঞ। স্ব স্ব গৃহ্য সূত্রে তাহার বিধান আছে। দেব পরিচর্য্যা দ্বারা ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের পরিস্ফূরণ হইয়া ক্রমশঃ দেব ভাব অন্তরে আবির্ভূত হয়, চিত্ত ও দেহ পবিত্র থাকে, সহজে চিত্তের তদ্গত ভাব হইয়া পরমেশ্বরে ভক্তি হয়।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি আর্য্য জাতির মত শিষ্ট, সভ্য, বদান্য, ও দয়ালু আর নাই। আর্য্যগণ স্বার্থোদর পরায়ণকে চিরকাল হীন বলিয়া জানিতেন। স্বার্থোদর পরায়ণ অহম্মুখগণ নিজের জন্যই ব্যস্ত। আর্য্যগণ নিজের জন্য ততদূর ব্যাকুল হইতেন না। ভূত যজ্ঞ তাহার একতর প্রমাণ। আমরা উপাদেয় আহারে রসনার ও উদরের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া সুখী হইব আর পশু পক্ষিগণ তাহার অংশ পাইবেনা ইহা উদার ও শ্রেয়স্কাম ব্যক্তির অন্তরে সহ্য হইবে না। সে সমদর্শী হইয়া প্রাণিমাত্রকে সদয়

নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। ইতর প্রাণীর সুখ দুঃখেও সুখ দুঃখ বোধ করিয়া থাকে, এই জন্য তাহাদিগকেও স্বপ্রস্তুত দ্রব্যের কিয়দংশ প্রদান করে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে আর্য্যজাতি গোসেবার জন্য অতি বিখ্যাত। গাভীর কোনরূপ অসুবিধা না হয় এই জন্য অনেকেই যত্ন করেন। এবং গো গ্রাস দান করেন। অনেকে মনে করিতে পারেন গো গ্রাস দান স্বীয় গোগণে দিলেই হইতে পারে, কিন্তু উহা হইলে স্বার্থপরতার উদাহরণ হয়, বাস্তবিক তাহা নহে—

"ঘাসমুষ্টিং পরগবে সান্নংদদ্যাত্তু যঃসদা।
অকৃত্বাস্বয়মাহারং স্বর্গলোকংসগচ্ছতি॥" মহাভারত।

পরের গোধনকে অন্নের সহিত ঘাস মুষ্টী প্রদান করিতে হইবে বরং উহা স্বীয় ভোজনের পূর্ব্বে সম্পাদিত হইবে। এইরূপ যাবতীয় প্রাণি দেহ বিরাজিত আত্মা, ভৌত বলিতে পরিতোষ লাভ করেন। যথাসাধ্য প্রাণি জাতির ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া যথারীতি স্বীয় বুভুক্ষার নিবৃত্তি করিতে হইবে, ইহা শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে। আমরা এ পর্য্যন্ত ইতর প্রাণিমণ্ডলের তৃপ্তি সাধনান্তর স্বতৃপ্তি লাভ করিতে হইবে এইরূপ বলিয়াছি। এখন আর একটী কথা বলিতেছি তাহা অতিথি সেবা।

নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্। অতিথি সৎকারকে নৃযজ্ঞ বলে। বিদেশীয় দূরদেশে উপনীত হইলে তাহাকে সমাদরে পরিগ্রহণ করিয়া যথাযোগ্য স্থান ও আহার প্রদান করিয়া বিশ্রান্ত করা মতিমান ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। আজ কাল সভ্যতারব ঘোষণ সময়ে অতিথি সেবা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। কারণ উহাদের গুরু স্থানে উহার প্রচল নাই। আবার শিবু বাবু অতিথি হইলে হয়ত এণ্টিমনি বাবু কিছুকাল আতিথেয় হইতে পারেন। এখনও বিল (Bill) করিয়া ভোজন ব্যয় চাহিতে সাহস পান না। ক্রমশঃ তাহাও হইবে। কিন্তু হরেকৃষ্ণ সাধু অতিথি হইলে প্রায়ই অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিতে হয়। আর্য্যশাস্ত্রে বা আর্য্যরীতি তদ্রূপ নহে, তাঁহারা অতিথির পূজা করিয়া পরে ভোজন করেন—

"সকেবলমঘংভুঙ্‌ক্তে যোভুঙ্‌ক্তে ত্বতিথিংবিনা।
অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ॥
ইন্দ্রিয় প্রীতিজননংবৃথাপাকং বিবর্জ্জেয়ৎ॥"

বিষ্ণুপুরাণ।

যে অতিথি বিনা ভোজন করে সে পাপ ভোজন করে। যে কেবল নিজেই ভোজন করে সেও পাপ ভোজন করে। ইন্দ্রিয়ের প্রীতিজনক বৃথাপাক পরিবর্জ্জন করিবে। অনেকে বলিতে পারেন কদাচিৎ অতিথি কর্ত্তৃক প্রতারিত হইতে দেখা গিয়াছে। কুচরিত্র লোক প্রচ্ছন্ন বেশে আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক পরস্ব অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতে পারে। সাবধানে থাকিলে ও এরূপ অনার্য্য ঘটনা হওয়া অসম্ভব নহে। তথাপি যদি কোন সময়ে কোন সাধু মহাজন উপস্থিত হন, তবে সে ক্ষতি পরিপূর্ণ হইয়া যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। সেই আশয়েও আতিথেয় কর্ত্তব্য। "সর্ব্বদেবময়েতিথি" ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। সৎসঙ্গের সঙ্গতি হইবে এবং প্রকৃতি অতিথির পরিতোষে আত্ম তুষ্টি লাভ হইবে, এই জন্যই আতিথেয় হওয়া নিত্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। ইহাতে যেমন ইহকালে যশোলাভ হয়, তেমন পরকালেও সুকৃতি জন্য স্বর্গভোগ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মযজ্ঞ— "অধ্যয়নং ব্রহ্মযজ্ঞ, বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদিকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলে। স্নান সন্ধ্যাদি উপাসনায় চিত্ত পবিত্র ও কোমল হয় সেই সময়ে সৎগ্রন্থাদিপাঠ করিলে ভক্তিভাবে চিত্ত বিষয় ছাড়িয়া ব্রহ্মভাবে তদ্গত হইয়া থাকে। কেহ বেদ কেহ গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ আবৃত্তি করিতে করিতে একান্ত পুলকিত হইয়া উঠেন। সম্প্রদায়িক মাত্রেই ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন ও করিয়াছেন। যাহারা বেদাদি শাস্ত্র উদাত্তাদি স্বর সংযোগে অর্থ জ্ঞান পূর্ব্বক পাঠ করিবেন তাহাদের পাঠ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে উত্তম পাঠক হইতে সকলেই যথা সাধ্য চেষ্টা করিবেন—

"ব্যাঘ্রী যথাহরেৎ পুত্রান্ দ্রংষ্ট্রাভ্যাং নচপীড়য়েৎ।
ভীতা তপন ভেদাভ্যাং তদ্বদ্বর্ণান্ প্রযোজয়েৎ ॥"

পাণিনীয়া শিক্ষা।

ব্যাঘ্রী যেমন স্বীয় সন্তান দিগকে মুখে করিয়া স্থানান্তরে লইয় যায়, দন্ত বেধন ও মুখ হইতে পতিত হইবে বলিয়া শঙ্কা থাকে। উভয় আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করে। বেদ পাঠক ও তেমন সতর্কভাবে বেদপাঠ করিবেন, কোন বর্ণ না পড়িয়া যায় ও স্বরব্যতিক্রম হইয়া বিদ্ধ না হয়, এইরূপ দৃষ্টি রাখিয়া বর্ণ প্রয়োগ করিতে হইবে।

"এবং বর্ণাঃ প্রয়োক্তব্যা নাব্যক্তা ন চ পীড়িতাঃ
সম্যগ্বর্ণ প্রয়োগেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥" পাণিনীয়া শিক্ষা

আরও কতকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া * বর্ণ প্রয়োগ করিবে। কোন বর্ণ অব্যক্ত থাকিবে না। অযথা উচ্চারণ করিয়া বর্ণ তাড়না করিতে হইবে না, সম্পূর্ণ রূপে উচ্চারণ করিতে হইবে। কোন বর্ণ অংশতঃ অনুচ্চারিত হইলে বর্ণের পীড়া করা হয়, সম্যগ্‌রূপে উচ্চারিত হইলে, ক্রিয়ার সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা ঘটে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং আধ্যাত্মিক সদ্-ভাবের পরিস্ফুরণ হয়, এইজন্য "ব্রহ্মলোকে মহীয়তে" এরূপ ফলশ্রুতি আছে।

গীতী, শীঘ্রী, শিবঃ কম্পী তথা লিখিত পাঠকঃ।
অনর্থজ্ঞোঽল্প কণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ॥ পাণিনীয় শিক্ষাবাক্য

গানভাবে পাঠ, শীঘ্র পাঠ, শিব প্রভৃতি অঙ্গের কম্পনাদি মুদ্রাদোষ দৃষ্ট না হইয়া পাঠ, লিখিত পাঠ, অর্থ না জানিয়া পাঠ, ও অল্পকণ্ঠস্বরে পাঠ, অধম পাঠকের কার্য্য।

এস্থলে আমাদের মত এইরূপ পাঠ করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে সম্পূর্ণ একশাখা মুখে আবৃত্তি করিতে অনেকেই সমর্থ হইবেন না, সুতরাং লিখিত পাঠ অধম কল্পের হইলেও পাঠ-বিরত কর্ত্তব্য নহে গ্রন্থ দেখিয়া সংযত মনে পাঠ করা কর্ত্তব্য। যিনি যত দূর আবৃত্তি করিতে সমর্থ তাহাও পাঠ করিলে পাঠ হইবে। অর্থজ্ঞান না জন্মিয়া থাকিলে পদচ্ছেদাদি বোধ দুষ্কর হয়, তথাপি যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিতে হইবে। স্বাধ্যায় অধ্যয়ন ব্যতীত ব্রাহ্মণত্ব থাকেনা। বেদের এক-নাম ব্রহ্ম, এইজন্য ইহাকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলে। বেদাদি অভ্যাস ও জপাদি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয় এই জন্যও ব্রহ্ম যজ্ঞবলে।

"মাধুর্য্য মক্ষর ব্যক্তি পদচ্ছেদস্ত সুস্বরঃ।
ধৈর্য্যংলয় সমর্থংচ ষড়েতে পাঠকাগুণা॥"

মাধুর্য্য, অক্ষর ব্যক্তি, পদচ্ছেদ, সুস্বর, ধৈর্য্য ও লয় সমর্থ হওয়া পাঠ কালে এই গুণের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন আরও কতক-গুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ব্যাকরণ, শিক্ষা গ্রন্থ ও প্রাতি-শাখ্য ও গুরুপদেশের প্রতি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

* শিক্ষা বাক্যে আছে বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

বেদ প্রথমাবধি যথা শক্তি অধ্যয়ন করিবে। অথবা জপ করিবে।

"বেদমাদিত আরভ্য শক্তিতোঽহরহর্জপেৎ॥

কাত্যায়ন

স্বাধ্যায়ন্ত যথাশক্তি ব্রহ্মযজ্ঞার্থ মাচরেৎ।

"ঋচাঞ্চ যজুষাং সাম্নাং গাথাগুহ্যমথাপিবা॥

আদাবারভ্য বেদস্ত স্নাত্বোপর্য্যপরিক্রমাৎ।

যদধীতে হ্যহরহং ভক্ত্যা স স্বাধ্যায় ইতিস্মৃতঃ॥"

ব্রহ্ম যজ্ঞার্থ যথাশক্তি স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিবে। ঋক যজু সাম রহস্য (উপনিষদ্) ও গাথা প্রভৃতি প্রতিদিন ভক্তি পূর্ব্বক অধ্যয়ন করাকে স্বাধ্যেয় বলে। হলায়ুধ বলেন যত দিনে পারা যায় প্রথম বিধি-ক্রমে সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিবে। যাহারা সম্পূর্ণ বেদাধ্যয়ন করে নাই তাহারা অধীত বেদাংশ যথাশক্তি পুরণ স্তবাদি পাঠ করিবে।

যাবদ্ভির্দ্দিবসৈঃ শক্নোতি তাবদ্ভির্দ্দিনৈঃ কৃৎস্নং বেদং পঠেৎ। অনধীত কৃৎস্ন বেদস্ত বেদ পুরাণ স্তবাদিকং যথা শক্তি পঠেৎ। হলায়ুধ।

ফল কথা অধ্যয়ন করিতেই হইবে।

অধস্তন কৌথুম্ শাখীর পদ্ধতি কার অনিরুদ্ধভট্ট "একামৃচমেকম্বাযজুরেকম্বা সামাভিব্যহবেদিতি মুনি বচনোনুসারে প্রণব ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী পাঠানন্তর চতুর্ব্বেদের আদি মন্ত্র চতুষ্টয় (কৌথুম, কাণ্ব ও আশ্বালায়ন শাখাদির) লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে উহাই সমধিক প্রচলিত। সামগ গণের ব্রহ্মযজ্ঞ গোভিল ও কাত্যায়নের প্রথা অনুসারে হইয়া থাকে। কৌথুম শাখিগণের গৃহ্য কর্ম্ম মহামুনি গোভিল মতানুসারে হইবে। কাত্যায়ন গোভিলেরই পরিশিষ্ট। সামগণের বৈশ্ব দেবাবসানে বাম দেব্য গানরূপী ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে পারে। অর্থাৎ বাম দেব্য সামগান করিলে ও ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে পারে, বাম দেব্যগান ছন্দ আর্চ্চিকে ও মহাবাম দেব্য সাম উত্তরার্চ্চিকে আছে।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি কেবল নিজের পবিত্রতার জন্য আর্য্যগণ বদ্ধপরিকর ছিলেন না। যেহেতু বেদাভ্যাস করিতে হইবে ইহা মাত্রই কর্ত্তব্য নহে, শিষ্যদিগকে অভ্যাস ও করাইতে হইবে। এইজন্য বেদাভ্যাস পাঁচভাগে বিভক্ত—

"বেদস্বীকরণং পূর্ব্বং বিচারোঽভ্যসনং জপঃ।
তদ্দানঞ্চৈব শিষ্যেভ্যো বেদাভ্যাসোহিপঞ্চধায়॥
প্রথমতঃ বেদস্বীকার, বেদার্থ-বিচার, অভ্যাস, জপ এবং শিষ্যদিগকে তাহা দান করিতে হইবে।

ব্রহ্মগ্রন্থ বিচার, আলোচনা ও পাঠাভ্যাস দ্বারা চিত্তে ভক্তি ভাব হয়, আচার্য্যের উপদেশে ঐ ভক্তি পথে বিচরণ করিয়া জ্ঞানরত্ন বিভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ বেদান্ত হইতে আর সাধুগ্রন্থ এই পৃথিবীতেই নাই। সাধু ও সৎগ্রন্থ পাঠে অশেষ শ্রেয়ঃসাধন হইবে তাহাতে কাহার ও আপত্তি নাই এইজন্য মহা মুনি কাত্যায়ন ব্রহ্মযজ্ঞের অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন—

"নব্রহ্মযজ্ঞাদধিকোস্তি যজ্ঞে।
নতৎপ্রদানাৎ পরমস্তিদানম্
সর্ব্বে তদন্তাঃক্রতবঃ সদান।
নান্তো দৃষ্টঃ কৈশ্চিদস্যাদ্বিকস্য॥"

মনুসংহিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৎপর, এখন আমরা দেখিব যে, মন্বাদি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণকে, যে পাপের জন্য যে দণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছেন, শূদ্রাদি জাতিদিগেরও সেই পাপের জন্য সেই একই রূপ দণ্ডবিধান না করিয়া অন্যরূপ অপেক্ষাকৃত অনেক লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন কেন? যাহা পাপ তাহা সকলের পক্ষে অনিষ্ট-দায়ক হইবে না কিসে?

এই প্রশ্নটীর মীমাংসা করিতে হইলে শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি জাতি সম্বন্ধে কিরূপ লক্ষণ করিয়াছেন তাহা বিচার করা আবশ্যক। যদিও এসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই আমরা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, তথাপি আরও বিষয়টী বিশদ ও প্রামাণ্য করিবার জন্য এখানে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। শাস্ত্র বলেন,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

এখন ভগবান মনুদেব গুণের এইরূপ লক্ষণ করিলেন,—

"সত্ত্বংরজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাদাত্মনো গুণান্।"

মনুসংহিতা।

গীতাতেও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহাই বলিয়াছেন,—

"সত্ত্বংরজস্তমইতিগুণান্ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহি দেহিনমব্যয়ম্।

গীতা।

সুতরাং, ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের বিভাগ ক্রমেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র] এই চারি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। সত্ত্বগুণ হইতে ব্রাহ্মণ, রজগুণ হইতে ক্ষত্রিয়, রজ ও তমের বিমিশ্রণে বৈশ্য এবং তমগুণ হইতে শূদ্রের উদ্ভব ইহাই শাস্ত্রের মত। এখন শাস্ত্র এই তিন গুণের কিরূপ লক্ষণ করিলেন দেখুন,—

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভএব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেবচ॥ গীতা।

তৎপর কথিত গুণত্রয় যুক্ত ব্যক্তিগণের এইরূপ লক্ষণ করিলেন,—

" প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যেভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥
অভিসন্ধ্যায় তু ফলং দম্ভার্থমপিচৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরত শ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥
পৃথক্ত্বেনতু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানম্ বিদ্ধি রাজসম্॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রীচ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥

গীতা।

অতএব, ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শাস্ত্রে তামস প্রকৃতি শূদ্রের যেরূপ লক্ষণ করিলেন, তাহাতে ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত যে শূদ্রাদি জাতি, তাহাদের স্বতন্ত্র কোন পাপ আছে বলিয়া বোধ হয় না, কারণ উহারাই পাপের মূর্ত্তি। এখন এই চারি জাতির কার্য্য বিচার করিয়া ভাগবতে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবং।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণং॥
শৌর্য্যং বীর্য্যংধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্র লক্ষণং।
দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তির্মিত্রবর্গপরিপোষণং।
আস্তিক্যমুদ্যমোনিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণং॥
শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞোহ্যস্তেয়ং সত্যংগো বিপ্র রক্ষণং॥

শ্রীমদ্ভাগবৎ।

গীতাতেও ভগবান্ অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
শৌর্য্যং তেজোধৃতি র্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চ অপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবঞ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
কৃষিগোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাদি স্বভাবজম্॥

মনুও এই কথাই বলেন,—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥
প্রজানাম্ রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েষু প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিক্‌পথং কুশীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ।
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুকর্ম্ম সমাদিশন্।
এতেষামেবচ বর্ণানাং শুশ্রূষানন্যুস্য়সা।

সুতরাং শাস্ত্র ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির যাহা লক্ষণ করিয়াছেন তাহা আমরা পরিষ্কার রূপেই বুঝিলাম। এখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, শাস্ত্র যে সমস্ত বিধি নিষেধ ও শাসনাদি করিয়াছেন তাহা কথিত "চারি লক্ষণাক্রান্ত" জাতির উপরই করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা ঐরূপ গুণযুক্ত তাঁহাদের উপরই মাত্র শাস্ত্রকর্ত্তাদের আদিষ্ট বিধি নিষেধাদি বর্ত্তিবে। যাঁহারা এই চারি লক্ষণের বহির্ভূত ও সমাজ বহির্ভূত তাঁহাদের উপর কোন আদেশ বিধি নাই।

এখন, মনে করুন শূদ্রদিগকে শাস্ত্রে যেরূপ লক্ষণে ভূষিত করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদির অনমুষ্ঠেয় ভীষণ পাপও অতি লঘু পাপ বলিয়া গণ্য হইত। প্রকৃত পক্ষেই পুরাকালে শূদ্রদের মধ্যে সুরাদি নিত্য পানীয় মধ্যে ছিল। ব্যভিচার, সুরাপান, কদাচার, কুৎসিত আহার, প্রভৃতি অন্যান্য জাতির অকর্ত্তব্য যাহা, তাহা উহাদের নিত্য কর্ত্তব্য মধ্যেই ছিল। বর্ত্তমান সময়েও ঐরূপ এক শ্রেণীর লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এখন মনে করুন যাহারা নিত্য সুরাপায়ী, তাহাদের উপর হঠাৎ একবারেই যদি আইন করা যায়, যে, তাহারা ঐরূপ দোষ করিলেই একবারে প্রাণবধ করা হইবে, আর সেই আইন যদি কঠিনভাবে পরিচালন করা যায়, তাহা হইলে, এই অসংখ্য সূদ্রবংশের কয়জন জীবিত থাকিত? প্রায় সমস্ত শূদ্র জাতিকেই আইনের তীব্র শাসনে মানব লীলা সম্বরণ করিতে হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণের যাহা লক্ষণ করিলেন তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে ওরূপ দোষ হওয়াই

একরূপ অসম্ভব; সুতরাং নিয়মও কিছু কঠোর করিলেন। কারণ, যে সম্প্রদায় আধ্যাত্মিক রাজ্যের উচ্চসোপানে দণ্ডায়মান হইয়াছে, সে যদি হঠাৎ ঐরূপ কোন দোষাশ্রিত হয়, তাহা হইলে একবারেই তাহার অধঃপতন হইবারই সম্ভব। কিন্তু শূদ্রের ত সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই। কেননা পাপই উঁহাদের কার্য্য। সুতরাং তাহাদের আধ্যাত্মিক অধঃপতনের কোন আশঙ্কা নাই। আমাদের শাস্ত্র যাহা কিছু বিধি নিষেধ করিয়াছেন সে সমস্তই অধ্যাত্মের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া, বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় সাংসারিক ভাবে তাঁহারা কোন শাসনাদি করিয়া যান নাই। সুতরাং যাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে অক্ষম কেবল তাঁহারাই ঋষিদের দোষারোপ করিবেন। কিন্তু অন্তসারবান অধ্যাত্মদর্শীগণ তাঁহাদের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিয়া ঋষিদের চরণে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য যে শূদ্র মাত্রেই যে ঘোর তামসিক ছিলেন তাহা নহে। শূদ্র মধ্যেও সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন শ্রেণীর লোক আছে। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র সকল বর্ণের মধ্যেই ঐ তিন শ্রেণীরই লোক আছে। শাস্ত্র ব্রাহ্মণকে আবার দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শাস্ত্র আরও বলেন যে ঐ তিন গুণের ক্রিয়া অনুসারে মনুষ্য প্রতিক্ষণে কখন ব্রাহ্মণ, কখন ক্ষত্রিয়, কখন বৈশ্য ও কখন শূদ্র হইয়া পড়েন। সত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের মহিমা যাঁহারা অবগত হইতে পারেন, তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্যও অতি সহজ বোদ্ধ ও সুগম হয়। আমাদের, ক্রমান্বয়ে সত্ব, রজ ও তমের কার্য্য ও গুণাগুণ অতি বিস্তার মতে আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

দিনকৃত্য।

(প্রাতরুত্থান)

আমাদিগের চিন্তাশীল শাস্ত্রকারগণের যেরূপ চতুরস্র দৃষ্টি ছিল, সেরূপ পৃথিবীতে অদ্যাপি অন্য কোন জাতির হয় নাই। তাঁহাদিগের শাস্ত্রীয় শাসনের প্রতি দৃষ্টি করিলে অনায়াসে প্রতীয়মান হইবে যে, তাঁহাদিগের দৃষ্টি কখন এক পক্ষপাতিনী ছিল না। তাঁহারা এই সংসারকে নশ্বর ও পরলোককে সার জানিয়াও কখন ইহ জীবনকে ভুলিয়া ছিলেন না। মহর্ষিগণ মুক্তিমার্গের অনুসন্ধিৎসু হইয়াও কর্ম্মকাণ্ডকে পদদলিত করিয়াছিলেন না। আর্য্য আচার্য্যগণের ধর্ম্মলিপ্সা বলবতী থাকিলেও অর্থ ও কাম একবারে বিসর্জ্জিত হইয়া ছিল না। মনস্বি মুনিগণ পরকালের প্রতি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া পশু সুলভ কেবল ঐহিক সুখে আসক্ত এবং "আত্মানাং সততং গোপা-য়ীত" ইত্যাদি শ্রুতির প্রতি শ্রুতিপাত না করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র কেবল বৈরাগ্য লইয়া ব্যস্ত ছিলেন না। শ্বাপদ ও শান্ত মৃগকুলের ন্যায় অবিরোধে তদীয় চিত্তক্ষেত্রে ভোগ বাসনা ও যোগ পিপাসা বাস করিত। পূর্ব্বপুরুষগণ দূরদর্শী ও সামঞ্জস্য পরায়ণ ছিলেন। তাঁহারা ক্ষমতাশালী হইয়াও ক্ষমাবান্, নিস্পৃহ হইয়াও কাম্যকর্ম্ম-পরায়ণ এবং ধর্ম্মপ্রাণ হইয়াও সংসারী ছিলেন। মহর্ষিগণ অবস্থা বা অধিকারী ভেদে যে উভয় লোকের অবিরোধী অক্ষুণ্ণ সুখোপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের দিনকৃত্য বিধি পর্য্যা-লোচনা করিলে অনায়াসে অবগত হইবে। আমরা সেই সব বিধি ও নিষেধের অর্থগ্রহে ও অনুষ্ঠানে অপারগ হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের মুখ দর্শনে ক্রমে যে বঞ্চিত হইতেছি, ইহা একবার স্বপ্নেও ভাবি না।

মহর্ষিগণ একান্ত নিয়ম ও সময় পরতন্ত্র ছিলেন, ভ্রমক্রমেও যদৃচ্ছাচারে সময় যাপন করিতেন না। যদ্রূপ সময়ের বিভাগ করিয়া আশ্রম সেবনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদ্রূপ ক্ষুদ্র দৈনিক জীবিত কালের বিভাগ ক্রমে কার্য্য বিধি বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। সেই দিনকৃত্য আমাদিগের আলোচ্য। তন্মধ্যে অদ্য প্রাতরুত্থান সম্বন্ধে আলোচিত হইবে। দিন শব্দের অর্থ, সাবন বাসর বা সূর্য্যের উদয়াবধি অপর উদয় পর্য্যন্ত অষ্টপ্রহরাত্মক কাল।

মহর্ষি দক্ষ চতুঃ প্রহরাত্মক দিনকে আট ভাগ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কার্য্যবিধান করিয়াছেন এবং ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ও প্রদোষ কালকে রাত্রির বহির্ভাব করিয়া শাস্ত্রকারগণ পৃথক্ প্রকারে তাহারও রাত্রির কৃত্যের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যথা দক্ষ—

"প্রাতরুত্থায় কর্ত্তব্যং যদ্দ্বিজেন দিনে দিনে।
তৎ সর্ব্বং সংপ্রবক্ষ্যামি দ্বিজানাং হিত কারকম্॥
দিবস্যাদ্যভাগে তু কৃত্যং তস্যোপদিশ্যতে॥
দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ চতুর্থে পঞ্চমে তথা।
ষষ্ঠে চ সপ্তমে চৈব অষ্টমে চ পৃথক্ পৃথক্॥

আর্য্যগণ জানিতেন,

"রাত্রিঃ স্বপ্নায় ভূতানাং চেষ্টায়ৈ প্রাণিনামহঃ।"

মনুসংহিতা।)

নিদ্রা বা বিরামের জন্যই রজনী এবং কর্ম্মভূমিতে অবতীর্ণ মানবকুলের কর্ম্মকালই দিবা। সুতরাং রাত্রির প্রথম প্রহরার্দ্ধ ও শেষ প্রহরার্দ্ধকে দিনের মধ্যে নিবেশ করিয়া প্রহর ত্রয়াত্মক রাত্রির 'ত্রিযামা' নাম সমন্বয় করিয়াছেন।

"ত্রিযামাং রজনীং প্রাহু স্ত্যক্তাদ্যন্ত চতুষ্টয়ম্॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

প্রহর চতুষ্টয়াত্মক রজনীর শেষ প্রহরে চিন্তাশক্তির যেরূপ বিকাশ হয়, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রের অগোচর নাই। মনস্বী মহাকবি কালিদাসও বলিয়াছেন।—

"পশ্চিমাদ্ যামিনী যামাৎ প্রসাদ মিব চেতনা।"

ইহার ভাব—নিশার শেষ প্রহর হইতে বুদ্ধি প্রসাদকে পায়।

কর্ম্মনিষ্ঠ ও চিন্তাশীল আর্য্য আচার্য্যগণ সেই সুসময়কে ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা সেই শেষ প্রহরের শেষার্দ্ধকে ব্রাহ্ম ও রৌদ্র মুহূর্ত্ত নামে অভিহিত করিয়া তাহাতে জাগ্রত হইয়া নিত্য বিভীষিকাময় ভাবি দিনের কল্যাণ কামনায় সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয়কারী ভগবান, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের এবং

বিবিধ শক্তির অধিপতি, ভগবতীর ও মানব জীবনের অধিনেতৃ গ্রহগণের মাহাত্ম্য চিন্তা ও তদীয় নিকটে প্রার্থনা করিবার এবং গুরুদেবের স্মরণ ও প্রণামের ও অলৌকিক চরিত্র মহাজনগণের নামোচ্চারণের ব্যবস্থা বন্ধন করিয়া গিয়াছেন *। ক্রমে সেই সব বিষয়ের বর্ণনা করা যাইতেছে।

"রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম্য উচ্যতে।"

পিতামহ।

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্মরেদ্দেববরানৃষীন্।
ব্রহ্মা মুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী,
ভানুঃ শশী ভূমি সুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাহু কেতু,
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥"

বামন পুরাণ।

উক্ত বামন পুরাণীয় বচনের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগ্রত হইয়া দেবাদিদেব ব্রহ্মাদি ও ঋষিপ্রবরবর্গকে স্মরণ ও দেবতাগণের নিকট মঙ্গল কামনা করিতে হইবেক। এই স্মরণ শব্দের অর্থ—চিন্তা বা তাঁহাতে মনের একাগ্রীকরণ,—নাম কীর্ত্তন নহে।

"চিন্তা, ধ্যানম্, মনসঃ তদেকাগ্রীকরণম্।"

বিশ্বনাথ।

---

* প্রগাঢ় নিদ্রার সময় মানবীয় প্রবৃত্তি সমূহ বাহ্য বিষয় হইতে আকুঞ্চিত ও সংহৃত হইয়া অল্পাবস্থায় অবস্থিত করে। তৎপরে নিদ্রাভঙ্গ হইলেই ঐ সমস্ত প্রবৃত্তি সমূহ নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য পথে সম্প্রসারিত হইয়া ছুটিতে থাকে। তখন বুদ্ধিও মনের অবস্থা যেরূপ থাকিবে সেইরূপ ভাবেই প্রবৃত্তি সকল কার্য্য করিতে আরম্ভ করিবে। মনে সাত্ত্বিক ভাবের আধিক্য থাকিলে বৃত্তিবর্গ সাত্ত্বিক ভাবেই কার্য্য করিবে, কিংবা রজ বা তম ভাবের আধিক্য থাকিলে তদ্রূপই ক্রিয়া করিবে। সুতরাং সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় যে সাত্ত্বিক ভাব উদ্দিপনের জন্ম সাত্ত্বিকভাব পরিস্ফুরক ক্রিয়া সকল করাই বিধেয়; সেইজন্যই সর্ব্বদর্শী শাস্ত্র কারগণ উল্লিখীতরূপ নানাবিধ উপায় উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। বে সং

আবার অনেকেই উক্ত দেবগণের নাম কীর্ত্তন মাত্র করিয়া শাস্ত্রীয় শাসনের সার্থক্য বোধ করেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। স্মরণ বলুন, বা ধ্যান বলুন, সর্ব্বত্র মানসিক ব্যাপারের আবশ্যকতা। স্মৃ ও ধ্যৈ ধাতু হইতে স্মরণ ও ধ্যান পদ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগের অর্থ—চিন্তা। তবে স্থান বিশেষে নাম কীর্ত্তনের প্রয়োজনও আছে।

আর্য্যগণ বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, সংসার পাপ ও দুঃখে পরিপূর্ণ। যাহাতে উক্ত উভয়বিধ শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকা উচিত। এই জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে পদ প্রক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে উক্ত দেবতাগণের ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ সংশয় মগ্ন কালের কুশল কামনায় প্রার্থনার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ভগবানের মাহাত্ম্য একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিয়া শুভ প্রার্থনা করিলে উপস্থিত দিন অবশ্যই সুখে অতিবাহিত হইবার সম্ভব; বিশেষতঃ মনোমধ্যে সেই আধ্যাত্মিক ভাব আবির্ভাব হইলে কখনও পাপ-পথে প্রবৃত্তি যাইবে না। এক সময়ে রাবণ বলিয়াছিলেন—

> "কর্ত্তু শ্চেতসি পুণ্ডরীক নয়নং
> দূর্ব্বাদল শ্যামলং, তুচ্ছং
> ব্রহ্মপদং ভবেৎ পরবধু সঙ্গং
> প্রসঙ্গঃ কুতঃ॥"

যখন বিশ্বাস বান্ মনুষ্য ভগবানের ভাবনা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল; তখন তাহার উৎসাহ ও ধর্ম্মসহকারে কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক উপকার লাভে সুবিধা না হইয়া পারে না।

এইক্ষণ এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, শয্যোত্থান কালে লোকে বিশেষ করিয়া দুর্গা স্মরণ কেন করে? তাহার উত্তরে আমরা বলি, দুঃখ দূর করিবার জন্যই আদ্যাশক্তির মর্ত্ত্যে আবির্ভাব। তজ্জন্য তাহার নাম দুর্গা (দুঃ—দুঃখাৎ গা—গময়তি-উদ্ধরতি বা, গমের্ডঃ)। কেবল দুর্গা সুর বা দৈত্যকুল ধ্বংসের দ্বারা ঐহিক দুঃখ দূর করিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি দুর্গা; অন্য কিছু করিতে পারেন না, এমত নহে, তবে আদ্যাশক্তির দুর্গা মূর্ত্তি ধ্যানের ঐ টুকুই বিশেষত্ব। যেরূপ দুঃখ হউক্, তাহা দূর করিবার জন্য আপৎ সঙ্কুল সংসারে কর্ম্মারম্ভের প্রথমে লোকের পক্ষে দুঃখ হারিণী

জগম্মাতার স্মরণ করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্তই মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"দুর্গে স্মৃতাহরসি ভীতি অশেষ জন্তোঃ।"

তৎপর মনুষ্য জীবনের মঙ্গলা মঙ্গল, সময়ে গ্রহগণের উপর নির্ভর করে, এই জন্যই অগ্রে শুভ কামনায় তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। যে কারণে সূর্য্যাদি গ্রহদেবতাগণের মানব জগতে আধিপত্য আছে; তাহা আমরা অবসরে বলিব। এই প্রস্তাবে বলিতে গেলে বৈসাদৃশ্য হইয়া পড়ে।

মানব জীবনে সমুদায় শুভের বীজ বপন যিনি করিয়াছেন, ও যাঁহার উপদেশ সর্ব্বদা মনে রাখিয়া সংসারে চলিতে হইবেক, প্রভাতে সেই গুরু ও উপদেশ দান কালীন তদীয় প্রসন্ন বদনকে (সুতরাং উপদেশ) নাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক স্মরণ ও প্রণাম করিবে।

"প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
প্রসন্ন বদনং শান্তং স্মরেত্তন্নাম পূর্ব্বকম্॥"

তৎপর পাঠ করিয়া প্রণাম করিবেক।

"নমোস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেব স্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতংহন্তি বিষং সংসার সংজ্ঞকম্॥"

তাহার পর আত্মাকে ব্রহ্মরূপী ভাবিবেক্।

"অহং দেবোনচান্যোহস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোহস্মি নিত্য মুক্ত স্বভাব বান্॥"

স্মৃথস্তু।

মনুষ্য কেবল আপনাকে নিত্য মুক্ত স্বভাব ও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভাবিয়া চরিতার্থ হইবে, তাহা নহে। কিন্তু সে জ্ঞানময় বিষ্ণুরূপী (বিশ্বব্যাপক) জগদীশ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তদীয় প্রীতি সম্পাদনার্থ ধর্ম্মভাবে সমুদায় সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে এবং সেই ধর্ম্মাধর্ম্মের মর্ম্ম জানিয়া কর্ত্তব্য কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়া হৃদয় স্থিত হৃষীকেশ (ইন্দ্রিয়াধিদেব) কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া সমুদায় করিতেছে, এইরূপ আত্মদোষ ক্ষালন পূর্ব্বক আধ্যাত্মিক ভাবে সংসার যাত্রায় পাদন্যাস করিবে।

যথা স্মৃতি—

" লোকেশ চৈতন্য ময়াধি দেব,
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ স্মরামি তব প্রিয়ার্থং,
সংসার যাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে॥"

" জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তির্জানাম্য
ধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় শাসন পুঞ্জের দ্বারা প্রতীয়মাণ হইতেছে যে, আর্য্য সন্তানগণের সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী শেষ প্রহরার্দ্ধে জাগিয়া দেবতাগণ ও নর চরিত্রের আদর্শ স্বরূপ নলাদি মহাজনগণের মহিমা হৃদয় মধ্যে অবধারণ করিতে হইবে, এবং গুরুদেব ও তদীয় উপদেশ মনে করিয়া ভগবানের প্রতি আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক আধ্যাত্মিক ভাবে ও অনাসক্ত হৃদয়ে সাংসারিক কার্য্য আরম্ভের জন্য পদ প্রক্ষেপ করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা ইহাই লাভ হইল যে মনুষ্য প্রত্যহ এইরূপে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাবিরুদ্ধ অর্থ ও উভয়াবিরোধী কাম উপার্জ্জন করিয়া ইহলোকে বিমল সুখ ও পরলোকে অতুলগতি লাভ করিতে পারিবে। আর্য্যগণের এই অভিপ্রায় পরে পরিস্ফুটিত ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণ—

" প্রবুদ্ধ শ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্ম মর্থঞ্চাস্যা বিরোধিনম্।
অপীড়য়া তয়োঃকাম মুভয়োরপি চিন্তয়েৎ॥"

জাগিয়া ধর্ম্মার্জ্জনের উপায় ও ধর্ম্ম সমন্বিত অর্থোপার্জ্জনের পথ চিন্তা করিবে এবং ধর্ম্মনষ্ট ও অর্থ অপব্যয় যাহাতে না হয়, এইরূপ কাম বা বিষয় সুখের ও অনুসরণ করিবে।

মহর্ষিগণ বেশ বুঝিয়াছিলেন, আধ্যাত্মিক ভাবে ও অনাসক্ত হৃদয়ে যে অর্থ ও কাম উপার্জ্জন করে, সেই সুখ রসাস্বাদের প্রকৃত অধিকারী। বিষয় কীট ও স্বার্থের ভৃত্য আমরা তাহা বুঝিতে পারি

না; সেই জন্যই এত কষ্ট। একবার আর্য্য শাসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন,—

" ন জাতু কামঃ কামানা মুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষাকৃষ্ণ বর্ত্মে'ব ভূয়এবাভি বর্দ্ধতে ॥ "

মনুসংহিতা।

ভারতবর্ষরাজ দিলীপ প্রভৃতি ও অনাসক্ত হৃদয়ে সুখভোগ করিতেন।

" অসক্তঃ সুখমন্বভূৎ। "

রঘুবংশ।

এইরূপে মনুষ্য জাগ্রত হইয়া দৈনিক কর্ত্তব্যাব ধারণ করিয়া সর্ব্ব সহায়া ধরিত্রী মাতার ক্রোড়দেশে " প্রিয়দত্তায়ৈ ভূবে নমঃ " ইহা বলিয়া দক্ষিণ চরণ ন্যাস পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইবে। কার্য্যারম্ভের প্রথমেই এই আধ্যাত্মিক ভাবের পরিচয়!

নল প্রভৃতি রাজর্ষিগণের নাম কীর্ত্তনেরও যে প্রয়োজন আছে, তাহা পরে বলা যাইবে।

ক্রমশঃ

২য় ভাগ। সন ১২৯৪ সাল। ১০ম খণ্ড।

পূজনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রচার কার্য্য।

আমাদের স্মরণ হয় যেন ইংরাজী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে পরমহংস-দেব তাঁহার প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। ইতিপূর্ব্বে কেশব বাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহার প্রকৃতির এই একটি আশ্চর্য্য ভাব ছিল, যে, তিনি কোন ব্যক্তির সাধুতার পরিচয় পাইলে বিনা আহ্বানে উপযাচক হইয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া আসিতেন। লোক মুখে কেশব বাবুর নানারূপ গুণ গ্রামের কথা শুনিয়া তিনি একদিন অকস্মাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। এই প্রথম সাক্ষাতেই তিনি কেশব বাবুর হৃদয় আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কেশব বাবুর মত একজন "নবধর্ম্মপ্রবর্ত্তক" ও তাঁহার সরল অথচ গভীরভাবপূর্ণ উপদেশে মুগ্ধ হইয়া যান। এবং পরে কেশব বাবুই তাঁহার প্রচার কার্য্যের প্রধান সহায়ক হন এবং তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র ক্রমে বিস্তৃত করিয়াদেন।

তিনি নানাস্থানের বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং আপামর সাধারণ লোকদিগকে ভক্তিপূর্ণ উপদেশাদি দিয়া মোহিত করিতে লাগিলেন। তিনি সকল সম্প্রদায়ের সহিত সমভাবেই মিশিতেন। ব্রাহ্ম তাঁহাকে পরম ব্রহ্মজ্ঞানী ভাবিয়া সাদরে মস্তক অবনত করিত, বৈষ্ণব, তাঁহাকে বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি জ্ঞানে, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিত, শাক্ত তাঁহাকে একমাত্র শক্তিরই উপাসক বোধ করিয়া বিশেষ সম্মান করিত, বৈদান্তিক তাঁহাকে একমাত্র প্রণব মন্ত্রের সাধক জ্ঞান করিয়া তাঁহার অশেষ গুণানুকীর্ত্তন করিতেন। এইরূপ তাঁহাকে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক নিজ দলভুক্ত ভাবিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। সুতরাং প্রকৃত সিদ্ধভক্তের যাহা কিছু লক্ষণ তাহা তাঁহাতেই দেখা যাইত। তিনি কখন কোন সম্প্রদায় অথবা মতকে ঘৃণা বোধ করিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, যেমন একোয়া, ওয়াটার, পানি, জল, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে বলিলেও, যেমন এক জলকেই বুঝায়, তেমনি, গড্, ঈশ্বর, আল্লা প্রভৃতি নামে ডাকিলেও সেই একই ঈশ্বরকেই ডাকা হয়। কিন্তু যেমন, জল পান না করিয়া কেবল মুখে ওয়াটার প্রভৃতি নানা নামে ডাকিলেও তৃষ্ণা দূর হয় না, সেইরূপ অন্তর বাহিরে ঈশ্বর দর্শন পূর্ব্বক অনুরাগের সহিত না ডাকিয়া কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করিলে কোন ফলই দর্শে না। পরমহংসদেবের উপদেশে অতি সুন্দর মাধুর্য্য ছিল। তিনি অতি গভীর বিষয় সকল, যাহা নানা দর্শন বিজ্ঞান দ্বারা বুঝান সুকঠিন হইয়া উঠে, তাহা সামান্য২ দৃষ্টান্ত দ্বারা অতি সরল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। শত শত লোকের মধ্যে বসিয়া তিনি দুই একটি এরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন যাহাতে সমবেত সমস্ত লোকেরই জিজ্ঞাস্য সন্দেহ সকল মিটিয়া যাইত। অতি কঠোর নাস্তিকেরাও তাঁহার সহবাসে আত্মজ্ঞানলাভ করিত। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল। অতি পাষণ্ড কদাচারী কদাহারী নাস্তিকদল আসিয়া ক্রমেই তাঁহার শরণাপন্ন হইতে লাগিল। তিনি তাহাদের দেখিলে বড়ই যত্ন করিতেন এবং আশ্বাস বাক্যে পরিতুষ্ট করিতেন। তন্মধ্যে এমন কএকজনকে আমরা জানি, যে, তাঁহাদের সংসারে অকার্য্য কিছুই ছিল না, পশুরও যাহা অকর্ত্তব্য মনে হয় তাহাও তাঁহাদের দ্বারা অবলীলা ক্রমে

সাধিত হইত; এরূপ ভয়ঙ্কর পাষণ্ডদলও তাঁহার আশ্রয় পাইয়া অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে। এখন তাঁহাদের চিনিয়া উঠা ভার। তন্মধ্যে কেহ কেহ আবার ইহ জীবনের মত সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া একবারে কঠোর সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষকে বোধ হয় বাঙ্গালী মাত্রেই জানেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব চরিত্রের বিষয়ও অনেকে অবগত আছেন। তিনি সংসারে পাপ বলিয়া একটা কিছু আছে তাহা বিশ্বাস করিতেন না। এখন সেই গিরিশ বাবুকে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কেবল মাত্র পরমহংস-দেবের কৃপায় তিনি নবজীবন লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই মুখে তাঁহার অদ্ভুতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। তিনি বলেন, যে, পরমহংসের সহিত আমার এক একদিনের মিলন আমার হৃদয়ে এক একটি করিয়া যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। গিরিশ বাবুকে সাধারণে জানেন বলিয়াই তাঁহার নাম উল্লেখ করিলাম। কিন্তু এরূপ যে কত পাপী উদ্ধার পাইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। সেই জন্যই আমরা বলি কেবল মানুষের ক্ষমতায় কি এত সম্ভবে?

১২৯১ সালের আষাঢ় মাস মানব ইতিহাসের একটি যুগান্তর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শতাব্দির পর শতাব্দি হইতে ভারতবর্ষ বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ ও যবনের ঘোর অত্যাচারে ধর্ম্মহীন মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল, ধর্ম্মগতপ্রাণ ভারতবাসী সেচ্ছাচারের দাস হইয়া নাস্তিকতার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। এমনিই দিন দিন কলির প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল, যে, তাহা দেখিয়া আবার ভারতে পুনরায় সুপ্রভাত হইবে তাহা কেহ স্বপ্নেও আশা করিতে সাহসী হইত না। কিন্তু ১২৯১ সালের আষাঢ় মাসে যেন ভারতের উপর ভগবানের কৃপাদৃষ্টি পড়িল,— বিধি এক সময়ে নানাপ্রকার প্রাসংঙ্গিকশুভঘটনা লইয়া ভারতের অনুকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে হইতেই কএকজন বিদেশী বিধর্ম্মী আর্য্যধর্ম্মের গুণগানে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশে দেশে আর্য্যধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া ভারতবাসীদের প্রোৎসাহিত করিতেছিলেন। এদিকে ভক্তপ্রবর পরমহংসদেব সম্পূর্ণ গুপ্তভাবে থাকিয়াও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইয়া স্থান বিশেষে ধর্ম্মের বীজ বপন করিতেছিলেন। নানা সম্প্রদায়ও শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎ-

পর্য্য জানিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিলেন। এমন সময় আচার্য্যবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যেন স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রেরিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। যে সময়, যে ভাবে ও যে অবস্থায় আচার্য্যদেব ধর্ম্মপ্রচার জন্য বহির্গত হন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার আগমন দৈবঘটনা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। যখন তিনি তাঁহার কঠোর সাধনালব্ধ প্রতিভা বলে শাস্ত্রের গভীর তাৎপর্য্য সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন সকলের চমক্ ভাঙ্গিল। ভারতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। চারিদিকে হিন্দুধর্ম্মের জয় ঘোষণা হইতে লাগিল। ঘোর নাস্তিকেরও চিত্তের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আবার যেন ভারতে সত্বরই ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইবে হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ে এইরূপ আশা সঞ্চারিত হইতে লাগিল। সমস্ত হিন্দু এক হইয়া তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিতে লাগিলেন। সংবাদপত্র সমূহ তাঁহার জয় ঘোষণা করিলেন। পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে বসিয়াই এই সমস্ত শুনিতে পাইলেন। আচার্য্যদেবের আগমনাবধি তিনি সাবধানের সহিত তাঁহার কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেন।

একদিবস আচার্য্যদেব তাঁহার কলিকাতার আবাস ভবনে বহুতর ধর্ম্মপিপাসুশ্রোতৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নানাবিধ ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ পরমহংসদেব একজন শিষ্যসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমারাও সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলাম। আচার্য্যদেব ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে কখন দেখেন নাই, অন্য কোনরূপ পরিচয়ও ছিল না। তিনি পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া যেমন উপবেশন করাইতে যাইবেন অমনি দেখেন পরমহংস অচৈতন্য,—একবারে পূর্ণ সমাধিস্থ। এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া আচার্য্যদেবের দুই চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি যেন ভক্তের ভাবে বিভোর হইয়া অনিমেষ লোচনে পরমহংসের সেই সমাধিপরিমার্জ্জিত প্রফুল্ল মুখকমলে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এই অবস্থায় অতিবাহিত হইল। গৃহ নিস্তব্ধ, কাহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা নাই। সকলেই শান্তভাবে থাকিয়া জ্ঞানী ও ভক্তের অদ্ভুত মিলনে অভূতপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া রহিলেন। ক্রমে পরমহংসের জ্ঞান সঞ্চ

বাহ্যজ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন 'মা! শশধরের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পাঠালি, পাঠাইয়ে আমায় এমন করে দিলে কেন, মা! আমি যে তোর ছেলের সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছি না। মা! আমায় ভাল করে দে, মা!" এইরূপ বলিতে বলিতে আরও একটু বাহ্যজ্ঞানের সঞ্চার হইল। তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, ভাই শশধর! দেখ আজ মায়ের কাছে বসিয়া আছি এমন সময় মা আমায় বলিলেন, যে হাঁরে রামকৃষ্ণ! আমার শশধরের সঙ্গে তুই একবার দেখা করিলিনি? সেও যে আমার প্রিয় ছেলে। আজ তাঁহার কাছে যা, গিয়ে দেখা ক'রে আয়গে। মা বল্লেন, আর থাকিতে পারিলাম না। অমনি চ'লে এলাম। অনেকদিন আসিব আসিব করিতেছিলাম, আজ তা হইয়া গেল"। এইরূপ বলিতে বলিতে আবার সমাধি হইয়া গেল। কিছুক্ষণ সমাধির অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় জ্ঞান সঞ্চার হইল। তৎপর দুইজনে নানা ভাব ভঙ্গিতে কত কি কথা হইল। অবশেষে পরমহংসদেব প্রেমে মত্ত হইয়া গান করিতে করিতে আচার্য্যদেবকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া রাত্রি আট ঘটিকার সময় দক্ষিণেশ্বর গমন করিলেন।

পরমহংসদেব সাধনার দ্বারা অহংভাব নষ্ট করিয়া কত উচ্চ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা এ ঘটনাটি এ স্থানে উল্লেখ করিলাম। তিনি কোন ভক্ত কি প্রেমিকের সন্ধান পাইলেই মহানন্দে তাঁহার নিকট দৌড়িয়া যাইয়া তাঁহার সহিত প্রেমালিঙ্গন করিতেন। তাহাতে তাঁহার কোনরূপ মন বিকার উপস্থিত হইত না। তিনি যতদিন সুস্থাবস্থায় ছিলেন, ততদিন মধ্যে মধ্যে আপন ইচ্ছানুসারে আচার্য্যদেবের নিকট আসিয়া উভয়ে প্রেমানন্দে মাতিয়া পরম সুখ অনুভব করিতেন। আচার্য্যদেবও সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার সাক্ষাৎলাভ পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। তিনি বলিতেন "বর্ত্তমান সময়ে এরূপ উচ্চ অঙ্গের ভক্তির সাধক অতি বিরল।" সময়ে সময়ে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন "লোকটাকে সাধারণে চিনিতে পারিল না, পারিবারও কথা নহে। চিনিতে না পারিয়া লোকে অন্যরূপ ব্যবহারে তাঁহার অনেক ক্ষতি করিয়েছে।

একদিন পরমহংসের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া গম্ভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "পরমহংসের অপূর্ব্ব অবস্থা হইয়াছে, দেখিয়া বড়ই হৃদয়ে আনন্দ হয়, ভারতে এখনও এরূপ লোক জন্ম গ্রহণ করিতেছেন!

কৈবল্য প্রাপ্তি।

এইরূপে কঠোর পরিশ্রম করিয়া প্রচার কার্য্য করিতে করিতে তিনি ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রচারের প্রধান অঙ্গ ভক্তিমাখা সঙ্গীত; সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বদা কণ্ঠের ব্যবহার করিতে হইত। অকস্মাৎ একদিবস তিনি গলদেশে কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভব করিলেন। কিন্তু তজ্জন্য কোনরূপ কষ্ট প্রকাশ করিলেন না এবং তাহার জন্য কোনরূপ যত্নও লইলেন না। পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবেই মা মা বলিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিতেন ও গান করিতেন। সুতরাং ক্রমেই বেদনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাকে কেহ বেদনার উপশম লাভের জন্য কিঞ্চিৎ সাবধান হইতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন, "আমিত সাবধান হ'তে চাই, কিন্তু যখন মা বাহ্যজ্ঞান নষ্ট ক'রে দেন তখন আর কিছুতেই নিজ কর্ত্তৃত্ব আনিতে পারি না। তবে আমি কি করিব?' অবশেষে বেদনার স্থানে একটি স্ফোটক জন্মিল। স্ফোটকটী কখন শান্ত অবস্থায় থাকিত কখন বা বৃদ্ধি পাইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রদান করিত। ক্রমেই স্ফোটকের বৃদ্ধি হইতে লাগিল তৎসঙ্গে আহারও বন্ধ হইয়া গেল। তরল পদার্থ ভিন্ন কিছু গলধঃকরণ হইত না। যাহা কিছু আহার করিতেন তাহা অতি কষ্টের সহিতই ভোজন করিতে হইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত ভয়ঙ্কর পীড়াতেও তিনি একদিনের জন্যও কোন যন্ত্রণা বোধ করেন নাই এবং ক্ষণকালের জন্যও ম্রিয়মাণ হন নাই। পূর্ব্বে যেরূপ হাসিতেন, আনন্দ করিতেন, এঅবস্থাতেও ঠিক সেইরূপই করিতেন। সাধকগণের কেমন আশ্চর্য্যরূপ তিতিক্ষা শক্তি

বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তাহা সকলে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন; ভক্ত আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া কিরূপ অলৌকিক ভাবে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন তাহা সকলে দেখিয়া অবাক্ হইলেন এবং মায়ের যে ছেলে হয় তাহাকে কেহ কিছুতেই বিরক্ত বা মুগ্ধ করিতে সক্ষম হয় না তাহা সকলে দেখিয়া দিব্য জ্ঞানলাভ করিলেন।

এরূপে রোগের বৃদ্ধি দেখিয়া শিষ্যেরা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া অতি যত্ন সহকারে চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। বহু যত্নেও তাঁহার বেদনা উপশমের কোন উপায় করিতে পারিলেন না। পুনরায় ডাক্তারদিগের পরামর্শে তাঁহাকে কাশী পুরে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় বড় বড় ডাক্তার যাইয়া চিকিৎসা করিতে থাকেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি এই সময় হাসিয়া বলিতেন, দেখ, আমার দেহটা যেন একটা কাগজের গৃহ, আর এই স্থানটায় যেন একটা ছিদ্র হইয়াছে। ক্রমে যখন অতি ক্ষীণ ও শুষ্ক হইয়া অস্থি পঞ্জরের পিঞ্জর স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল, তখন শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া নিজ দেহ দেখাইয়া বলিতেন; দেখেছ? দেহটা কেবল যেন একটা হাড়ের খাঁচা মাত্র, এতে কিছুই নাই, হয়ও না কিছু, এক মাত্র সচ্চিদানন্দই সত্য। মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত শিষ্যদিগকে এইরূপ নানা প্রকার গভীর উপদেশ দিয়া যান। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস (৩১শে শ্রাবণ তাঁহার একজন ভক্তকে ডাকিয়া বলিলেন, পাঁজিখান দেখত। শিষ্য পাঁজি লইয়া ৩১শে শ্রাবণের সমুদায় বিবরণ পাঠ করিয়া, যেমনই ১লা ভাদ্র পাঠ করিলেন, অমনই পরমহংসদেব বলিয়া উঠিলেন, "হইয়াছে, আর না"। তৎপর দিবস চিকিৎসক আসিবামাত্র আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা এতদিন ধরিয়া কি করিতেছ? রোগ কি আরোগ্য হবে না? চিকিৎসক নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। তখন তিনি একটু মৃদু হাসিয়া একজন ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া হস্তে তুড়ি দিয়া বলিলেন, ওহে! এরা এতদিন পরে বলে কি? ক্রমে ১লা ভাদ্রের কাল রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল! ভক্ত গণেরও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহারা সযত্নে যে দিবস পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলেন। তিনিও প্রায় পায়সান্ন টুকু সে দিবস সমস্তই ভক্ষণ করিলেন, একবিন্দুও পরিত্যাগ করিলেন না। পরে শয়ন করিয়া নিদ্রা যান। রাত্রি

সার্দ্ধ দ্বিপ্রহরের সময় নিদ্রোত্থিত হইয়া পার্শ্বস্থ শিষ্যকে ডাকিয়া নিজ উদর দেখাইয়া বলিলেন, দেখেছ? ইহাকে শ্বাস বলে। এই বলিয়াই সমাহিত হইলেন। সে সমাধি আর ভাঙ্গিল না। ১৮০৮ শক ১লা ভাদ্র তারিখে ভক্তকুলচূড়ামণি মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস জড়দেহ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এ মায়াময় সংসার ছাড়িয়া কৈবল্য ধামে গমন করিলেন। নিয়তির বশেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে। নিয়তি খণ্ডনে কাহারও সাধ্য নাই। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, শুকদেব, ভৃগু, ভার্গব, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, কপিল, বেদব্যাস, কশ্যপ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহাসাধকগণও যে নিয়তি খণ্ডাইতে সমর্থ হন নাই, আজ আমদের ভক্তদর্শন পরমহংসদেবও সেই নিয়তির বশে এ পাপ সংসার পরিত্যাগ করিয়া নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। মানুষ যেখানে যাইবার জন্য লালায়িত সেস্থান যদি সে দিব্যচক্ষে অবলোকন করে তাহা হইলে কি আর সে এ যন্ত্রণাময়, পাপপূর্ণ বিপদের আকর সংসারে থাকিতে চায়? কখনই না। সাধক যে জন্য এখানে আসিয়া থাকেন তাঁহার সেই কার্য্যটি সিদ্ধ হইলেই তিনি আর এক মুহূর্ত্তও আমাদে- ন্যায় নরকীটদিগের সংসর্গে থাকিতে ইচ্ছুক হয়েন না। পরমহংসের উদ্দেশ্য সাধিত হইল তিনি আর সংসারে থাকিবেন কেন, তজ্জন্যই তিনি সমস্ত মায়া মমতায় বিসর্জ্জন দিয়া আশ্রিত শিষ্যদিগকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া কোথায় যেন উধাও হইয়া চলিয়া গেলেন—পশ্চাৎ যাহা থাকিল তাহা কখনও নষ্ট হয়ও নাই, হইবেও না।

ক্রমশঃ

ব্রহ্মোপাসনা।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান সমুদ্ভুত ফল নহে, নব্য সভ্যতার ধ্বজা নহে এবং সাগর পার হইতে আনীতও নহে বরং তৎসমুদায়ই ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপন্থী। আর্য্যগণের পবিত্রাচারে ও উপাসনায় অবিদ্যা পাশ ছিন্ন হইয়া বিমল ব্রহ্মজ্যোতি বিকাশিত হইয়াছিল। কত মন্বন্তর চলিয়া গেল, কুটস্থ ব্রহ্ম (ব্রহ্মজ্ঞান) অচল ভাবে সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকিয়া উপাসনা পদ্ধতি ও জ্ঞানীর যোগযুক্ত নির্ম্মল হৃদয়ে ব্রহ্মানুকম্পায়ই উদ্ভাসিত হইয়া আচার্য্য পরম্পরায় প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে পূর্ণ মনুষ্য প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল, এই ভারতবর্ষই ঋষি সকলের পুণ্যময় আশ্রম ভূমি, এখানেই বেদ সকল প্রকাশিত হইয়া জীবগণের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানও পরিপূত আর্য্য ভূমিতেই প্রকাশিত হইয়া শিষ্য পরম্পরায় সুসেবিত হইতেছে।

অতি পুরাকাল হইতেই ত্রিবিধ প্রাণী সৃষ্ট হইতেছে। কতক সত্বগুণপ্রধান দেবভাবাপন্ন, কতক রজোগুণপ্রধান মানবভাবাপন্ন, আর কতক তমোগুণ প্রধান পশুভাবাপন্ন। স্পষ্টরূপে বলিতে হইলে দেব, মানব ও পশু বলিলেই হয়। আবার মানুষের মধ্যেও উক্ত ত্রিবিধ প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। কেহ ভূমানন্দে আনন্দিত হইবার জন্য কায়মনোবাক্যে সাধন সকল পরিপালন করিতেছেন, পরকালের জন্য হৃদয়-শতদল ঈশচরণে সমর্পণ করিতেছেন; সংসারের জ্বালা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। রোগের ভীষণ মূর্ত্তিতে, মৃত্যুর বিকট মুখভঙ্গীতে, তাঁহারা ভীত হন না; প্রত্যুত ঐ সকল তাঁহাদের নিকট একান্ত নিষ্প্রভ ও মলিন হইয়া সুদূরে পলায়ন করে। কেহবা সংসারকেই নিত্য পরমার্থ জ্ঞান করিয়া বিষয় সুখে অবগাহন করিতে প্রবৃত্ত হয়, ক্রমে পরব্রহ্মজ্ঞানে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসার জ্বালায় দগ্ধ হইতে থাকে। প্রায়ই তাহাদের মোহ অপসারিত হয় না। কেহ বা নিদ্রিত। সংসারে দেবতা ও অসুর চির বিরাজিত। কখন দেব দলের প্রাবল্য, কখন বা অসুরদলের প্রাবল্য, পরিণামে অসুরদলই পরাজিত হইয়া অরণ্যানিতে প্রবেশ করিয়া থাকে। অসুরদলের মধ্যে

আবার দ্বিবিধ ভাগে শ্রেণী বিভাগ হইতে পারে। এক ভাগ বাহুতে পাশব বল প্রকাশ করিয়া সমস্ত আয়ত্ত ও স্বাভি মত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, আর এক ভাগ মুখে বাচালতা করিয়া ছলে কৌশলে অভীষ্ট সাধন করিতে চায়। উভয়েরই শেষ ফল স্বার্থ সাধন, কেহ প্রকাশ্যে কেহ তলে তলে। এই অসুর ভাবাপন্নগণ ব্রহ্মজ্ঞানের চির বিরোধী। ইহারা পূর্ব্ব মধ্য ও বর্ত্তমান কালে বিরাজিত। উহারা সকলেই সময়ে সময়ে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মোপাসনায় বিপ্রতিপত্তি ঘটাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে এবং নানাবিধ উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া সম্প্রদায় বিশেষের উৎপত্তি করিয়া থাকে। এই সকল কারণে অনেকের দুর্ব্বল মন সন্দেহ দোলায় দোলায়মান হইয়া উঠে। আবার অলক্ষ্য গতি কাল প্রভাবে দেশের অবস্থাও ভিন্ন ভাব ধারণ করে। যখন মহম্মদের শিষ্যগণ নানা অসদুপায়ে ভারতের অধিকাংশ স্থল আয়ত্ত করিয়া সর্ব্বস্ব শোষণে তৎপর হইয়া উঠিল, দিল্লীর পবিত্র তোরণ-দ্বার অর্দ্ধচন্দ্র পতাকায় হীন শ্রী ধারণ করিতে লাগিল, তখন ভারত ভিন্ন ভাব ধারণ করিল। ধর্ম্মগ্রন্থ সকল নষ্ট হইতে লাগিল, আচার্য্যগণ সতত শঙ্কিত ও ত্রস্ত। তখন অনেক লোক প্রলোভনে স্বার্থ সাধনে বা বিপাকে অনিচ্ছায় পরধর্ম্মে ও পরাচারে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বৃত্তি সকল উচ্ছিন্ন হওয়াতে অর্থার্জ্জন লালসায় তদানীন্তন বিজাতীয় ভাষা অধ্যয়ন ও বেশ ভূষার সমাদর করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ পরিমাণে স্বাস্থ্য শিষ্টাচার ও আর্য্যগরিমা বিলুপ্ত হইতে বসিল। তখন কতিপয় উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া এক এক সম্প্রদায় গঠিত হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রদের প্রবলতায় যখন বিজাতীয় রাজার অত্যাচার ও প্রভুশক্তি একান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িল, তখন নানা কৌশলে খৃষ্ট শিষ্যগণ বণিগ্‌বৃত্তি ছাড়িয়া ভারতের রাজলক্ষ্মীকে করতল গত করিতে লাগিলেন, ক্রমে ভারত ভারান্তর পরিগ্রহ করিতে লাগিল। বর্ণিত সময়েও লোভের অভাব ছিল না, স্বার্থের হ্রাস ছিল না, অনেকেই খৃষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। যাহারা দীক্ষা গ্রহণ করিলেন না, তাহারাও সুশীতল দেশ সম্ভূত আচার ব্যবহার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহার পূর্ণতা সাধনের পূর্ব্বে অনেক ব্রাহ্মণ কর্ম্মোপলক্ষে রঙ্গপুরে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে ভোগ বাসনা একান্ত বলবতী ছিল, রঙ্গপুরের সন্নিকট তামফাট নামক গ্রামে যবনী ললনায় আশক্ত হইলেন, সমাজে ধিকৃকত হইয়া পরিত্যাগ

কাশীতেও প্রায়শ্চিত্ত যোগ্য হইতে পারিলেন না। সমাজে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া যবন সংস্পৃষ্ট দোষে পরিত্যক্ত দলের একাংশে পরিগৃহীত হইলেন এবং একটি উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। পরিণামে তাহাও রূপান্তরিত হইয়া খৃষ্টধর্ম্মের প্রকার ভেদ মাত্র হইয়া উঠিল। দেশীয়গণ পরমার্থ পরিত্যাগ করিয়া অর্থাশয়ে অর্থকরী ভাষা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বাল্যাবধি আজীবন উহারই আলোচনা; কাজেই অনেকে পবিত্র আর্য্যধর্ম্মে আর্যাচোরে ও আর্য্যশাস্ত্রে অন্ধ হইয়া উপধর্ম্ম ও বিধর্ম্মে, অনাচারে ও বিজাতীয় আচারে মনঃ সংযোগ করিতে লাগিলেন। কর্ম্মদোষে অনেকেই আত্ম বিস্মৃত হইয়া স্বীয় গৌরব বিসর্জ্জন পূর্ব্বক জাতীয় প্রতিষ্ঠার মস্তকে কুঠারাঘাত করিতে লাগিলেন এবং নবীন মন্ত্রে মুগ্ধ হইলেন। বিদেশীদের হাস্য ও বিদ্রূপ বাক্য তাঁহাদের কর্ণকুহরে পৌঁছে না। দেশীয় অমৃতময় ও প্রীতিপ্রদ উপদেশাবলীতে আস্থা না থাকায় দেশের দুর্দ্দশার ইয়ত্তা রহিল না। পদে পদে লাঞ্ছনা, তথাপি সেই বিড়ম্বনাই একমাত্র প্রার্থনীয়। সুতরাং এইরূপ দুর্দ্দশারদিনে "ব্রহ্মোপাসনার" বিষম ধূয়া পরিলক্ষিত হইবে না কেন ?

ব্রহ্মোপাসনা কথাটী যত সরল কাজ তত সুগম নহে। "ব্রহ্ম ব্রহ্ম" ইত্যাকার ধ্বনি করিতে সকলেই সমর্থ, পরোক্ষানুভব ভিন্ন কেবল ব্রহ্ম শব্দে মুক্তিলাভ ঘটিতে পারে না। ঔষধের নাম গ্রহণে আময় অপসারিত হয় না, সহপান বা অনুপান সহকারে সেবন করিলেই ব্যাধি বিদূরিত হইয়া থাকে। সুতরাং পরোক্ষানুভবের উপযুক্ত হওয়া সর্ব্বাগ্রে সুবিহিত। তদনুকূল উপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় গুরুর অনুসরণ করিতে হইবে। তিনি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রত্যক্ষী-কৃত সাধন সকল শিক্ষা দিবেন। সৃষ্টির আরম্ভাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বেদ প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম, তদুক্ত সাধনে উপাসিত, সংরাধিত ও প্রত্যক্ষীভূত হইতেছেন, তাহাতে বিপ্রতিপত্তি-সাধন-প্রয়াস একান্ত বালকতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন দেখা কর্ত্তব্য সনাতন শাস্ত্রে তদুপযোগী সাধন প্রভৃতির বিধি নিষেধ কি রহিয়াছে এবং তাহা কতদূর পরিপালিত হইতে পারে। অন্যথা বামনের চন্দ্র সঙ্গতি লাভের ন্যায় হাস্যাস্পদ হওয়া অথবা বাত-বিকৃতি প্রদর্শনের কিছুই প্রয়োজন দেখা যায় না।

ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়। দর্শনে তাঁহার দর্শন হয় না, শ্রবণে শ্রবণ হয় না,

রসনায় রসন হয় না, ত্বগে স্পর্শ হয় না, নাসিকায় আঘ্রাণ হয় না, এমন কি ব্রহ্ম স্বরূপ মনেও মনন হয় না। ফলকথা ব্রহ্ম আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহেন। তাঁহার সম্বন্ধে অস্তি-নাস্তি কোন শব্দই প্রকাশ হয় না। তখন এবম্ভূত অতীন্দ্রিয় নিত্য সত্য পরব্রহ্মজ্ঞানের জন্য আপ্তবাক্যের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতে হইবে, আপ্তবাক্যানুকূল যুক্তি তর্কের অনুসরণ করিতে হইবে, নচেৎ অন্ধকারে বিচরণ করিতে হইবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিপক্ষে পাদ বিক্ষেপ করিতে হইবে, নিবৃত্তি তাহার সুদূরে অবস্থিত ও লুক্কায়িত। সেই আপ্তবাক্য বেদ বেদান্তাদি। সর্ব্বান্তঃকরণে, পূত হৃদয় হইয়া তাহাই পরিপালন করা সাধুজনোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

অনুষ্ঠান কার্য্যের সৌকর্য্য বিধান জন্য একই বেদ শাখা চতুষ্টয়ে বিভক্ত। সেই শাখাচতুষ্টয় শ্রুতি জলদগম্ভীরস্বরে একতানে বলিলেন সৃষ্টির পূর্ব্বে এক পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না *। তখন ব্রহ্ম নির্গুণ নির্লেপ নিরঞ্জন অশব্দ অস্পর্শ অরূপ ও অব্যয়। তাঁহারই অভিধ্যানে জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্ট হইতেছে। জগৎ পরব্রহ্মের একাংশে অবস্থিত ত্রিপাদ স্বয়ম্প্রভ। তিনিই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ঐ উপাদান বিবর্ত্ত উপাদান, পরিণাম নহে। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে সর্পের যে উপাদান তাহা বিবর্ত্ত উপাদান। নির্ব্বিকারের পরিণাম সম্ভবেনা। স্বরূপ নাশানন্তর অবস্থান্তর উৎপত্তির নাম পরিণাম। বিবর্ত্ত উপাদানে স্বরূপের নাশ হয় না। যখন পরমেশ্বরের অভিধ্যান হইল তখন তিনি মায়ারূপ উপাধিতে উপহিত, সুতরাং মায়াময় সগুণ। ব্রহ্ম এক হইয়াও উপাধির বাহুল্যে বহু বলিয়া ব্যপদেশ হইয়া থাকেন। এখন দেখা যাইতেছে যে পরমেশ্বর ত্রিবিধ সত্তায় প্রতিভাত হইয়া থাকেন। পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক। আবার অতীন্দ্রিয় বিষয়ের উপলব্ধি জন্য কোন অবলম্বন করিতে হইবে, নচেৎ স্বরূপাধিগম হয় না। উদাহরণ স্বরূপ একটী বিষয়ের সঙ্ক্ষেপ

---

* "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ।
"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।" ঋক্ শ্রুতিঃ।
"তদেতদ্ ব্রহ্ম পূর্ব্ব মন পর মনন্তরমবাহ্য ময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ"। যজুঃ।
"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্"। আথর্ব্বণিক শ্রুতিঃ।

আলোচনা করা যাইতেছে। যেমন কাল নীরূপ। নীরূপ কালের সত্তা উপলব্ধি নিমিত্ত সূর্য্যোদয়াদি অবলম্বন ও অপেক্ষা করিতে হইবে, আবার ঘটিকাযন্ত্র অবলম্বন করিয়া আরও কালের ক্ষুদ্রাংশ বিভাগ হইয়া থাকে। এখন ব্যবহারিক সত্তায় পল, বিপলাদি ক্রমে কাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পারমার্থিক সত্তায় তাহার কদাপি বিভাগ হয় না, তাহা নীরূপ অখণ্ড, কিন্তু আমরা তাহাকে ক্ষুদ্র তম ভাগে বিভক্ত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। সর্পে রজ্জু ভ্রম হইয়া থাকে, শুক্তিতে রজত ভ্রম হইয়া থাকে। যাবৎ সর্প ও রজতের মিথ্যাত্ব বিনিশ্চিত নাহয় তাবৎ সর্প ও রজত বলিয়া দৃঢ়প্রতীতি জন্মে। অধ্যারোপে রজ্জু ও শুক্তিতে অন্যবস্তুর আরোপ জ্ঞান হইয়া থাকে। উহা অজ্ঞান, অজ্ঞানের আবরণ শক্তিতে স্বরূপের তিরোধান হয় স্বরূপকে আবরণ করিয়া অন্যরূপের যথার্থজ্ঞান, বিক্ষেপ শক্তির কার্য্য। আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি সমন্বিত অজ্ঞান, জ্ঞানের বিরোধি। ঐ অজ্ঞান বস্তুও নয় অবস্তুও নয়, জ্ঞানে উহার বিনাশ হইয়া থাকে। অজ্ঞান ত্রিগুণময় জ্ঞানের বিরোধী। * জীব মাত্রেই কোন না কোন রূপে অজ্ঞান অবস্থিতি করে, সুতরাং ইহা একবারেই অবস্তু নহে। আবার জ্ঞানের বিকাশ হইলে ইহার বিনাশ হয়, এজন্য পূর্ণ সত্য পর-ব্রহ্মের ন্যায় ইহা বস্তুও নহে। অতএব ইহার প্রকৃত স্বরূপ দুর্নির্ণেয় বলিয়া, অনির্ব্বচনীয় বলাহইল। অনির্ব্বচনীয় শব্দে যাহার কোনরূপ নির্ব্বাচন বা নির্ণয় হয়না তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। জ্ঞানের অভাবকে অজ্ঞান বলাও যুক্তি যুক্ত নহে। কারণ "আমি যখন অজ্ঞান ছিলাম তখন কিছুই জানিতামনা" ইত্যাদি অনুভবে জ্ঞানাভাবেও "জানিতাম না জ্ঞানের স্ফুর্ত্তি হইয়াথাকে। এই জন্য জ্ঞানের অভাবকে অজ্ঞান না বলিয়া জ্ঞানের বিরোধীকেই অজ্ঞান বলিয়া কথিত ও ব্যবহৃত হয়। এই অজ্ঞান ত্রিগুণময়, সুতরাং অজ্ঞান জনিত প্রত্যেক পদার্থে সত্বাদি গুণ ত্রয় লক্ষিত হয়। পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার ত্রিগুণময়। যেস্থলে জ্ঞান সেখানে অজ্ঞান থাকিতে পারে না; এই কারণে অজ্ঞান, জ্ঞান বিরোধী। প্রত্যেক পদার্থে অজ্ঞান আছে, অনুভবে ইহা বুঝা যাইতে পারে। "আমি

---

* "অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান বিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি।" ইত্যাদি বেদান্তসার।

অজ্ঞ" প্রত্যেক ব্যক্তিই এরূপ বলেন ও ব্যবহার করেন। সুতরাং সকলেই যে অজ্ঞানগ্রস্ত তাহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য। এই অজ্ঞানকে অবিদ্যাও বলে। অবিদ্যা প্রভাবে পরমেশ্বরের স্বরূপ প্রচ্ছন্ন হইয়া বর্ত্তমান জগতের সত্যত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে। পরমেশ্বর ভিন্ন আর কিছুই সত্য নহে, ইন্দ্রজালবৎ অনিত্য, অবস্তু।

"সত্যংজ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম,, ইহাই তাঁহার স্বরূপ। ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম অনন্ত। যাহাই সৎ তাহাকে সত্য বলে। যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, কদাপি তদ্রূপের ব্যভিচার হয় না, তাহাকে সত্য বলে। * যাহার ব্যভিচার হয় তাহা অনৃত অতএব বিকারময়। সত্য শব্দে ব্রহ্ম নির্ব্বিকার নিরঞ্জনরূপে সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্ম কারণ স্বরূপ। কারণ স্বরূপ হইলে ঘটের কারণ মৃত্তিকার ন্যায় অচেতন বলিলে সন্দেহ হইতে পারে, অথচ স্বরূপের বিকাশ হয় না, এজন্য তাঁহাকে জ্ঞান বলাযায়। যাহা জ্ঞান তাহাই চিৎ। জ্ঞান ব্রহ্মের রূপ, জ্ঞপ্তি, অববোধ প্রভৃতি জ্ঞানের পর্য্যায়। আবার যাহা সত্য ও জ্ঞানময় তাহা সীমাবদ্ধ ও খণ্ডহইতে পারে, ক্রমে সে আশঙ্কাও অপনোদন করিবার জন্য শ্রুতি বলিলেন, ব্রহ্ম অনন্ত। যাহা কোনও রূপে প্রবিভক্ত হয়না তাহাকে অনন্ত বলে †। পরব্রহ্ম অস্মদাদির মত রূপে রূপবান্ নহেন, কিন্তু সত্য জ্ঞানানন্ত রূপে রূপী। এই জন্য তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলিয়াও পূজিত হইয়া থাকেন।

পারমার্থিক সত্তায় ঈশ্বর, নির্গুণ অবাঙ্মনস গোচর। চিন্ময় সত্য ও জ্ঞানময়। তাঁহারই শক্তি মায়া। পরব্রহ্ম মায়াতে উপহিত হইয়া গুণময়, অতএব পরমেশ্বর নির্গুণ ও সগুণ ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। পরমেশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য প্রথম তটস্থ লক্ষণের ‡ অথবা নির্গুণ ভাব পরিগ্রহ জন্য সগুণ ভাব আদৌ বুঝিতে হইবে, নচেৎ স্বরূপ ছাড়িয়া কুরূপে বা অসদ্রূপে চেষ্টা ন্যস্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। এখন পরম কারুণিক পরমেশ্বরের উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

---

* "যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি তৎসত্যং।
যদ্রূপেণ নিশ্চিতং যত্তদ্রূপং ব্যভিচরদনৃতমিত্যুচ্যতে॥" শঙ্কর ভাষ্য।

† "যদ্ধি ন কুতশ্চিৎ প্রবিভজ্যতে তদনন্তম্"। শঙ্কর ভাষ্যম্।

‡ "স্বরূপাতিরিক্ত বিশেষণে।

আমরা ধরাধামে অন্তঃকরণ ও চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সম্পদে সম্পন্ন হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয় গ্রামের পরিচালনা দ্বারা তাহাদের শক্তির অনুরূপ যাবতীয় কার্য্য করণে আমরা সমর্থ হই, তদতিরিক্ত বিষয় আমাদের স্পর্শ করিবার সামর্থ্য নাই। চক্ষু রূপ ভিন্ন নীরূপ গ্রহণ করিতে পারেনা। রসনা মধুর, লবণ, তিক্ত, কষায় ও অম্ল প্রভৃতি রসভিন্ন আর কিছুর স্বাদগ্রহণ করিতে পারে না। শ্রবণ ঘাত ও প্রতিঘাতের ফল ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই ধরিতে পারেনা। নাসিকা পার্থিব গন্ধ ভিন্ন অন্য কোন বিষয় স্পর্শ করিতে পারেনা। ত্বক্ স্পর্শ জনিত জ্ঞানের সাধন। অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে আপাততঃ দুই ভাগে বিভক্ত। অন্তঃকরণের যে কার্য্যে নিশ্চয়তা জন্মে তাহাকে বুদ্ধি বৃত্তি বলে, আর যে কার্য্য বিমর্শ অথবা সঙ্কল্প বিকল্প হয় তাহাকে মন বলে। অন্তঃকরণের এক এক কার্য্যকে কিংবা সময়ে সময়ে অন্তঃকরণে যে এক এক ভাব হয় তাহাকে অন্তঃকরণের ধর্ম্ম বৃত্তি বলে। বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সকলের পরিচালক, মন পরিচালন রজ্জু স্বরূপ। যেমন রথে অশ্ব যোজিত হইয়া সারথি কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, সারথি প্রগ্রহ (লাগাম) গ্রহণ করিয়া সংযোজিত অশ্বকে যথেচ্ছা পথে বিচালিত করিয়া থাকে। তেমন দেহী জীব রথিতুল্য, শরীর তাহার রথ, বুদ্ধি সারথি, মন প্রগ্রহ, ইন্দ্রিয় পঞ্চক অশ্ব। অশ্বের গমন ভিন্ন প্রগ্রহের কোন কার্য্য দৃষ্ট হয় না, তবে কেবল সারথির করে স্পন্দিত হইতে পারে মাত্র। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটীকে বিষয় বলে। এই বিষয় পঞ্চক পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইয়া থাকে। উহা ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের আর কোনও বিষয়ে সংপৃক্ত হওয়ার সাধ্য নাই। আস্ফালন কর, বাহবাস্ফোটন কর, আর বিজ্ঞানই খাটাও বিষয় ভিন্ন অবিষয়ে ইন্দ্রিয়ের শক্তি অকর্ম্মণ্য হইবেই হইবে।—

ক্রমশঃ

———

বাল্য-বিবাহ।

সদ্যঃ রোপিত আম্রের কলমে মুকুল হইলে সকলেই তাহা ভাঙিয়া দেয়। অপরিণত নারিকেল বৃক্ষে মোচ পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহা ভাঙিয়া দেয়। কেন দেয়? পাছে বৃক্ষ নিস্তেজ হইয়া ভবিষ্যতে মারা পড়ে; প্রত্যুত বৃক্ষের পরিণত অবস্থায় ফল হইলে ফলও পরিপুষ্ট হয়, অপেক্ষাকৃত বৃক্ষও সতেজ থাকে। চিরকাল পূর্ব্ববৎ মোচ ও মুকুল ভাঙিয়া দিলে বৃক্ষ আরও সতেজ থাকিতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে যে অভিপ্রায়ে বৃক্ষ রোপন করে, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না, বলিয়াই চিরকাল কেহ মুকুলাদি নষ্ট করে না। এই সকল যুক্তি-বলে বা ইত্যাদি ভুয়দর্শনে সাধারণের ধারণা হইয়াছে—বাল্য-বিবাহ আমাদের সমধিক অনিষ্টকর। এই ধারণা অহিন্দুগণের ও হিন্দুচর্ম্মাচ্ছাদিত সংস্কারক দলের। তাঁহারা আরও ২। ১টী দৃষ্টান্তবলে ও পাশ্চাত্য শিক্ষারও সভ্যতার ভাবে বাল্য-বিবাহের নিতান্ত বিরোধী; কিন্তু প্রাচীন আচার-প্রিয় হিন্দুগণ ইহার নিতান্ত পক্ষপাতী। উভয়দলই স্বপক্ষ সমর্থনের প্রয়াস পাইতেছেন। আমরা আকাঙ্খা করি—এই সঙ্ঘর্ষণে সত্যের আবরণ উন্মোচিত হইবে। এসম্বন্ধে ভুয় আন্দোলনে সমাজের ইষ্ট বই অনিষ্ট সাধিত হইবে না। তবে যদি আমাদের কপালক্রমে ঠাকুর গড়িতে মেকুর হয়, তবে উহা কালের প্রভাব বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইব।

প্রাচীনকালে হিন্দু-সমাজ কেবল শাস্ত্রের অনুশাসন বলে চালিত হইত, কিন্তু তাহাই বলিয়া যুক্তির বল ও কম ছিলনা। তবে পূর্ব্বে শাস্ত্রানুসারিণী যুক্তি ছিল, এক্ষণে যুক্ত্যানুসারী শাস্ত্র হইয়াছে। বাস্তবিক, "যুক্তিহীন বিচারেন ধর্ম্মহানিঃ "প্রজায়তে।" ইত্যাদি শাস্ত্রে যুক্তির আসন সর্ব্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বকালের যুক্তি এক জাতীয় ছিল, আধুনিক যুক্তি অন্য জাতীয় হইয়াছে। যদিও যুক্তি মানসিক-স্বভাব-সুলভ শক্তিসম্ভূত; তথাপি যুক্তিশক্তি শিক্ষায় মার্জ্জিত হইয়া শিক্ষানুসারিণী হয়। তুমি ইংরেজি দর্শনশাস্ত্র পড়িয়াছ, তোমার যুক্তি এক প্রকারের, আমি আর্য্যদর্শন শাস্ত্র পড়িয়াছি, আমার যুক্তি

অন্য প্রকারের। শিক্ষাই এই ভিন্নমুখী যুক্তির কারণ। আবার তুমি পাশ্চাত্য দর্শন অধিক পড়িয়াছ, আমি অল্প পড়িয়াছি, সুতরাং তোমার আমার যুক্তিতে স্বর্গমর্ত্ত ভেদ থাকিবে, এই কারণে যুক্তি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না—ক্ষণে ক্ষণে বহুরূপা হয়। তথাপি যুক্তি কাহারও অনুপাদেয় নহে; কেন না 'যুক্তি দ্বারা কিছুই স্থির হয় না" যদি এই সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাও যুক্তিবলে করিতে হইবে। তথাপি যুক্তির আশ্রয় ব্যতীত আমাদের আর অন্যোপায় নাই। তবে এই মাত্র বলি—আর্য্য আচার ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত যদি যুক্তিবলে স্থির করিতে হয়, তবে আর্য্য দর্শন-শাস্ত্রের শিক্ষামার্জ্জিত যুক্তিবলে সিদ্ধান্ত করাই উচিত। সম্প্রদায় বিশেষ সম্বন্ধ, দেশ, কাল, পাত্র, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও শক্তির অনুসারে যুক্তির আকার গঠিত হওয়া উচিত। আর একটী কথা বলি,—যদি পিতার আদিষ্ট বিষয়ে পুত্র যুক্তির অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে যেমন পিতার অপমান করা হয়, সেইরূপ আমরা নিঃসন্দিগ্ধরূপে মন্বাদি মহর্ষির আদিষ্ট বিষয়ে যুক্তির অনুসন্ধান করিয়া পদে পদে তাঁহাদিগকে অপমানিত করিতেছি। কালের ধর্ম্ম অবশ্য সহনীয়।

আমি বলি, আম্রের মুকুল না ভাঙিয়া বাহ্যপ্রক্রিয়ার দ্বারা তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া অল্পকালে ফলভোগ করাইতো ভাল। ফলের জন্যই এত আয়াস ও এত উৎসাহে বৃক্ষরোপন। তোমার ইংরেজি যুক্তি—তুমি বলিবে, "বৃক্ষই ভাল"। কিন্তু হিন্দু সমাজ এরূপ ফলহীন ক্রোটনের পক্ষপাতী নয়, ফলপুষ্প সুশোভিত বৃক্ষের পক্ষপাতী। তাই তাহাদের শাস্ত্রীয় উপদেশ আছে—

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনং।" হিন্দুগণ ফল চায় বলিয়া বৃক্ষেরও অনাদর করে না—সহকারিতায় যে সুখোদয় হইতে পারে, তাহাও অনুভব করিতে পরাঙ্মুখ নয়। তাই তাহাদের শাস্ত্রে

"অগ্রে ফলার্থে নির্ম্মিতে ছায়াগন্ধাদ্যুপপদ্যতে
এবং ধর্ম্মং চর্য্যমাণমর্থা অপ্যুৎপদ্যন্তে

যাহারা ইন্দ্রিয়সুখকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করে—স্ত্রীর বাহ্য সৌন্দর্য্যই একমাত্র সুখের নিদান বিবেচনা করে; তাহারা বাচিয়া গুচিয়া ষোড়শী রূপসী বা বর্ষীয়সী বিবাহ করুক। আর যাহারা সৎপুত্রপ্রয়াসী—পারা-

লৌকিক সদ্‌গতি লাভই একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহাদের পিতা প্রভৃতি অভিবাবকগণের প্রতিই কুল, শীল ও সৌন্দর্য্যাদি বাছার ভার থাকাই উচিত।

বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকিলে প্রজা বৃদ্ধি হইবে। ভারত জাত শস্যে আমাদের উদর পূর্ণ হইবে না—এ আপত্তি অতীব অকিঞ্চিৎকর। "জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।" সুতরাং তোমার আমার সেভাবনায় অধিকার নাই। যাহার ভাবনা—সে ভাবিবে।

আর এক কথা—বাল্যকালে সৎপ্রবৃত্তি সকল স্ফুরিত হয় না! সুতরাং অস্ফুরিত সৎপ্রবৃত্তির অবস্থায় উৎপন্ন সন্তানও তাদৃশ প্রবৃত্তিমান্ হইয়া থাকে। হিন্দুরা জন্মান্তর স্বীকার করেন। এক জন্মে সৎপ্রবৃত্তি উন্নত অতি অল্পই হয়, হয় না বলিলেও চলে। আমার বয়স ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল। এযাবৎ সৎপ্রবৃত্তি মার্জ্জিত করিবার চেষ্টা করিতেছি, তথাপি মার্জ্জিত হওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। যদি দীর্ঘকাল জীবিত থাকি, এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চরিত্র সংশোধন করিবার ইচ্ছা বলবতী থাকে, তবে এইরূপে জন্ম জন্মান্তরে কিয়দংশ চরিত্র বা প্রবৃত্তি পরিশুদ্ধ হইতে পারে। ভগবানের শ্রীমুখের বাণী—

"অনেক জন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং॥

সুতরাং এক জন্মে ৫। ৬ বৎসরের অগ্রপশ্চাতে প্রবৃত্তির উৎকর্ষ অপকর্ষ লাভ করা কখনই সম্ভবপর নহে। ইহা ব্যতীত হিন্দুগণ আবার প্রারব্ধবাদী। প্রারব্ধে যেরূপ অবস্থা ঘটিবে তাহা অচলস্থায়ী, হিন্দুর ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং বালিকার গর্ভজাত সন্তান হউক অথবা প্রৌঢ়ার গর্ভজাত সন্তান হউক সে যদি দুর্ব্বল অথবা সবল হয় তাহা তাহারই প্রারব্ধ লব্ধ ফল, অতএব তুমি আমি যুক্তি জাল বিস্তার করিয়া প্রারব্ধ কি করিয়া নষ্ট করিব। সুতরাং প্রারব্ধবাদী হিন্দুর নিকট এ সব যুক্তি লাগান বৃথা শ্রম।

আর্য্য মহার্ষগণ শরীরের প্রতি তাদৃশ আস্থাবান্ ছিলেন না; কেন না শরীরের সহিত একজন্মের সম্বন্ধ। কিন্তু মনের সহিত শত শত জন্মের সম্বন্ধ। সুতরাং তাঁহারা শারীরিক বল অপেক্ষা মানসিক বলে অধিক বলীয়ান হইতে প্রয়াস পাইতেন। আর্য্যদর্শনের দৃষ্টি মনোব্যাপের প্রতি, পাশ্চাত্য দর্শনের দৃষ্টি শারীরিক বা বাহ্য ব্যাপারের প্রতি। তাহাই তাঁহাদের দর্শন শাস্ত্র আধ্যাত্মিক বিষয়ক, অধুনিক দর্শন শাস্ত্র বাহ্য বিষয়ক।

তাঁহারা মানসিক অঙ্গের পোষণ এবং কেবল শারীরিক অঙ্গের পোষণ চাহিতেন না—অনিবার্য্য বলিবর্দ্দবৎ শারীরিক বলের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই তাঁহারা বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী, ইহাঁরা বিরোধী। বাল্যবিবাহে যে পরিমাণে শারীরিক বলক্ষয় হয়, প্রৌঢ় বিবাহে তাহার শতগুণ মানসিক বলক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। ক্ষুধা হইলেই খাইবার ইচ্ছা হয়। যদি ক্ষুন্নিবৃত্তির বস্তু গৃহে থাকে, তাহা হইলে মন আশ্বস্ত থাকে। যদি গৃহে তাহার অভাব থাকে, তাহা হইলে চৌর্য্যাদি বৃত্তির সহায়তায় সে অভাব পূরণ করিবার ইচ্ছা হইতে পারে। অনেক সময়ে কার্য্যতঃ ও তাহাই ঘটে; সুতরাং ঐ সকল কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় তাহার জীবনের অনেক উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তখন অন্নচিন্তা চমৎকারা "বাপার পেটেভরা" হইয়া উঠে। তবেই দেখুন ক্ষুন্নিবৃত্তির বস্তু গৃহে থাকা প্রার্থনীয় কি না? একবারে দুষ্প্রবৃত্তি মদিরায় মাতয়ারা হইলে সম্ভবতঃ কেহ সে নেশা পরিত্যাগ করিতে পারে না। যে একবার কুকার্য্য করে, বারান্তরে অন্ততঃ তাহার সে কার্য্য করিতে তত আশঙ্কা হয় না। অপিচ তখন অপেক্ষাকৃত শারীরিক বলের ক্ষয় অধিক হইবার সম্ভব। তুমি বলিতে পার বালকগণকে নৈতিক বলে বলীয়ান্ করিতে পারিলে সে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। আমি বলি তোমার সে সকল শ্রুতিমধুর নৈতিক বল, বাক্যে,—কার্য্যে পরিণত হওয়া সুকঠিন। যদি শিক্ষার জন্য বালকগণকে বনে পাঠাইতে পার; তবে বলি—
"ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং; হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং,"

ক্ষুধা হইলে খাওয়া উচিত, তাই বলিয়া গণ্ডে পিণ্ডে খাওয়া উচিত নয়। বালকের দন্তোদ্গম হইলেই তাহাকে দুধে দাঁতের উপযুক্ত কিছু কিছু চর্ব্য বস্তু দেওয়া উচিত, তাই বলিয়া ছোলা ভাজা বা নিয়ত চর্ব্য বস্তু দেওয়া যুক্তি সঙ্গত নয়। এরূপ অযথাভোজনে কি বালক কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ—সকলেরই যে অনিষ্ট হয়, তাহা সাধারণে স্বীকার করিয়া থাকেন। বিশ্ বৎসরের স্ত্রীর সহিত অযথা ব্যবহারে প্রাণহারাণও যা আর পঁচিশ বৎসরে তাদৃশ আচরণের ফলও তাই। এরূপ দুচারি বৎসর অধিক বাঁচিলে সামাজীক উন্নতি কিছুই সাধিত হয় না। তবে মানসিক বলে বলিয়ান হইতে পারিলে অযথা ব্যবহারে শারীরিক বলক্ষয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সে ঘটনেরও অন্তরায় ভূত আমরা হইয়াছি।

অপরিণত বয়স্কেরা যাহাদের চরিত্র অনুকরণ করিয়া শিক্ষা লাভ করিবে, অগ্রে তাঁহাদের এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। যদি তাঁহারা স্ত্রীর সহিত পশুবৎ ব্যবহার নাকরেন, তিথি নক্ষত্র (ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ নিষিদ্ধ কাল নির্দ্দিষ্ট আছে) বাছিয়া স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী অল্প বয়স্কেরাও তাহাই অনুকরণ করে—

"যদ্ যদাচরতি প্রাজ্ঞস্তত্তদেবেতরে জনাঃ।
সযৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া কার্য্য করিলে আর পদে পদে বিড়ম্বিত হইতে হয় না।

প্রথমতঃ বালকগণের আদর্শ মলিন. দ্বিতীয়তঃ যে বাপের বেটা—মানসিক বৃত্তিও তদ্রূপ মলিন, তৃতীয়তঃ শিক্ষা মলিন—এই ত্রিপুরস্কারে বালকগণের পরকাল নষ্ট হইতেছে। পশুবৃত্তি চরিতার্থ করাই তাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজের আচরণ পবিত্র কর, সেই সঙ্গে সঙ্গে বালকগণকে ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত নৈতিক শিক্ষার পুস্তক অধ্যাপনা করাও, তখন বুঝিতে পারিবে বাল্য বিবাহ শুভ ফলপ্রদ কি অশুভ ফলপ্রদ। রোগ নির্ণয় হইয়াছে, কিন্তু প্রতীকারের উপায় নির্ণীত হয় নাই। পায়ে বিস্ফোটক হইয়াছে, হাতে অস্ত্র করিলে কি হইবে? বাঙ্গালি শিক্ষার ও অনুকরণের অনুযায়ী ব্যবহারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। এ দুর্ব্বলতার কারণ বাল্যবিবাহ নয়।" উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া কি হইবে?

কেহ যেন বিবেচনা না করেন, দ্বাদশবৎসর বয়স্ক বালকের বিবাহের পক্ষপাতী। প্রকৃতি আমাদিগকে যে সময়ে বিবাহ দিতে ইঙ্গিত করে, সেই সময়ে বিবাহ দেওয়া উচিত। শাস্ত্রও সেই উদ্দেশ্যে বিধি বিধান করিয়াছেন। এবার পুরুষের পক্ষেই অধিক কথা লিখিলাম। বারান্তরে বালিকা বিবাহ সম্বন্ধে পাঠকগণের গোচরে পুনর্ব্বার উপস্থিত করিব।

বেদবাক্য।

আজ কাল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, পাশ্চাত্য বিদ্যার আলোচনায়, পাশ্চাত্য জাতির সংসর্গে লোকের মতি গতি ভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকেই হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় সকল বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আপনাদিগকে পরম বিজ্ঞ মনে করিয়া থাকেন; মধুমক্ষিকার ন্যায় নানাবিধ শাস্ত্র কুসুম হইতে কণা কণা মধু সংগ্রহ করিয়া একত্রে সকল মিসাইয়া এক অপূর্ব্ব রসের মধুচক্র প্রস্তুত করিয়া লন এবং শুশ্রূষুদিগকে দংশন জ্বালায় অস্থির করিয়া তোলেন। সেই সীমাবদ্ধ জ্ঞানময় মধুচক্রে আবদ্ধ থাকায় তাঁহাদের বুদ্ধিও সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার অতিরিক্ত বিষয় আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং তাঁহারা সকল বিষয়েরই যুক্তি শুনিতে চাহেন। যুক্তি না পাইলে তাঁহারা কোন কথাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য নহেন। বিশেষ বেদবাক্য। বেদে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের উল্লেখ আছে। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের যুক্তি না পাইলে তাঁহারা কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না। কিন্তু তাহার যুক্তি নাই। বেদ বলেন্ অমুক যজ্ঞ করিলে অমুক ফল হয়, কিন্তু কেন হয়, তাহার যুক্তি দেন নাই। হয় কি না হয়, তাহা ত পরকালের কথা; প্রত্যক্ষ হইবে না; অথচ যুক্তিও নাই। এই জন্য বেদবাক্য তাঁহাদের নিকট নিতান্তই অগ্রাহ্য। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন, বেদবাক্যে প্রমাণের আবশ্যক করে না. বেদ যাহা বলেন, তাহাই ঘাড় পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কেন? ইহারই বা যুক্তি কি? ইহার যুক্তি দেখাইতে পারিলে আর প্রত্যেক বাক্যের যুক্তি দেখান আবশ্যক হইবে না। মূল সেচন করিলে তাহাতেই শাখা প্রশাখারও সেচন করা হয়। তাই আজ ইহারই যুক্তি দেখাইতে অগ্রসর হইব। সে যুক্তি এই।—

বেদ বল, পুরাণ বল. কাব্য বল, সকলই উপদেশময়। লোককে অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত করা ও সৎপথে প্রবৃত্ত করা সকলেরই উদ্দেশ্য। সুতরাং সেই উদ্দেশ্যে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই উপদেশ। শাস্ত্রকার গণই বলিয়াছেন, সেই উপদেশ ত্রিবিধ, কান্তাসম্মিত, সুহৃৎসম্মিত ও প্রভুসম্মিত। কাব্যের মূল পুরাণ, পুরাণের মূল বেদ।

কাব্যে কান্তাসম্মিত উপদেশ আছে, পুরাণে সুহৃৎসম্মিত উপদেশ আছে এবং বেদে প্রভুসম্মিত উপদেশ আছে। কান্তা যখন স্বামীকে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন, তখন অগ্রে তাঁহার মধুর বচনেই স্বামীর মন আকৃষ্ট হয়, তার পর তিনি তাঁহার বাক্যের মর্ম্ম অবগত হইতে উৎসুক হন, এবং সেই মর্ম্ম তাঁহার মর্ম্ম স্থান পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে সমর্থ্য হয়। কাব্যও সেইরূপ। তাহার সুমধুর পদাবলী শ্রবণেই সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থ,কে। কাহারও নিকট কোন একটী কবীতা গ্রহ আবৃত্তি করিলে, সে তাহার অর্থ করিতে সমর্থ্য না হইলেও প্রথমতঃ ঐটী শুনিবার জন্যই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। তার পর উহার অর্থ জানিতে উৎসুক হয়। তেমন হয় ত, উহা তৎক্ষণাৎ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলে বা লিপি করিয়া নয়। সেই মধুর বচন বিন্যস্ত উপদেশ তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে গাঁথিয়া থাকে। এই ত গেল কাব্যের উপদেশ।

পুরাণের উপদেশ সুহৃৎসম্মিত। বন্ধু বন্ধুকে সৎপথে আনিবার জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি কেবল উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না; তাহার দুই একটী উদাহরণ দিয়া উহা বন্ধুর মনে গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা করেন। তিনি বন্ধুকে প্রথম বলিলেন ভাই মদ্য পান করিও না, উহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, মদ্য পান করিলে এলোমেলো বকিয়া লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হয়, শরীর দিন দিন রুগ্ন হইয়া পড়ে, অনর্থক অর্থব্যয় করিয়া শেষে অভাবে পড়িয়া কষ্ট পাইতে হয়।—এই বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইহাতে বন্ধুর মন না ফিরিলেও ফিরিতে পারে এবং যদিও ফিরে, তাহাও ক্ষণিক। তার পরক্ষণেই হয়ত ওকথা মিছা মনে করিয়া আবার সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে; সেই জন্য তিনি আবার কহিলেন। দেখ ভাই, অমুক মদ খাইত। মদ খাইয়া সে রাস্তায় ভয়ানক মাতলামি করিত, সেই জন্য তাহাকে কতবার পুলিশে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে। ২০০৲ টাকা বেতনের চাকরি করিত, কিন্তু মাতলামি করায় সে চাকরটি গেল। শেষে খাইতে না পাইয়া চুরী করিল, জেল খাটিল, তার পর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া খাইল। সে আগে কেমন বলিষ্ট ছিল; কিন্তু মদ ধরিয়া জীর্ণ শীর্ণ ও রুগ্ন হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইল।—এ কথায় বন্ধুর মন নিশ্চয়ই ফিরিবে। যখন তাহারই

মদ্য পানে অভিলাষ জন্মিবে; তখনই সেই ব্যক্তির দুর্গতির কথা মনে পড়িবে, তখনই একটু ইতস্ততঃ করিবে, এবং তখনই তাহার বিষময় পরিণাম ভাবিয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবে। পুরাণও এই রূপ। পুরাণ সৎপথে প্রবৃত্ত ও অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত হইবার কথা বলিয়া তাহার শুভাশুভ পরিণামের কথাও বলিল; শুধু তাই নহে, তাহার উদাহরণ স্বরূপ রাম রাবণাদির বিষয় বর্ণনা করিয়া লোকের মনে তাহা দৃঢ়তর করিয়া দিল।

কিন্তু বেদের উপদেশ প্রভুসম্মিত। প্রভু ভৃত্যকে আদেশ করিলেন,— অমুককে এখনই ডাকিয়া আন। কেন? কি জন্য? তাহার কিছুই বলিলেন না। ভৃত্যেরও তাহা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই।— তৎক্ষণাৎ অবনত মস্তকে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করাই তাহার কর্ত্তব্য।

তাহা না করিয়া কারণ অনুসন্ধিৎসু হইলে বা সে আদেশ প্রতিপালন না করিলে প্রভু কুপিত হইতে পারেন, তাহাকে যথোচিত দণ্ড দিতে পারেন, তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন। অতএব প্রভু বাক্যের কারণ অনুসন্ধান করা অতীব অনুচিত ও অতিশয় মূঢ়তার কার্য্য। বেদ বাক্যেও সেইরূপ। বেদ ঈশ্বরের সৃষ্ট। বেদবাক্য ঈশ্বর বাক্য। বেদে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিলে বা তাহার যুক্তি অনুসন্ধান করিলে ঈশ্বর কুপিত হইবেন; তিনি তোমাকে নরকে ফেলিবেন। তিনি আমাদের পরম পিতা, পরম প্রভু। তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা আমাদের অবশ্যই হিতকর। একাগ্রচিত্তে তাঁহার আদেশ পালন করিলে তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন করা হইবে এবং আমাদের সুমঙ্গল সাধিত হইবে। তাহা না করিয়া কুতর্ক কলুষিত চিত্তে তাঁহার বাক্যের যুক্তি অনুসন্ধান করা নিতান্তই মূঢ়তার কার্য্য ও অমঙ্গলের নিদান। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন বেদবাক্যে প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। বেদ যাহা বলেন, তাহা অসন্দিগ্ধচিত্তে সতত প্রতিপালন করিবে। অতএব বেদবাক্যে আস্থাবান্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বেদবাক্যে অবিশ্বাস করা বা যুক্তি অনুসন্ধান করা কোনমতেই উচিত নহে।

ক্রমশঃ

জাতিভেদ।

বহুদিন হইতে "জাতিভেদ" লইয়া সমাজ মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দুর জাতিভেদ প্রথা যে অত্যন্ত দূষণীয় তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য এক শ্রেণীর লোক বদ্ধ পরিকর হইয়া তর্ক যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা যে জাতিভেদ রূপ কুসংস্কার নিজ সুসংস্কৃত হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিয়াছেন তাহাই দেখাইবার জন্য ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও অভক্ষ্য ও অস্পর্শ দ্রব্যাদি সর্ব্বসমক্ষে অবলীলা ক্রমে ভোজন করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন না। তাঁহারা মনে করেন স্বেচ্ছাচারীর মত যেখানে সেখানে যেকোন অবস্থায় যাহা কিছু উপস্থিত হয় তাহাই উদরসাৎ করিলেই সভ্যতার আলোক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, ভারত মাতার দুঃখ মোচন হইল এবং ভারতবাসী স্বাধীনতার জয় পতাকা উড়াইয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হইল। ইহারা এইরূপ স্বকপোল কল্পিত বুদ্ধি বলে ভবিষ্যত ফলাফল স্থির করিয়া হিন্দুর পরম পবিত্র শাস্ত্র সকলের আদেশ বিধি প্রতি নানাবিধ ব্যাঙ্গোক্তি করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে ব্রাহ্মণেতর জাতিই অধিকাংশ। উহাঁরা সম্ভবত সমাজ মধ্যে ব্রাহ্মণের অতিশয় পদমর্য্যাদা দৃষ্টে ঈর্ষাণ্বীত হইয়া উক্তরূপ পাশবোচিত বৃত্তির প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা জানিবার জন্য ক্ষণমাত্রও তাঁহাদের ইচ্ছা বা চেষ্টা হয় না। সুতরাং, শাস্ত্রার্থ অবগত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে। এই সমস্ত অজ্ঞ ব্যক্তিই আবার আজ কাল ধর্ম্মবিচারক হইয়া সমাজকে পথভ্রান্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বিভ্রান্ত সমাজও আবার এই সমস্ত মূর্খের কথায় কর্ণপাত করিয়া ইহাদেরই উপদেশ শ্রবণ করিতেছে। যদি সমাজের অন্তসারবত্তা থাকিত এবং প্রত্যেক "বিষয়ের" প্রতি অভিনিবেশ থাকিত, তাহা হইলে এরূপ তৃণ গুচ্ছের ন্যায় সময়ের স্রোতে ভাসিয়া যাইত না। সমাজনীতি অতি কঠিন নীতি। রাজনীতি বল, ব্যবহার নীতি বল, বানিজ্য নীতি বল, এক ধর্ম্মনীতি ভিন্ন, সমস্ত নীতিই সমাজ নীতির নিকট অবনত মস্তক। সমাজ একটি দেহ বিশেষ। মনুষ্য দেহের যেরূপ কোন অঙ্গ বিশেষের বিকৃতি অথবা হানি হইলে সমস্ত দেহ একরূপ বিকৃত করিয়া দেয়, সেইরূপ

সমাজ রূপ শরীরে কোন এক অঙ্গের বিপর্য্যয় হইলে সমস্ত সমাজকে উহা আশ্রয় করিয়া থাকে। বলিতে পার, যে, শরীরের কোন অংশ বিশেষে অথবা স্থান বিশেষে পীড়া হইলে যেরূপ সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া আমরা দেহকে সুস্থ ও সবল করিতে চেষ্টা করি, সেইরূপ, সমাজ যদি শরীর বিশেষই হইল, তবে উহারও যদি কোন অংশের অথবা অবস্থা বিশেষের কোন পীড়া অর্থাৎ বিকৃতি হয় তাহাহইলে তাহারও চিকিৎসা করা কি আবশ্যক নহে? নিশ্চয়ই আবশ্যক। কিন্তু চিকিৎসা করিবার পূর্ব্বে রোগ নির্ণয় আবশ্যক। যাহাকে তুমি আমি রোগ বলি তাহা প্রকৃত রোগ কি না তাহা সম্পূর্ণ সন্দেহ স্থল। কারণ আমরা কেহই সুচিকিৎসক নহি। সমাজজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা সকলেই প্রায় সমান পণ্ডিত। এঅস্থায় আমাদের ন্যায় অজ্ঞের এতবড় গুরুতর বিষয় কেবল মাত্র "খেয়ালের" উপর নির্ভর করিয়া যথেচ্ছা বিচার বা সিদ্ধান্ত করা অতীব অনুচিৎ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি সমাজের প্রকৃত চিকিৎসক হইতে চাও তবে সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তন্ন তন্ন করিয়া ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ কর। তৎপর সমাজ সম্বন্ধে প্রাচীন, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী সুচিকিৎসকগণ কি বলিয়া গিয়াছেন তাহা সুবিস্তারে আলোচনা করিয়া তোমার দর্শনের সহিত সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা কর। এই সমস্ত সমাজ নীতিজ্ঞের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিয়া তবে যদি তুমি সমাজ সম্বন্ধে দুই কথা বলিতে অগ্রসর হও, তখন তোমার বাক্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির শ্রবণ যোগ্য হইবে। নচেৎ, পাগলের মত" জাতিভেদ মানি না" আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস করি না" "খাদ্যাখাদ্যের বিচার করি না," পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিই না" ইত্যাদি রূপ বৃথা চীৎকার করিলে কেবল তোমারই মত দুই চারি জন মূর্খই তোমার প্রলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মোহিত হইবে, কিন্তু পণ্ডিতগণ তোমায় উন্মত্ত ভাবিয়া হাস্য করিবেন। অতএব অগ্রে স্থিরচিত্তে ঋষি প্রণীত শাস্ত্রবাক্য অধ্যয়ন করিয়া তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণে যত্নবান্ হও, সদুপদেষ্টার আশ্রয় লইয়া শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়া অভিনিবেশ পূর্ব্বক শাস্ত্রাজ্ঞা পালন কর। এই সমস্ত করিয়াও যদি তুমি কোন ফল না পাও তখন তুমি শাস্ত্রকে পদদলিত করিয়া কর্ম্মনাশায় নিক্ষেপ করিও, তাহা হইলে আমরাও সানন্দান্তরে তোমার

কার্য্যে সহায়তা করিব। অর্থাৎ বৃথা অভিমানের দাস হইয়া আত্ম বিভ্রমে পড়িয়া সৎপথ পরিত্যাগ করিও না। কারণ তাহাতে তুমিত উচ্ছন্নে যাইবেই আবার তৎসঙ্গে সঙ্গেই কএক জন নিরীহ ব্যক্তিরও সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। এই যে তুমি "জাতিভেদ কিছু নয় কিছু নয়" বলিয়া চীৎকার করিতেছ, যদি তুমি শাস্ত্রোক্ত জাতিভেদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে, তাহা হইলে কখন এরূপ বৃথা চীৎকারে সময়াতিপাত করিতে না। সেই জন্ম আমরা জাতিভেদ যে কত গুরুতর জিনিষ তাহাই অদ্য কতকটা দেখাইতে অগ্রসর হইলাম। ইহাতে আমাদের নিজের কল্পনা প্রসূত একটি কথাও থাকিবে না। যাহা শাস্ত্রের মর্ম্ম ও মহাজনেরা যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাই আবার আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাই বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে আমরা জাতিভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রের মর্ম্ম কি তাহা বুঝিব, পরে অধুনা জাতিভেদ বিরোধীগণ কল্পনা বলে জাতিভেদের যে সমস্ত অকিঞ্চিৎকর কারণ নির্দ্দেশ করেন তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে খণ্ডন করিয়া দেখাইব।

সাধারণতঃ শাস্ত্রে হিন্দুকে চারি জাতিতে বিভাগ করিয়াছেন,— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র। ইহা ব্যতীত আরও অনেক অবান্তর জাতি আছে যাহাদিগকে বর্ণ শঙ্কর জাতি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি ইহা কোন মনুষ্যের অপূর্ব্ব বা অলৌকিক কল্পনা সম্ভূত নহে, অথবা অসভ্য জাতির কুপ্রথাও নহে। উহা জাতি শব্দের যে সাধারণ অর্থ তাহা পরিত্যাগ করে নাই। পশু মধ্যে ব্যাঘ্র জাতি, সিংহ জাতি, শৃগাল জাতি, প্রভৃতি স্থলে জাতি শব্দে যাহা বুঝায়, সেইরূপ মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি বলিলেও তাহাই বুঝাইয়া থাকে। অর্থাৎ, যে গুণ বা স্বভাব বা যে প্রকৃতি বিশেষ বস্তুর সহজাত, যে গুণ বা স্বভাব বা প্রকৃতি দ্বারা বস্তু সকল সাধারণ জ্ঞান হইতে বিশেষ জ্ঞানে গৃহীত হয়, যে গুণ বা স্বভাব বা প্রকৃতি বিশেষ দ্বারা কতকগুলি বস্তুকে এক জ্ঞানে লওয়া যায়, যে গুণ বা স্বভাব বা প্রকৃতি বিশেষ বস্তুর অপরিহার্য্য তাহারই নাম "জাতি"।—

এখন, প্রত্যেক বস্তুতে এইরূপ কতক গুলি করিয়া গুণ বা ধর্ম্ম থাকে,—যেমন, ব্যাঘ্রে প্রাণিত্ব, জঙ্গমত্ব, পশুত্ব, ব্যাঘ্রত্ব, প্রভৃতি অনেক গুলি ধর্ম্ম আছে। ব্যাঘ্রের যে প্রাণিত্বাদি ধর্ম্ম আছে উহা তাহার সহজাত গুণ বা স্বভাব। প্রাণিত্ব স্বভাব দ্বারাই ব্যাঘ্র জল মৃত্তিকাদি হইতে বিশেষ জ্ঞানে গৃহীত হয়। কিন্তু আবার ঐ প্রাণিত্ব স্বভাব দ্বারা ব্যাঘ্র, সিংহ, মনুষ্য ও অন্য সমস্ত পশু পক্ষী প্রভৃতিকে এক জ্ঞানে গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ প্রাণিত্ব মনুষ্যেও আছে, পশ্বাদিতেও আছে। এই প্রাণিত্বাদি স্বভাব ব্যাঘ্রের দুষ্পরিহার্য্য এইরূপ জঙ্গমত্ব ব্যাঘ্রের একটী সহজাত স্বভাব। জঙ্গমত্ব দ্বারা ব্যাঘ্র স্থাবর জঙ্গম প্রাণী হইতে বিশেষ জ্ঞানে গৃহীত হইয়া থাকে। জঙ্গমত্ব স্বভাব দ্বারা ব্যাঘ্রকে মনুষ্য, কীট, পতঙ্গাদির এক জ্ঞানে গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ ঐ জঙ্গমত্ব মনুষ্যেও আছে পশ্বাদিতেও আছে। জঙ্গমত্ব স্বভাব ও ব্যাঘ্রের দুষ্পরিহার্য্য। আবার পশুত্ব ও ব্যাঘ্রত্ব সম্বন্ধে ও ঐরূপ যথা সম্ভব যোজনা করা যাইতে পারে। অতএব যখন প্রাণিত্বভাবে লক্ষ্য করা যায়, তখন ব্যাঘ্র, মনুষ্য, পক্ষ্যাদি সমস্তই এক জাতি বলিতে হইবে। তদ্রূপ আবার কেবল জঙ্গমত্ব দৃষ্টিতে পশু ও মনুষ্য এক জাতি। কিন্তু পশুত্ব বা ব্যাঘ্রত্ব দ্বারা ব্যাঘ্রকে মনুষ্য হইতে পৃথক করা যায়। কারণ মনুষ্যের মধ্যে পশুত্ব বা ব্যাঘ্রত্ব প্রকৃতি বা স্বভাব নাই, কিন্তু ব্যাঘ্র মধ্যে এদুই আছে। সুতরাং আমরা এক দৃষ্টিতে ব্যাঘ্র এবং মনুষ্যকে এক জাতি মধ্যে পরিগণিত করিলাম, আবার অন্য দৃষ্টিতে অর্থাৎ প্রাণিত্বাদি অংশে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া লইলাম। ব্যাঘ্রের পশুত্ব ও ব্যাঘ্রত্ব এই পার্থক্যের কারণ। আবার ব্যাঘ্র পশুত্বাংশে অন্য পশুর সহিত এক জ্ঞানে গৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু ব্যাঘ্রত্বাংশে অন্য পশু হইতে পৃথক জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্যাঘ্রও পশু সিংহও পশু। সুতরাং পশুত্বাংশে ব্যাঘ্র ও সিংহ একই জাতি, কিন্তু ব্যাঘ্রত্ব এবং সিংহত্বাংশে এতদুভই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি।

এইরূপ মনুষ্য মধ্যেও কতক গুলি করিয়া ধর্ম্ম আছে। যেমন কোন মনুষ্যে প্রাণিত্ব, জঙ্গমত্ব, মনুষ্যত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব; কোন মনুষ্যে প্রাণিত্ব, জঙ্গমত্ব, মনুষ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব, কোন মনুষ্যে প্রাণিত্ব, জঙ্গমত্ব, মনুষ্যত্ব বৈশ্যত্ব ইত্যাদি। প্রাণিত্ব জঙ্গমত্বাদি মনুষ্যের যেরূপ সহজাত গুণ ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্বাদিও তদ্রূপ মনুষ্যের সহজাত গুণ। পশু মধ্যে ব্যাঘ্রের, ব্যাঘ্রত্বে সিংহের সিংহত্বে, সাধারণ পশু জাতিতে এক হইয়াও, যেরূপ বিসদৃশ, সেইরূপ মনুষ্য মধ্যে ও ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতিতে সাধারণ ভাবে মনুষ্যজাতিতে এক হইয়াও, পরস্পর সম্পূর্ণ বিসদৃশ। ইহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ব্যাঘ্রে ও সিংহে বাহ্যিক আকৃতিতে যেরূপ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়, কৈ ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে সেরূপ আকৃতিতে বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয় না কেন? আমরা বলি প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদিতেও পার্থক্য আছে।

ব্যাঘ্র ও সিংহের আকৃতিতে যেরূপ বিসদৃশ ভাব, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির আকৃতিতে তদপেক্ষা অধিক বিসদৃশভাব আছে। একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও একজন প্রকৃত ক্ষত্রিয় যদি একত্রে কখন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে বিসদৃশ ভাব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। এখন যে আমরা আকৃতিগত পার্থক্য দেখিতে পাই না তাহার মূল কারণ, যে. এখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ কি প্রকৃত ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র নাই। এখন এ জাতি চতুষ্টয়ই বিকৃত। যদি বলেন যে ব্যাঘ্র. সিংহের এ বিকৃতদশা হয় না কেন? উহাদেরত আকৃতি চিরকাল পরস্পর ভিন্ন। ইহা সত্য। কিন্তু কথা এই, যে মনুষ্য অন্তরে এমন একটি শক্তি আছে যাহার বলে সে আপনার প্রকৃতি বা স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয়, যাহা কেবল মনুষ্য ভিন্ন অন্য প্রাণির নাই,—সে পরিবর্ত্তন চাই ভালর দিকে হইতে পারে, মন্দের দিকেও হইতে পারে। উহার নাম বুদ্ধি। সেই জন্য মনুষ্য কখন পশু, আবার কখন দেবতা। বর্ত্তমান সময়ে ঐ বুদ্ধি শক্তির গতি অধঃপতনের দিকে চলিয়াছে, সুতরাং মনুষ্য আপন ভাগ্য লব্ধ শক্তি বলে নিজের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে। ব্রাহ্মণ অধঃপতিত হইয়া নানাবিধ বিরোধী প্রকৃতির আশ্রয় লইয়া নিজ মানসিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে, সুতরাং তৎসঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক আকৃতিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহাই আর সেরূপ তপস্তেজ সম্পন্ন সাক্ষাৎ সত্যের মূর্ত্তি ব্রাহ্মণ জাতি দৃষ্টিগোচর হয় না। সময়ে এসমস্ত ঘটিবে জানিয়া ভবিষ্যদ্দর্শী ঋষিগণ প্রকৃতি অনুসারে ব্রাহ্মণের, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, যবন প্রভৃতি দশ প্রকার বিভাগ করিয়াছেন। এইরূপ পরিবর্ত্তন ব্রাহ্মণের জাতিতে ঘটিয়াছে। কাজেই এখন আর পরস্পরের আকৃতগত পার্থ্যক্য বুঝা যায় না। তথাপি সূক্ষ্মভাবে ইহাদের পরস্পর পার্থ্যক্য আছে। যাঁহারা দিব্য চক্ষু সম্পন্ন তাঁহারা তাহা সুস্পষ্ট রূপে লক্ষ্য করিতে পারেন। এরূপ সাধু সন্ন্যাসী আমরা অনেক দেখিযাছি যাঁহারা মনুষ্যের বাহ্য আকৃতি দেখিয়াই তিনি কোন বর্ণের তাহা তৎক্ষণাৎ বলিয়াদেন। অতএব ব্রাহ্মণাদাদি জাতি যে মনুষ্যের প্রকৃত স্বভাব বিশেষ তাহা সম্পূর্ণ সত্য। ইহা মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয় নাই, সুতরাং মানুষ্যের সাধ্য নাই ইহার উচ্ছেদ্ সাধন করে। তুমি "মানি না" বলিলে যেমন ব্যাঘ্র সিংহের জাতি নামক পৃথক্ পৃথক্ স্বভাবের উচ্ছেদ হইতে পারে না, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি নামক পৃথক্ পৃথক্ স্বভাবের উচ্ছেদ ও সম্ভব নহে।

ক্রমশঃ

২য় ভাগ। সন ১২৯৪ সাল। ১১শ খণ্ড।

পরকাল।

মায়াময় এই সংসারের যে দিকে নেত্রপাত করা যায় বৈচিত্র ভিন্ন আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। কেহ কেহ সেই বৈচিত্রে বিমুগ্ধ হইয়া বৈচিত্রের আধার, বিষয় নিচয়ে একান্ত আসক্ত হইয়া তাহাদিগকে অত্যাদর করিতে থাকেন। এইরূপ আদর করিতে করিতে স্বন মহাজালে জড়িত হইয়া পড়েন। সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত অপসারিত হইলে ইহাদের মর্ম্মে আঘাত লাগে। কোন কিছুর নাশ আশঙ্কা উহাদের বিষয় প্রবণ অন্তরকে সময়ে উৎকলিকাকুল করিয়া তুলে। কিন্তু সেই আশঙ্কাকে অচিরে মোহপটে আচ্ছাদন করিয়া আবার বিষয় মমতায় সমাকৃষ্ণ করে। সংসারের অধিকাংশ লোকই এইরূপ। কে নাজানে? যে এ সংসারভবন অতিথি-শালা সদৃশ! তথাপি চিরবাসস্থান বলিয়া মনের ধারণা হয়। প্রণয় প্রতিমা ধর্ম্মপত্নী, স্নেহ পুত্তলিকা পুত্রকন্যা, পরমারাধ্য জনক জননী, ও দক্ষিণাঙ্গ স্বরূপ ভ্রাতৃবর্গ যেই হউক না কেন এমন এক সময় উপস্থিত হইবে যে, হয় তাঁহারা আমাকে ক্রমে ক্রমে চির পরিত্যাগ করিবে, অথবা আমিই তাহাদিগকে শোক-

সাগরের সুগভীরতলে নিক্ষেপ করিয়া ধরাধাম হইতে জন্মের মত বিদায় লইব। ইহা জানি, কিন্তু এই জ্ঞান থাকে না। তড়িৎ রেখার ন্যায় কদাচিৎ দেখাদিলেও অজ্ঞান-মেঘেরকোলে বিলীন হইয়া যায়। বিষয়-প্রশক্তি, অন্তরে প্রবল হইলে আপাততঃ বিষয় ভোগবাসনাকেই সুখজনক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। "আমার মৃত্যু হইবে" এই বোধ প্রায়ই হয় না। এতাদৃশ বিষয়-বিমুগ্ধ ব্যক্তির মনে পরকাল তত্ত্ব প্রতিভাত হয় না। সংসারই তাহার আরম্ভ ও অন্ত।

অপর কেহ, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ফলে, ব্রহ্মচর্য্যা প্রভৃতি দ্বারা বিষয়কে বিষজ্ঞানে একান্ত হেয় স্থির করিয়াছেন। বিষয় বৈচিত্রের উর্দ্ধে অবস্থান পূর্ব্বক ক্রমশঃ উন্নত হইয়া পরকালের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। পরম কারুনিক গুরুর অনুকম্পায় অজ্ঞান তিমির অপসারিত হইয়া জ্ঞান-বিভার পবিত্র জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছে। ইহাঁরা মৃত্যুকে ভয় না করিয়া আহ্লাদে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত। পরকালের জন্য তাঁহারা সংসারকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া পদদলিত করিতেছেন। পরকাল তত্ত্ব তাদৃশ ধার্ম্মিক-প্রবরের জ্ঞানময় পবিত্র প্রসন্ন নয়নে যেরূপ সুস্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু বিষয় প্রসক্ত দেহাভিমানীবিত্ত-মোহ-মূঢ় প্রমত্ত ব্যক্তি পরকালের জন্য প্রায়ই ব্যাকুল হয় না এবং তদ্রূপ পরকাল বুঝিতেও সক্ষম হয় না। কঠশ্রুতির যম ও নচিকেতা সংবাদই উহার অত্যুৎকৃষ্ট জলন্ত উদাহরণ। নচিকেতা কত উন্নত ও পবিত্র হইয়া পরকাল বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যম চিত্ত পরীক্ষণ বাসনায় অশেষ প্রলোভনে বিমুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন পরকাল মীমাংসার উপদেশ পরশুদ্বারা নচিকেতার হৃদয়স্থিত সংশয় তরুর ছিন্ন করিলেন। এবং শেষে বলিয়াছিলেন—

"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্ব্বশমা পদ্যতে॥

কঠ শ্রুতিঃ।

যাহারা বালক অর্থাৎ অবিবেকী, প্রমাদকারী পুত্র পশু প্রভৃতি আসক্তমনা, বিত্তাদি নিমিত্ত অবিবেক দ্বারা অজ্ঞান তামসাচ্ছন্ন ব্যক্তি, তাহাদের নিকট পরকাল প্রয়োজন প্রতিভাত হয় না। এবং তাঁহারা পরলোকে অনাস্থ হইয়া দৃশ্যমান স্ত্রী অন্ন পানাদি বিষয়ে আসক্ত হয়।

পরিশেষে তাহারই চিন্তায় বিভোর হইয়া পুনঃ পুনঃ আমার (যমের) বশ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ নিরন্তর জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

অধিকাংশ লোকই এইরূপ। ভাষ্যকার গুরুদেবও ইহাই বলিয়াছেন। "প্রায়েণ হ্যেবং বিধ এবলোকঃ। আমরা সকলেই যদি জগৎতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করি তবে ক্রমে ক্রমে আমাদের বিষয় বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইতে পারে। কারণ যাহা অনিত্য তাহার জন্য স্নেহ ও যত্নের দৃঢ়তা থাকে না। যাহা আমরা আপাততঃ সুখকর বলিয়া আসক্ত হই, তাহাও হৃদয়ের তমঃপঠ অপসারণ করিয়া পবিত্র দৃষ্টিতে দর্শন করিলে পরিণাম বুঝিতে পারিব। ইহা নিশ্চয় যে সকলকেই এক সময়ে দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। প্রাণাধিক পুত্রকেও এক সময়ে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেহ ও স্বজীবন রক্ষা করিতে দেখা যায়। সেই দেহ জীবন ও এক সময়ে পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেহী ও দেহের এবংবিধবিয়োগ সাধন অহরহ হইতেছে। সতত ইহার প্রত্যক্ষ হইতে কাহারও বাকি নাই। নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে ইহা বলা একান্ত বাহুল্য। জন্ম হইলেই ধ্রুব মৃত্যু। এই ভগবদ্বাক্য হেলন করিবার সাধ্য ভগবান ভিন্ন মানুষের নাই। এখন দেখা যাউক জন্ম কি? প্রাণিমাত্রই কোনও বীর্য্য হইতে উৎপন্ন। উহা অচেতন পদার্থ। অচেতন হইতে কখনও চেতন হয় না। অসৎ হইতে সদুৎপত্তি ঘটে না। চেতন ও অচেতন আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। এক পদার্থ হইতে তাহার বিপরীত পদার্থের উদ্ভব হয় না। প্রাণী উৎপন্ন হইতে কেবল বীর্য্যাধানই যে একমাত্র কারণ তাহাও বলা যাইতে পারে না। যদি পদার্থের মিশ্রণে দ্রব্যগুণে অচেতন হইতে চেতন উৎপন্ন হয় এরূপ বলিতে ইচ্ছা থাকে, তবে চার্ব্বাকের দেহাত্ম প্রত্যয় খণ্ডনবাদ সন্দর্শন করিলেই মনের ধাঁদা দূর হইতে পারে। দর্শন শাস্ত্রে উহার বিচার খণ্ডন আছে। এস্থলে উহার উল্লেখ তত আবশ্যক নাই। পিষ্ট পেষণ কে করে? তবে বলিতে হইবে বীর্য্যের মধ্যে চৈতন্যাঙ্কুর নিহিত থাকে তাহাই ক্রমে বীর্য্যযোগে একটী প্রাণীরূপে পরিণত হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতির পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় উহা বর্ণিত আছে। সূক্ষ্ম শরীর ক্রমে আহার্য্য দ্রব্যে সংশ্লিষ্ট হয় তাহাই খাদ্যের

পরিণাম শুক্রে অবস্থান করে। কালে উহা জঠরে ফলকতা প্রাপ্ত হয় এবং প্রসূত হইয়া একটী জীব রূপে প্রকাশিত হয়।

যদি বল যে আজ যাহার জন্ম হইল এই তাহার প্রথম জন্ম একথা যুক্তিযুক্ত নহে। যদি ইহাই প্রথম জন্ম হয় তবে অল্পে অল্পে পরমেশ্বরে পর্য্যন্ত বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য প্রভৃতি দোষ সংস্পর্শ হয়। একজনে সহজেই বুদ্ধিমান ও মনস্বী, অন্যে চেষ্টা করিয়াও কিঞ্চিৎ মেধাবী বা প্রতিভাশালী হইতে পারে না, ইহার কারণ কি? একজন দরিদ্র-গৃহে জন্ম লাভ করিয়া আজীবন দৈন্যদুঃখে অতিবাহিত করে, অন্যে চিরদিন সুখসাগরে সন্তরণ করিয়া নিশ্চিন্ত। একে বিষয় বিশেষে নৈপুণ্য-পরিচয় প্রদান করিয়া যশস্বী হইতেছে, আত্মপ্রসাদে চিত্ত প্রসন্ন, অন্যে সেই ক্ষমতার অভাব বলিয়া ক্ষোভে ম্লান, বিষন্নতা তাহার সহচর। একে সুস্বাদু উপাদেয় আহার্য্য আহার করিয়া পরিতৃপ্ত এবং ঔদার্য্যবশতঃ অপরের জঠরানলে পূর্ণাহুতি প্রদান করিতেছে; অন্যে স্বোদর পরিপূরণে অসমর্থ হইয়া দ্বারে দ্বারে যাচ্ঞা করিতেছে। ভাগ্যবশে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলেই আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করে। একে জন্মিয়া ইন্দ্রিয় গ্রামে বিষয় সুখ অনুভব করিতেছে অন্যে কোনও ইন্দ্রিয় বিহীন হইয়া মনস্তাপে দীন ক্ষীণ ও মলিন। একে দিব্য চক্ষে স্রষ্টার অপূর্ব্ব কৌশল সন্দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট অন্যে অন্ধ হইয়া অশেষ দুর্গতি লাভ করিতেছে। একে সভ্য মানব অন্যে অসভ্য পশুপম। একদল প্রাণী মানব। অন্য দল পশু তির্য্যক্ ও স্থাবর প্রভৃতি। জগতে এই বৈষম্যের কারণ কি? পরমেশ্বর বৈষম্য দোষে দুষ্ট নহে। পরব্রহ্ম নিরঞ্জন, নির্লেপ মুক্ত বুদ্ধ, ঈশ্বর বালকের ন্যায় ক্রীড়া পরতন্ত্র হইয়া কাহাকে দুঃখী বা সুখী করিতেছেন ইহা মুখে আনা দূরে থাকুক মনে করিলে ও পাপস্পর্শ ঘটে। বিবেক-বিমূঢ় ভিন্ন পরমেশ্বরে দোষ প্রদান কেহ করিতে পারে না। যদি অল্প বিবেক নিবন্ধন পিতামাতার স্কন্ধে অন্ধত্ব মূকত্ব প্রভৃতি দুর্ভাগ্যের নিদান বিন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাও তাহাও অযৌক্তিক। একের দোষের ফল অন্যে ভোগ করিবে কেন? জগৎপাতার নিয়ন্ত্রিত রাজ্যে এ অবিচার কদাপি সম্ভবেনা। একে পাপ করিবে অন্যে ফল ভোগ করিবে ইহা মতিমান লোকের মনোমন্দিরে ভ্রমেও প্রতি-

চিত হয় না*। তবে জগতে এরূপ বৈষম্য কেন একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। ভাবিতে ভাবিতে চিত্তের অবসাদ উপস্থিত হইবে তথাপি তত্ত্বনির্দ্ধারিত হইবার নহে। তবে একটী মাত্র কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যাহা শ্রৌত, সুতরাং অপৌরুষের নিত্য বলি এবং শিষ্টানুমোদিত। সেই কারণটী "কর্ম্ম"। জীব কর্ম্মানুসারে অসংখ্য যোনি পরিভ্রমণ করিয়া এক এক জন্মে স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম ফল ভোগ করে। এবং যাহার যেমন কর্ম্ম তেমন ফল ঘটে। পরমেশ্বর কর্ম্মানুসারে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। তাহা ভিন্ন তিনি ক্রীড়ণকের ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহার করেন না। যাহারা পিতা মাতার অনুষ্ঠিত কর্ম্মফল সন্তানের দুর্গতি লাভ স্থির করেন তাহারাও দুর্গতির কারণ, কর্ম্ম স্থির করিয়া থাকেন, তাহাতে এই একটী বিস্ময়কর মীমাংসার অবতরণ করেন যে, একের দোষের ফল অন্যে ভোগ করিয়া দুঃখী বা সুখী হয়। কর্ম্মস্বীকার করিতে হইলে সনাতন পবিত্র বেদ শাস্ত্রানুরূপ প্রকৃত কর্ম্ম স্বীকার করিলেই কোন আপত্তির উত্থাপন হইতে পারে না। কর্ম্মানুসারে জীবে বৈষম্য অবস্থা ঘটিয়া থাকে এতদ্‌সম্বন্ধে অতি সঙ্ক্ষেপে শাস্ত্র তাৎপর্য্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত
এষউ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনিষতে" ইতিশ্রুতিঃ
পুন্যো বৈ পুন্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন ইতি"

এবং বিধ বহু শ্রুতি বাক্য ভিন্ন স্মৃতিতেও উক্ত আছে যে প্রাণি কর্ম্ম বিশেষের অপেক্ষা করিয়া পরমেশ্বরের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ লাভ করিয়া থাকেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"। বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের চতুস্ত্রিংশৎ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান ভাষ্যকার উহার বিস্তার করিয়াছেন।

"যদি হি নিরপেক্ষ কেবল ঈশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মীতে স্যাতামেতৌ দোষৌ বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যঞ্চ, নতু নিরপেক্ষস্য নির্ম্মিতৃত্বমস্তি, সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মীতে। কিমপেক্ষতে, ইতিচেৎ,

* কোন স্থলে পিতামাতার রোগ সন্তানে প্রাপ্ত হয়। মৌলিক রোগও কর্ম্মভোগের ফল ভাবিলেই বুঝাযায়।

ধর্ম্মাধর্ম্মাব পেক্ষতে ইতি বদামঃ। অতঃ সৃজ্যমান প্রাণি ধর্ম্মাপেক্ষা বিষমা সৃষ্টি রিতি, নায় মীশ্বরস্যাপরাধঃ”।

পরমেশ্বর যদি কোন কিছু অপেক্ষা না করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিষম সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন তবে তাহাতে বৈষম্য ও নৈর্ঘ্ণ্য * দোষ স্পর্শ হইত। বাস্তবিক ঈশ্বর নির্দোষ, অতএব নিরপেক্ষ ঈশ্বরের নির্মাতৃত্ব নাই। ঈশ্বর কোন কিছু (কর্ম্ম) অপেক্ষা করিয়া বিষম সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি বল কি অপেক্ষায় এইরূপ সৃষ্টি হইল? ধর্ম্মাধর্ম্ম অপেক্ষা করিয়া এইরূপ সৃষ্টি হইল। অতএব সৃজ্যমান প্রাণিজাতের ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে বিষম সৃষ্টি সৃষ্ট হইয়াছে ঈশ্বরের কোন অপরাধ নাই। তাহার পর ভাষ্যকার আরও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন—

“ঈশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবৎ দ্রষ্টব্যঃ। যথা হি পর্জ্জন্যো ব্রীহি যবাদি সৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি, ব্রীহিযবাদি বৈষম্যে তু তত্তৎ বীজ গতান্যেবা সাধারণানি সমর্থানি কারণানি ভবন্তি, এবমীশ্বরো দেবমনুষ্যাদি সৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি। দেব মনুষ্যাদি বৈষম্যেতু তত্তজ্জীব গতান্যেবাসাধারণানি কর্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি”। এস্থলে ঈশ্বরকে পর্জন্যবৎ (মেঘের ন্যায়) দেখিতে হইবে অর্থাৎ যেমন ব্রীহি যবাদি সৃষ্টিতে মেঘ সাধারণ কারণ, ব্রীহি যবাদির বৈষম্যের কারণ মেঘ নহে; তত্তৎ বীজ গত বৈষম্যেই বিষম হইয়া থাকে তদ্রূপ ঈশ্বরও দেব মনুষ্যাদি বিষম সৃষ্টির সাধারণ কারণ, জীব গত কর্ম্মই তাহার অসাধারণ কারণ হয়।

এইরূপ ভূরি ভূরি আপ্তোপদেশে আমরা এই বুঝিতে পারি, যে, কর্ম্মানুসারে বিষম সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং কর্ম্ম ফল ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মাদি হইয়া থাকে। শাস্ত্র ও যুক্তি বিশদরূপে দেখাইয়া দিতেছে, কর্ম্মফল ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম ও বৈষম্য, তবে মোহপটে অন্তর সমাচ্ছাদিত, দর্শন অবিদ্যা কলুষে কলুষিত সেইজন্য বুঝিয়াও বুঝিনা দেখিয়াও দেখিনা।

কর্ম্মফল ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম হয় এই কথায় শাস্ত্র-শ্রদ্ধা-বিরহিত অথবা সন্দিগ্ধ ব্যক্তিগণ দুই একটী আপত্তি উত্থাপন করিতে

* ঘৃণা, অর্থ জুগুপসা দয়া প্রভৃতি, নৈর্ঘৃণ্য নির্দ্দয়তা প্রভৃতি।

পারেন। আমরা বলি আপত্তি না করাই ভাল, ভগবান বলিয়াছেন "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। অজ্ঞ, অবিশ্বাসী ও সন্দিগ্ধ ইহারা বিনাশ পায়। এই ভগবদ্বাক্য অবহেলা করিয়া মূলশূন্য তর্কে প্রবৃত্ত হইলে তত্ত্ব স্থির হইবে না। কেবল আপত্তিকারীরাই বুদ্ধিমান ও তর্ক কুশল আর আমরা কিছু বুঝি না এরূপ মনে করা অসঙ্গত। কেবল তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। অতীন্দ্রিয় বিষয় তর্কে স্থির করিতে না গিয়া সনাতন বেদের সুশীতল ছায়ায় বিরাম করাই কর্ত্তব্য। যদি শোনিতের উষ্ণতায় আমাদের এই সমস্ত কথায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া অবহেলা পূর্ব্বক তর্ক করিতে প্রয়াস থাকে তাহাতেও আমরা পশ্চাৎ পদ হইতে অভিলাষ করি না এবং স্বতন্ত্র প্রবন্ধেও উহা সবিস্তর লিপিবদ্ধ হইবে, তথাপি এস্থলে দুই একটি প্রধান তর্কের অবতারণা করিয়া আপত্তির নিরশন করা যাইতেছে।

প্রথম আপত্তি কর্ম্মাধীন জীবের পুনঃ পুনঃ জনন মরণ হইলে প্রথম জীব না হইলে কর্ম্ম কিরূপে হইল? আমরা বলি অনাদি সংসারে বসতি করিয়া এরূপ আপত্তি কেন? কিরূপে তর্কমুখে স্থির করিবে যে, প্রথম দম্পতী এ ধরাধামে আবির্ভূত হইল। ভাবিতে ভাবিতে ভাবনার অসীমতা ভিন্ন আর কি হইবে? সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি, তাহার প্রথম কি? যে চক্র নিয়ত ঘূর্ণায়মান তাহার প্রথম ঘূর্ণন কি? যদি বল প্রলয় হইয়া যখন সৃষ্টিপ্রবাহ নাশ পাইয়া আবার সৃষ্টি হইবে তখনই প্রথম, তাহাও নহে। সৃষ্টির পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে সৃষ্টি এই ক্রম সতত প্রচলিত, তবে প্রথম কাহাকে বলিবে? মানব কার্য্যের প্রথম ও শেষ আছে, ঐশিক কার্য্যের প্রথম কি? ঈশ্বর ভূমা সর্ব্ব গত নিত্য, নিত্যেশ্বরের কার্য্যে প্রথম কি? জন্মমৃত্যু সৃষ্টি প্রলয় নিয়তই হইতেছে এইজন্য সৃষ্টি অনাদি *। অনাদি সংসারে কর্ম্ম প্রথম কি জীব প্রথম এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই এইকথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইতে পারে। ঈশ্বর যতদিন সৃষ্টি প্রবাহ ও ততদিন, উহার আর প্রথম কি? এখন আর এক প্রশ্ন হইতে পারে এই যে পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্ম্ম ফলানুসারে সুখ দুঃখাদি ঘটিলে প্রতিকার চেষ্টা বৃথা। তাহাও নহে।

---

*ভাদ্রমাসের বেদব্যাসে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কারের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সংসার প্রায়ই ত্রিতাপে তপ্ত। তাপত্রয়ের উন্মূলন ক্ষমতা মানুষের আছে। গুরুর কৃপায় তাহা উন্মূলিত অথবা উন্মূলনে অধিকতর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে, সেইজন্য চেষ্টার আবশ্যকতা। আবার কর্ম্ম সকলও কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম ভেদে বিভক্ত কতক কর্ম্ম নিত্য, কতক কর্ম্ম বিহিত, কতক নিষিদ্ধ। কাহার ভোগে, কাহার প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পর্য্যবসান হয়। সেইহেতু কোন দুঃখের প্রতীকার চেষ্টাসাধ্য কোনটী বা শতচেষ্টায়ও পরিহার করা যায় না। তপস্যা বিমুখ, নিষিদ্ধসেবী, নিত্য কর্ম্মের অননুষ্ঠাতা ও প্রায়শ্চিত্ত পরাঙ্মুখগণ কোন্ কর্ম্মের কিরূপ ফল তাহা বুঝিতে পারে না, এইজন্য প্রতীকার চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। একটী উন্মত্ত শৃগাল গৃহমধ্যস্থ অনেক লোকের মধ্যে একটীকে দংশন করিয়া কোথায় পলায়ন করিল। এস্থলে অন্য লোক থাকিতে সেই একব্যক্তি দংষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে বসিল কেন? এইরূপ ঘটনা অহরহই দেখিতে পাওয়া যায়। এবং মাণ্ডব্য মুনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পতঙ্গ বিদ্ধ করা পাপে শূলারোহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্র ও লৌকিক দৃষ্টান্তে এরূপ ভূরিভূরি উদাহরণ পাওয়া যাইবে যে, অদৃষ্ট দোষে দুর্ব্বিপাক ঘটিয়া থাকে। কোন সময় কোন ক্লেশের প্রতীকার জন্য উপযুক্ত আয়োজন বিদ্যমানে ও প্রতীকার না হইয়া শেষ ফল ফলিয়া থাকে। তখন তাহার উত্তরে দুরদৃষ্ট ভিন্ন আর কি বলিতে পারা যায়। যদিও আমরা এস্থলে সঙ্খেপে কর্ম্মের গতি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিলাম, তথাপি ইহাতেই বুঝা যাইতে পারে যে কর্ম্মের বিপক্ষে যে কোন আপত্তির উত্থাপন কর তাহা নিরস্ত হইবে এবং অন্তিমে কর্ম্মের শরণ না লইয়া আর গত্য-ন্তর নাই। জীবকে যদি নিয়ত কর্ম্ম ফল ভোগ করিতে হয় তবে অবশ্যই ভোগের জন্য বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত হইতে হইবে। সেই জন্য এক একরূপে জন্ম হয় ও ভোগান্তে তৎকালোপাত্ত কর্ম্ম ফল ভোগ জন্য আবার দেহান্তর প্রাপ্তির আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং জন্ম-অবশ্যম্ভাবী। জন্ম হইলেই মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আবার মৃত্যুসদনে উপস্থিত হইতে হইবে। মৃত্যুর পরে পূর্ব্ব জীবনে উপার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। নচেৎ কৃত নাশ ও অকৃত প্রাপ্তি দোষের উপস্থিতি হইয়া থাকে।

"কৃতনাশা কৃতাভ্যাগময়োঃ কোবারকোভবেৎ ॥৮৫

চিত্রদীপ পঞ্চদশী।

"কৃতয়োঃ পুণ্যপাপায়োর্ভোগমন্তরেণ নাশঃ " কৃতনাশঃ," অকৃতয়োরকস্মাৎ ফলভোক্তৃত্বমকৃতাভ্যাগম এতদ্দোষদ্বয়ং। আত্মানোঽনিত্যত্বাভ্যুপগমে ভবেৎ"। টীকা

মৃত্যুমাত্রেই সমস্ত ফুরাইয়া গেলে, অথবা পুনর্জন্ম অস্বীকার করিয়া পরকালে অনন্ত উন্নতি বলিলে কৃতনাশদোষ ও অকৃত কর্ম্মের অকস্মাৎ ফল ভোগ হয় কি না পাঠকগণ বিবেচনা করুন্! মৃত্যু হইলে যদি সমস্ত ফুরাইয়া যায়, ইহজীবনের সহিত তৎকৃত কার্য্যের ফল না থাকে তবে পাপ ও পুণ্যের ভোগ ভিন্নই সমস্ত শেষ হইল। ইহাকেই কৃতনাশ দোষ বলে। আবার পাপের ভোগ হইল না পরকালে অনন্ত উন্নতি হইল স্বীকার করিলেও সেইরূপ দোষ হয়। অধিকন্তু যাহা করে নাই তাহার ফল,—অনন্ত উন্নতি হইল। পাপ করিয়া থাকিলে মরণান্তে পাপের ফল দুঃখ হইল না, যেহেতু অনন্ত উন্নতি, অনন্ত সুখ; অতএব অকৃত কর্ম্মফল লাভ হইল, এইরূপ পরকাল স্বীকার করিয়া আস্তিক হওয়ার সাধ বৃথা। প্রকারান্তরে নাস্তিকতার দুর্গন্ধ সমস্ত বিকীর্ণ হইয়া থাকে। আর্য্যগণ দিব্যচক্ষে উহা দেখিয়া বুঝিয়াছেন। বালক অথবা অনার্য্যগণেই পরকালে বিপ্রতিপত্তি দেখাইয়া নরকপথানুসরণে প্রবৃত্ত হয়। পরকালে যাহার আস্থা আছে, পরকালে অনন্ত সুখভোগের বাসনা আছে, সে, বিষয় বাসনা হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া নিত্যকর্ম্ম কাণ্ড যথারীতি সমাপন পূর্ব্বক শ্রীমদ্‌ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিয়া থাকে। আর্য্যশাস্ত্র তাহার গতি। বেদ যাহাদের প্রাণ, উপনিষদ্ আত্মা, জ্যোতিষ-গণিত যাহাদের বীক্ষণ, দর্শন যাহাদের দর্শন, পুরাণ যাহাদের বাহু, তাহারা কখনই পরকালতত্ত্ব বিমুখ নহে। বরং তাহাদের জ্ঞানময় অন্তর হইতে ঈশ্বরানুগ্রহে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই সত্য। সেই সত্যপথের পান্থ হইয়া মোক্ষধামে গমন করিতে প্রয়াস পাওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। দিন যায়, আয়ুঃ যায়, যাইতে যাইতে সমস্তই যাইবে, জীব কেবল সঞ্চিত অদৃষ্ট সম্বলে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিবে। সেই যাতায়াত নিবৃত্তির ক্ষমতা অধিকারানুরূপ সকলেরই আছে। কেহ ইহজীবনেই জীবন্মুক্ত কেহ বা দুইতিন জন্মের পর মুক্তিলাভ করিয়াছে ইতিহাসে ইহার উদাহরণের অসদ্ভাব নাই। লোকে আর কিছুকে ভয় না করিলেও মৃত্যুকে এক সময়ে ভয় করিয়া থাকে। সেই মৃত্যুও যাহার ভয়ে

ভীত; শাসনে শিষ্ট সেই যুক্তিদ তা, অতএব জনন নাশক জনার্দনের শরণ লও, অবশ্যই ভবভয় বিধ্বস্ত হইবে। বিষয় সুখের প্রায়ই তর্পণ নাই, উপভোগে হ্রাস পায় না, বরং বর্দ্ধিত হয়। অতএব এইবেলা বিষয় বিরাগের সাধনায় প্রবৃত্ত হও, স্বেচ্ছাচার হইতে সর্ব্বথা বিরত হও, এবং নাস্তিকগণের আপাত মনোরম পরিণাম বহু ক্লেশপ্রদ ইন্দ্রজাল বাক্যে মুগ্ধ হইয়া আত্মনাশ করিও না। আত্মহত্যা মহাপাপ। যাহা ভোগ হইতেছে তাহাও একজীবনের পরকাল ভোগ। আবার এখনকার কার্য্য ফল পরকালে ভোগ হইবে; এইরূপ জন্ম মৃত্যু পুনঃ পুনঃ ভোগ-করিতে হইবে।

আমরা জীব কি? পরকাল কি? কেন পুনর্জন্ম হয় তাহা পূর্ব্বাপর বলিয়াছি। শাস্ত্রের মর্ম্ম সঙ্ক্ষেপে বুঝাইয়াছি পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় বুঝিতে বাকি থাকিবেনা। তথাপি যদি ইহা অসম্পূর্ণ বোধহইয়া থাকে, তবে ভবিষ্যতে আরও লিখিব। অবসর হইলে ভোগ ও গতির বিষয় আলোচনা করিব। আগামীতে খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিব এরূপ বাসনা আছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহার বিশেষ প্রয়োজন দেখিতেছি। কারণ লোভ-ও স্বেচ্ছাচারে অনেকের রুচি দেখা যাইতেছে।

পূজনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পরিশিষ্ট।

ভগবদ্ভক্তগণ যখন জগতে ধর্ম্মপ্রচার মানসে জন্মগ্রহণ করেন, তখন স্বয়ং ভগবান্ যেন ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাদের পরীক্ষার জন্য অসংখ্য প্রবল শত্রু দ্বারা তাঁহাদের পরিবেষ্টিত করিয়া নিত্য নব নব লীলা প্রদর্শন করেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য প্রভৃতি আচার্য্যগণই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সুতরাং ইতিহাস দেখিয়া মনে হয় যে, যখন "বড় লোক" হইলেই তাহার শত্রু-অনিবার্য্য, তখন শত্রু সংখ্যা অধিক থাকা একরূপ বড়লোকের

চিহ্ন বিশেষ। শত্রুরাই গুণির প্রকৃত গুণ প্রচার করে, পরীক্ষার প্রচণ্ড অনলে পরিপক্ক করিয়া দেয়, মহাত্মার অন্তর্নিহিত ভাবরাশিকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। হিরণ্যকশিপু যদি সন্তানের উপর খড়্গহস্ত না হইতেন, তাহা হইলে শিশু প্রহ্লাদেরও হরির শ্রীপাদপদ্ম কামনায় এত অধিক উৎসাহ হইত না, ভগবানেরও ভক্তকে "রক্ষা" করিবার জন্য আবির্ভাবেরও প্রয়োজন হইত না, ধ্রুব যদি বিমাতা কর্তৃক অতি ঘৃণিত ভাবে ধিকৃত না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ের সে উত্তেজনাও হইত না তাঁহার পদ্মপলাশলোচনের দর্শনাকাঙ্ক্ষাও চরিতার্থ হইত না, সেইরূপই যদি শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য, ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্যপ্রভু সর্ব্বদা প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নিপীড়িত না হইতেন তাহা হইলে কদাচ তাঁহাদের ধর্ম্ম জীবনে এত উদ্যম ও উৎসাহ দেখা যাইত না। পরমহংসদেবেরও সেইরূপ শত্রুর অভাব ছিল না। যতই তাঁহার মহিমা প্রচার হইতে লাগিল ততই তাঁহার শত্রুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য বহুজনে তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ অনুযোগ অভিযোগ উপস্থিত করিয়া, তিনি যে অতি জঘন্য প্রকৃতির লোক তাহাই প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছিল। তাঁহার প্রতি প্রথম অভিযোগ,—তিনি অত্যন্ত যশোলিপ্সু ছিলেন। দ্বিতীয়,—সেই যশোলিপ্সার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেন ও তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য অনেক সময় ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের অনুকূলে মত দিতেন। তৃতীয়,—তিনি অত্যন্ত কদর্য্য প্রকৃতির লোকদিগকে প্রশ্রয় দেওয়ায় তাহারা তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাঁহার আত্মার বিশেষ অবনতি সংসাধিত করিয়াছে। চতুর্থ,—তিনি এদিকে পরমহংস ছিলেন অথচ তাঁহার সকের পরিসীমা ছিল না।

এখন আমরা এগুলি প্রকৃত অভিযোগের যোগ্য কি না তাহাই আলোচনা করিব। মানুষের "চেষ্টা" দেখিয়া তাহার অভিপ্রায় স্থির করিতে হয়। সুতরাং পরমহংসদেবের যে যশঃ প্রাপ্তি অভিপ্রায় ছিল কি না তাহা তাঁহার চেষ্টা দেখিয়াই স্থির করিতে হইবে। কিন্তু আমরা তাঁহার জীবনে কোনরূপ চেষ্টার কার্য্য দেখিতে পাই না। তাঁহার নিজের (অর্থাৎ আত্মোন্নতি) কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই ছিল না। [illegible] মধ্যে অনুরাগী ভক্তদের কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কখন [illegible]

আবাসে গমন করিয়া সংকীর্ত্তনাদির দ্বারা অমূল্য উপদেশ রাশি বিতরণ করিতেন। ইহাই যদি তাঁহার যশোলিপ্সার কারণ হয়, সে কারণ সহস্রবার প্রার্থনীয়। দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে আমাদের কেবল এইমাত্র জিজ্ঞাস্য, যে সম্প্রদায় বিশেষের সহিত তিনি কি স্বয়ং উপযাচক হইয়া ঘনিষ্ঠতা করিতেন, না তাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ঘনিষ্ঠতা প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতেন? ভগবদ্ভক্ত কাহাকেও উপেক্ষা করেন না। তিনি সকল ধর্ম্মই ঈশ্বরের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে সকলেরই মূল উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রাপ্তি। যদি উদ্দেশ্য সকলের একই হয়, তবে তাহার ভিন্নতায় কোনটী অধিকায়াস-সাধ্য, কোনটী অল্পায়াসলব্ধ, এইমাত্র বলিতে পারা যায়। চরমে কিন্তু জীব মাত্রেরই একই গতি ইহা নিশ্চয়। ইহাই হিন্দুর মত ও বিশ্বাস। হিন্দু বলেন যেখানে অকপট ভগবদ্ভক্তি আছে সেই খানেই সত্যের জ্যোতিঃ কিছু না কিছু বিভাসিত হইয়া থাকে। সত্য যাহা তাহা সকল সম্প্রদায়েই এক। সুতরাং পরমহংসদেব যখন সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তখন যেখানে সত্য আছে তাহার সহিত একত্ব সম্পাদিত হইবেই হইবে। এই কারণেই পরমহংসদেবের কথা সকল সম্প্রদায়ের অনুকূল বলিয়া মনে হইত। তৃতীয় অভিযোগ শুনিয়া আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয়; মনে হয়, যে ইহারা ভক্তের প্রকৃত লক্ষণ কি তাহাও অবগত নহে। ভক্তজীবনের লক্ষ্যই পতিতের উদ্ধার সাধন। তাই ভক্ত যতই ভক্তি সমুদ্রে ডুবিতে থাকেন ততই আনন্দে নাচিয়া বলেন "পান কর আর দান কর"। ভক্ত নিজের জন্যও যেমন কাতর জীবের জন্যও তেমনি কাতর। স্ত্রীজাতি সরলা, অবলা,—স্ত্রীজাতি দেবী; কেন না তাহারা একাকি আনন্দ উপভোগে নিতান্তই অক্ষমা। সরল ভক্তও তদ্রূপ একক ভগবৎপ্রেমানন্দ ভোগ করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না, কারণ তিনি দেবদেব। ভক্তপ্রবর পরমহংসের সরল প্রাণ দীন, হীন, পতিত দেখিলে কাঁদিয়া উঠিত। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রোড় প্রসারণ করিয়া তাহাদের আলিঙ্গন করিয়া তুলিয়া লইতেন। আমরা বিশ্বাস করি যে পতিতের সংস্পর্শে ভক্তের উপার্জ্জিত সম্পত্তির ক্ষয় হইয়া যায় সত্য,—কিন্তু ভক্তের যে মূল মন্ত্র "পান কর আর দান কর"। বিতরণ করিয়া না খাইলে সে অমৃত পরিপাক হয় না। সুতরাং সহস্র ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ভক্তগণ সর্ব্বদা বিতরণ তৎপর। পরমহংস

দেবও সেই জন্য অবাধে আশ্রিতদিগকে স্থান দিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার ভক্তোচিত কার্য্যই হইয়াছে। চতুর্থ অভিযোগটী শুনিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। পরমহংস,—বৈরাগ্যের অবতার পরমহংস কি না সৌখিন্? হাসিও পায়, দুঃখও হয়। তাঁহাকে নানারূপ বসন ভূষণ পরিতে দেখিয়া লোকে এইরূপ সন্দেহ করিয়াছে। তাঁহাকে অকস্মাৎ ক্ষণকালের জন্য দেখিলে এইরূপই অনুমিতি হইবার অধিক সম্ভব। কেন না, আদর করিয়া যে ভক্ত যেরূপ ভাবে তাঁহাকে বেশ ভূষায় ভূষিত করিতে ভাল বাসিতেন, তিনি সেইরূপ ভাবেই তাঁহাকে সাজাইতেন, তাহাতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন দ্রব্য তাঁহার সাধনার প্রতিকূলে না দাঁড়াইত ততক্ষণ তাহার একখানিও পরিত্যাগ করিতেন না, বালকের ন্যায় সজ্জিত হইয়া বসিয়া থাকিতেন। তদবস্থায় তাঁহাকে যিনি দেখিতেন তাঁহারই ঐরূপ ভ্রান্তি হইত। এইরূপ ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই তাঁহার নানারূপ কুৎসা রটাইত। কিন্তু মূঢ়েরা জানে না, যে ইতিহাস জ্বলন্ত ভাবে দিন দিন সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে "সকল স্থানেই ভগবদ্ভক্তের জয় অনিবার্য্য। কাহার সাধ্য ভক্তের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া তাঁহার ক্ষতি করিতে সক্ষম হয় সুতরাং এখানেও ভক্তেরই জয় হইল। শত্রুদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। পরমহংসদেবের স্থূলদেহ অন্তর্হিত হইয়াছে সত্য কিন্তু তাঁহার অজর অমর নিত্য বুদ্ধ মুক্তাত্মা তাঁহার প্রত্যেক ভক্তের হৃদয়ে জ্বলন্ত ভাবে দেদীপ্যমান থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। সাংসারিক লোক তাঁহাকে জানিল না তাহাতে তাঁহার ক্ষতিও নাই, বৃদ্ধিও নাই। ভক্ত সমাজে, ধর্ম্ম পিপাসুর নিকট, গুণীর কাছে তিনি যাবৎ "চন্দ্র সূর্য্য" বিদ্যমান্ থাকিবেন, তাবৎ তিনি সমাদৃত ও পূজিত হইবেন। লোকে তাঁহার এই অপূর্ব্ব চরিতামৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে।

আমরা এইরূপ সংক্ষেপে পরমহংসের জীবনের স্থূল স্থূল ঘটনাবলী সন্নিবেশিত করিলাম। ভবিষ্যতে আরও বিষদ করিয়া পরমহংসের জীবনী আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

নবমী পূজা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভোলাদাস।—অবলাচরণের পূজা কিরূপ তাহা আমি দেখি নাই।

জ্ঞানানন্দ।—দেখেন নাই! তবে প্রথম হইতেই বলিতেছি শুনুন,—দাদা! অবলাচরণ যে মাকে খড়ম, ছাতা পাখা, শাঁখা, আয়না, চিরণ, কৌটা, এবং খাট বিছানাদি উপদ্রব্য গুলি দিয়াছে, তাহা দেখিলে মায়ের দুর্গতি মনে করিয়া কান্না আসে। হতভাগা অবলা, যজ্ঞডুমুরের আটখানি চেলা কাঠে বলি লাগাইয়া মায়ের চারি জোড় খড়ম করিয়া দিয়াছে। কিন্তু উহার নিজের পায়ের খড়মজুড়ীর মূল্য বোধহয় দুটাকার কম নয়। তৎপর আস্ত-আস্ত এবং পরস্পরে-অসংযুক্ত কএকটি তালপাতা আনিয়া, তাহা নারিকেলের শলা দিয়া বিঁধিয়া, মায়ের ছত্র (?) দিয়াছে! কিন্তু দুর্ভাগ্য অবলা, সহস্র ছত্র ক্রয়েও কিছুমাত্র অসমর্থ নয়। তৎপর শাঁখা! দাদা মহাশয়! মায়ের সুবর্ণময় করপদ্মকয়টি যখন মনে পড়ে, তখন তাহাতে ঐ শাঁখা দিয়া সাজান, মনেতে কল্পনা করিলেও কম্পল উপস্থিত হয়। অবলা যেন কোথা হইতে আস্ত-আস্ত কতকগুলি কাটাশাঁখ (ছালী) আনিয়াছে তাহাতে আবার এক একটু হিঙ্গুল দেওয়া আছে, তাহাই মাকে শাঁখা (?) দিয়াছে! কিন্তু উহার স্ত্রীর গায়ে দশ হাজার টাকার গহনা! তদ্ব্যতীত, এক পয়সার চারিখানি আয়না এবং এক পয়সার চারিখানি চিরণ দিয়াছে। তৎপর, খাট ও বিছানার যে দুর্দ্দশা, তাহা দেখিলেই শ্মশান ঘাট মনে পড়ে। কিন্তু উহার নিজের শয়নের খাট, বিছানা ও মসারি বোধ হয় তিনশত টাকায়ও নিষ্পন্ন হয় নাই। তৎপর ভোগের দ্রব্য!—অবলা ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়াছে, সুতরাং রমণীদাসের ন্যায় "ইন্দুর প'ড়ে মূর্চ্ছা যাওয়ার" অবস্থা করিতে পারে নাই, দায় পড়িয়া উহাকে কিছু কিছু ভোগ দিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাও অতি অদ্ভুত।—দাদা মহাশয়! অবলার ভোগের কথা বলিতে গিয়া তাহা হইতেও অদ্ভুততর ভামিনীচরণ রায়ের ভোগের কথা মনে পড়িল! অতএব তাহাই আগে বলি,—ওঃ! কি পৈশাচিক ব্যাপার!! দাদা

গো! ভামির বাড়ী লুচি পুরির ভোগ দেওয়ার নাম আছে; কিন্তু তাহার বিশেষ বিবরণ শুনুন—ভামিনী পাকের পূর্ব্বে, নিজের পরিবার কএকটি এবং যাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করে তাহাদেরই খাওয়ার মত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করায়। তৎপর তাহার কিছু কিছু অংশ, একবার মায়ের ঘরে দেখাইয়া আনিয়া আপনারা খায়, এবং ঠিক্ ঠিক্ সেই নিমন্ত্রিত লোক কএকটিকে দেয়, কিন্তু তাহার নিয়ম আরও অধিকতর অদ্ভুত।

উহার বাড়ীতে, যাহাদের প্রণামী দেওয়া নাই, তাহাদের নিমন্ত্রণও নাই। কিন্তু প্রণামীও অবশ্যই সকলে সমভাবে দিতে পারে না; সুতরাং চারি টাকা দুইটাকা এবং এক টাকা এইরূপ শ্রেণীভেদ আছে। তন্মধ্যে, যে চারি টাকা প্রণামী দেয়, তাহাকে চারি আনা মূল্যের দ্রব্য খাওয়ায়, আর ৩৸৹ আনা লাভ থাকে। যে দুই টাকা দেয়, তাহাকে দুই আনার খাদ্য দিয়া অবশিষ্ট ১৸৶৹ আনা লাভ করে। আর যে একটাকা দেয়, তাহাকে ৶৹ আনার খাদ্য খাওয়াইয়া ৸৶৹ আনা লাভ করে। আর যাহারা কিছুই দেয় না, তাহাদের "প্রবেশনিষেধ"। তবে যদি কাহারও অনুরোধ উপরোধে, একখানি টিকিট বাহির করিয়া কেহ প্রবেশ করিতে পারে, তবে তাহার সেই প্রবেশ মাত্রই ফল। এইরূপ ভোগের দ্বারা ভামুর প্রায় ৩০০৲ টাকা লাভ থাকে, এবং তাহার দ্বারা কতকগুলি বেশ্যা এবং মদের কাজটা চলিয়া যায়। ইহাই ভামুর ভোগ।

কিন্তু অবলাচরণ চিরদিন পাড়াগাঁয়ে থাকে, কলিকাতায় কখনই যায় নাই। সুতরাং চক্ষুলজ্জাটা একবারে এড়াইতে পারে নাই, এই জন্য ভামুর ন্যায় ভাতের ব্যবসায় করিতে পারে নাই, কিন্তু তথাপি উহার ভোগ মায়ের গ্রহণীয় হয় না। দাদা গো! অবলা অনেক গুলি ডা'ল চা'ল পাক করাইয়া থাকে, কিন্তু সমস্তই উচ্ছো এবং অপরিষ্কৃত, সুতরাং মায়ের ভোগে লাগে না, দেয়ও না কিন্তু কেবল যশঃখ্যাতির নিমিত্ত, কতকগুলি লোক জনকে তাহা খাওয়ায়। আর মায়ের নিমিত্ত কেবল ৶১। সের আতপ চা'ল আর একপো ডা'ল এবং তিনখানি বেগুণ ভাজা মাত্র হবিষ্যের ঘরে রাঁধাইয়া থাকে। তৎপর, ছাগলটীকেও "তুভ্যমহং সম্প্রদদে" বলিয়া বধ করিয়া নানা রসে, নানা রঙ্গে পাক করিয়া নিজেরা খায়। হতভাগার

সেই অর্থব্যয়ও হয় পরিশ্রমও হয়, তথাপি মাকে দেওয়া হয় না! মাকে কেবল এক মুঠো আলোচেলের হবিষ্য দিয়াই সারে। অন্যান্য সকল প্রকার উপকরণ সম্বন্ধেও মাকে এইরূপ বঞ্চনাই করে। তৎপর উহার পুরোহিত ;— দাদা মহাশয়! পুরোহিতের কথা আর বলিবার নয়!. অবলার বাড়ীতে দুটো পুরোহিত থাকে, কিন্তু হতভাগ্য অবলা, তাহার মধ্যে বাছাই করিয়া, যেটা অধিকতর মূর্খ সেই টাকেই মায়ের পূজক কার্য্যে নিযুক্ত করে, আর যেটা কিছু কম মূর্খ সেইটাকেই তন্ত্রধারক করে; কিন্তু উভয়েই, ভক্তি. শ্রদ্ধা, বা আচার নিষ্ঠার অণুমাত্র ধার ধারে না। দাদা মহাশয়! এই দুজনে একত্রিত হইয়া অবলার মণ্ডপে যাহা করে তাহা দেখিলে, এক সময়েই আদি, করুণ ও শান্তরস ব্যতীত, আর ষট্ রসেরই উদ্দীপনা হয়। উহা অতীব অদ্ভুত! দাদা গো! ওদের সে দিনকার একটা কার্য্য শুনুন, তবেই সমস্ত মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

বোধনের দিন সন্ধ্যা বেলায় উহারা দুজনে একত্রিত হইয়া বেলতলায় গিয়াছে, বোধনের উদ্যোগাদিও হইয়াছে, তৎপর তন্ত্রধারক পুথি খুলিয়া বলিল,—" অথ রোধনং " তৎপর, পূজক কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিল,— " হাঁগা! একি বল্যে? " অথ রোধনং? " ইহার যে কোন অর্থ ই খুজিয়া পাই না? তোমার বোধ হয় দেখ্‌তে ভুল হ'য়েচে, অথবা পুতিথেই অশুদ্ধ আছে। কিন্তু আমার বিবেচনা হয় ঐ "রো"এর পরের অক্ষর "ধ" নয়, ওটা "দ" হইবে, " অথ রোদনং " এইরূপ পাঠ হবে; তা হলেই অর্থটাও বেশ বুঝা যায়।

তন্ত্রধারক। হ্যাঁ তাতো বটে, " রো'দনং এর অর্থটাতো সোজাই হয় বটে, কিন্তু এইরূপ পাঠটা যেন কখনও শুনেছি বলে মনে হয় না?

পূজক। তুমি উপবাসে ভুলে গিয়েছ, বাস্তবিক " রোদনং " পাঠই ঠিক্।

তন্ত্রধারক। তবে হবে কিন্তু তা কে ক'রবে? কর্ত্তা না পুরুত?

পূজক। এ সকল ব্যাপার ইতিকর্ত্তব্যতার মধ্যে গণ্য, উহা কর্ত্তাই ক'রবেন, পুরুত কেবল মন্ত্র পড়ার দায়ী, অতএব কর্ত্তাকে ডাক।

তন্ত্রধারক। ওরে! কে আছিস, একবার বাবুরে ডাক, শীগ্‌গির ক'রে ডাক, সময় ব'য়ে যায়।

(পুরোহিতের ডাকে অগত্যা অবলাকে আসিতে হইল,
এবং আসিয়া বলিল)—

অবলা। কি ঠাকুর! আমাকে কি ক'র্ত্তে হবে?

তন্ত্রধারক। একটা কথা কি, শাস্ত্রে যা থাকে, তা ছোট বড় সকলকেই কর্ত্তে হয়, তাতে মানাপমান বোধ কিম্বা লজ্জা করা উচিত নয়। শাস্ত্রের উপরোধে রাণী স্বর্ণময়ীকেও "স্বর্ণময়ী দাস্যা" বলিতে হয়, আবার শ্রাদ্ধের সময়ে কুলবধূকেও স্বামীর নাম লইতে হয়—

অবলা। ও সকল বল্‌তে হবে না, আমাকে কি ক'র্ত্তে হবে তাই বলুন না?

তন্ত্র। না এমন বেশি কিছু না, তা অন্যে না শুনিলেও কোনরূপ শাস্ত্র বিরুদ্ধ নয়; এই পূজার কাছে ব'সে, আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ একটু রো—রো—রোদন ক'র্ত্তে লেখা আছে।"

দাদা মহাশয়! তন্ত্রধারকের এই কথা শুনিয়া অবলাচরণ নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিল, বাড়ীতে তুমুল হুলুস্থূল পড়িল। অন্তঃপুরে তত্ত্ব গেল, তখন গোব্রাহ্মণ বধভীরু অবলার মাতা "কি হয়েছে কি হয়েছে' বলিতে বলিতে দৌড়িয়া বিল্বমূলে আসিলেন এবং আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনিয়া মনে করিলেন "এখন পুরোহিতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে "কুল পুরোহিত" থাকে না, অবলা এখনই উহাদিগকে তাড়ায়ে দিবে, কুল পুরোহিত পরিত্যাগ মহাপাপ, অতএব পুরোহিত রক্ষা করাই কর্ত্তব্য" এই স্থির করিয়া বলিলেন—হ্যাঁ,—তাইতো, একটু কা'ন্তেইতো হয়! আমি চিরদিন দেখেছি একটু কান্তেই হয়, পুরুত ঠাকুর (অদৃষ্টের) লেখা কথাই ব'লেছেন, তোমরা মিছা গোল ক'রো না। কিন্তু যার নামে সঙ্কল্প হয় তাকেই কা'ন্তে হয়। কর্ত্তার মৃত্যুর পর আমার নামেই সঙ্কল্প হয়, সুতরাং আমিই চিরদিন কেঁদে থাকি এবারও আমাকেই কা'ন্তে হবে। তোমরা ওদিক্ যাও" এই বলিয়া নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া নাতিতীব্র নাতিমৃদু স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন পুরোহিতদ্বয়ের বিদ্যাভিমান জলচ্ছিখ হইয়া উঠিল এবং পরস্পরে চুপেচুপে বলিতে লাগিলেন।

পুরোহিতদ্বয়। দেখ ভাই, যদি কা'ন্তে না বল্‌তেম তবে সর্ব্বনাশ ঘট্‌ত, "পূজার অঙ্গহীন" হয়েছে বলে এখনই অবলার মা

এসে কত তিরস্কার ক'র্ত্তো। আজ ঈশ্বর বড় রক্ষা ক'রেছেন,” ইত্যাদি।

এমন সময়ে আমার পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় এখানে আসিতে ছিলেন, তিনি হটাৎ ওখানে ক্রন্দন শুনিয়া ত্রস্তভাবে গিয়া বলিলেন,—

ভট্টাচার্য্য।—এ কি? কি হ'য়েছে? হঠাৎ কান্নাকাটী কেন? কোন ছেলেপিলের কোন বিপত্তি হয়েছে কি?

পুরোহিতদ্বয়।—না মহাশয়, না, কোন বিপদ্ না, অবলা বাবুর মা পূজার কান্নাটুকু কাঁ'দছেন।

ভট্টাচার্য্য।—পূজার কান্না!—তোমরা দুজন পুরোহিত হ'য়েছ ব'লে কান্না?

পুরোহিতদ্বয়।—আপনি প্রাচীন লোক, বিদ্রূপ করা আপনার ভাল দেখায় না। পুঁথির সর্ব্ব প্রথমেই “অথ রোদনং’ লেখা নাই কি?

ভট্টাচার্য্য।—সে “রোদনং” যজমান পুরোহিত উভয়ে মিলে ক'ল্লেই তো উচিত হয়!

পুরো।—(সরোষে) আপনি বারম্বার বিদ্রূপ ক'চ্ছেন কেন?

ভট্টাচার্য্য।—হতভাগ্য! ওটা “অথ রোদনং” নয়, ওটা “অথ বোধনম্”; “ইহার পর দেবীর বোধন বিষয় বলা যাইতেছে” ইহাই ঐ কথার অর্থ।

পুরো।—আমরা বালককাল হ'তে শুনে আশ্‌ছি যে “বেদে উহা নাই” অতএব আপনার কথানুসারে পুঁথিকাটিতে পারিব না।

এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর কিছু না বলিয়া অবলার পূজার দশা চিন্তা করিতে করিতে আমার বাড়ী আসিয়া সমস্ত বিবরণ বলিলেন ইহাই অবলার পূজা! *

নবমী পূজার এই পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইয়াই এ প্রবন্ধ এখানেই শেষ হইল। কারণ এই প্রবন্ধটী পুস্তকাকারে বিশেষরূপ সংবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এখন যদি পুস্তক হইতে কাটিয়া বেদব্যাসে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করা যায় তাহা দেখিতে ভাল বোধ হয় না। সুতরাং আমরা বাধ্য হইয়াই এ প্রবন্ধ প্রকাশ বন্ধ করিলাম। বেঃ সং।

---

* এই প্রসঙ্গের স্থূল মর্ম্মটি সত্য, এবং ইহার সমজাতীয় ঘটনা অনেক স্থানেই ঘটিয়া থাকে সুতরাং ইহাতে সমাজের প্রকৃত চিত্রই প্রদর্শিত হইল, অতএব রহস্য মনে করিবেন না।

প্রাতঃকৃত্য।

(অনুবৃত্ত)

পৃথীবির উপর প্রথম পদক্ষেপের পূর্ব্বে "প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" এই বলিয়া নমস্কার করিবার তাৎপর্য্য আছে। পাঞ্চভৌতিক মানব-দেহে পার্থিব উপাদানই প্রধান বা সর্ব্বাধিক এবং বসুধা মাতা মানব শরীরাবস্থানের একমাত্র অবলম্বন ও জীবিকা নির্ব্বাহের মুখ্য উপায়। আমরা প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে শয্যাশয়ন পর্য্যন্ত অনন্যোপায় হইয়া সেই পৃথীবির উপর পাদ তাড়না করিয়া থাকি। রজনীতে শয়ন সময়ে সেই অপরাধের ক্ষণমাত্র অবসান হয়, আবার প্রতি প্রাতঃকালে তাহার প্রত্যারম্ভ হয়। বসুধা মাতা ক্ষমাশীলা জননীর ন্যায় সর্ব্বংসহা হইলেও অপরাধের সূচনায়ই অণুমাত্র পরিহার স্বরূপ নমস্কার করা বিধেয়। উক্তমন্ত্র মাতৃ-পুত্রভাবের পরিচায়ক বটে। প্রিয়দত্তার অর্থ (প্রিয়ায় স্নিগ্ধায় অপত্যায় দত্তা ত্যক্তা) প্রিয় সন্তানের জন্য আত্ম-ত্যাগিণী।

কৃতজ্ঞ,—হৃদয়ে সেই ধরা দেবীকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। আর্য্য-গণ আরও জানিতেন এই প্রকাণ্ড পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূত ও অপরি-চ্ছিন্ন সূর্য্যাদি প্রকট পদার্থ সমুদায় জগন্ময় ভগবানের একটী একটী উৎকট শক্তি কর্ত্তৃক অধিকৃত, তাহাই অধিদেবতা পদ বাচ্য। যেমন মৃদাদি অচেতন বস্তুর সমষ্টি স্বরূপ জন্তুদেহ সঞ্জীবনী শক্তি কর্ত্তৃক পরিচলিত এবং সেই শক্তি সকলের কার্য্যের লক্ষ্য ও মৃদাদি জড়পিণ্ড নহে। তদ্রূপ পৃথিব্যাদি জড় বস্তুস্থিত অধিদেবতা আমাদিগের অভিবাদনের উদ্দেশ্য। সেই প্রাণি দেহস্থ জড়পিণ্ডের প্রতি অত্যাচার বা সদাচরণ করিলে সঞ্জীবনী শক্তির রোষ বা তোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্থূল পৃথিব্যাদি যন্ত্রের প্রতি কোন আচরণ করিলে তদীয় অধিদেবতা রোষ করেন। এই জন্য শাস্ত্রে পৃথিব্যাদি মহাভূতকে দেবাদিদেব মহাদেবের মূর্ত্তিভেদ বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে। মনুষ্যাদি জঙ্গম শরীরে সঞ্জীবনী শক্তি যাদৃশ স্থূল দৃষ্টিতে অনুভূত হয়, বৃক্ষাদি উদ্ভিদে তদ-পেক্ষা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, এইরূপ পৃথিব্যাদি স্থূল

পদার্থের অধিনায়িকা শক্তির অনুভবে আরও সূক্ষ্মতম দৃষ্টির আবশ্যক হয়, তাহা আর কিছুই নহে, কেবল জ্ঞান, সেই জ্ঞান সাধন সাপেক্ষ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নলাদি রাজর্ষিগণের নাম কীর্ত্তনের প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজন কি? ক্রমে তাহার নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

(১) মানসিক, বাচনিক ও কায়িক এই তিন প্রকার সাধন। তন্মধ্যে নামকীর্ত্তন,—স্তব পাঠাদির দ্বারা বাচনিক সাধন সম্পাদন হয়। শাস্ত্র বলেন—

"মনসা সংকল্পয়তি, বাচাভিলপতি, কর্ম্মনাচোপ পাদয়তি"

হারীত সংহিতা।

(২) শেষোক্ত উপায়দ্বয় দ্বারা মনকে বিশুদ্ধ করাই মুখ্য লক্ষ্য। নামকীর্ত্তন, স্তব পাঠাদির দ্বারা তদীয় মহিমা হৃদয়াকর্ষী হইয়া তাহার বিবৃদ্ধি করিয়া দেয়। অমনস্বি লোকের শুদ্ধ স্মরণ হওয়া দুর্ঘট। অর্থ-গ্রহ ও মধুর স্বর সংযোগে পাঠ বা কীর্ত্তন করিলে সাধারণের সেই লক্ষ্য দেবতা বা দেবোপম মানুষের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিবেই, গান তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ। শাস্ত্রে বিস্পষ্টতা, স্থিরভাব কলস্বর সংযোগ, অর্থবোধ ও তন্মনস্কতা সহকারে পাঠের ব্যবস্থার উল্লেখ আছে।

"বিস্পষ্টমদ্রুতং শান্তং সপষ্টাক্ষর পদং তথা। কলস্বর সমাযুক্তং রসভাব সমন্বিতম্। বুধ্যমানঃ সদা শুদ্ধো গ্রন্থার্থা কৃষ্ণশোনৃপ॥"

ভবিষ্য পুরাণ।

"শুদ্ধেনানন্য চিত্তেন পঠিতব্যং প্রযত্নতঃ।
নকার্য্যাসক্ত মনসা কার্য্যং স্তোত্রস্য বাচনম্॥"

মৎস্য সূক্ত ও বারহী তন্ত্র।

(৩) সুস্বরাদি সংযোগে নাম কীর্ত্তনাদি দ্বারা যে কেবল উচ্চারয়িতার মনে ভক্তির বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে, শ্রোতৃগণের ও চিত্ত বৈচিত্র্য হইবেক্। যিনি বারাণসীতে ভগবান্ বিশ্বনাথের সান্ধ্য আরতি গাথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি এই রহস্যের মর্ম্ম বিশেষ প্রকারে বুঝিবেন।

এই জন্য পার্থিব দেবতা ও নর চরিতের চরমোৎকর্ষ আদর্শ রাজর্ষি নল, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, যুধিষ্ঠির ও নারীরত্ন দময়ন্তী প্রভৃতির প্রতি প্রাতঃ-কালে শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক বহির্দ্দেশে আসিয়া নাম কীর্ত্তনের বিধান হইয়াছে।

এতদ্দ্বারা গৃহপতি কেবল মাত্র স্বয়ং উপকার লাভ করিবেন না, কিন্তু সংসার ভুক্ত পুরুষ ও নারীদিগকে অলৌকিক চরিত্রের প্রগাঢ় শিক্ষা দিবেন্। উচ্চৈস্বরে উচ্চারণকে কীর্ত্তন বলে।

"কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্যচ
ঋত পর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্॥"

মহাভারত।

"কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহু সহস্রভৃৎ।
যোঽস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম প্রাতরুত্থায় মানবঃ।
নতস্য বিত্তনাশঃ স্যান্নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ॥"

মৎস্য পুরাণ।

যিনি মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারেন যে, রাজর্ষি নল কতদূর চরিত্রোৎকর্ষশালী ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে পুণ্যশ্লোক বলিত। যিনি শত সহস্র অশান্তির কারণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও অপ্রহতচিত্তে কেবল সহিষ্ণুতা গুণ ও ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া কলি বা অশান্তির অধিনায়ককে জয় করিয়াছিলেন, তিনি কি সাধারণের আরাধ্য বা অনুকার্য্য নহেন? যিনি দিক্পালগণের দৌত্য অনুরোধে হস্তগতা নারীরত্ন দময়ন্তীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই নল কি মানুষ? যে দময়ন্তী দিক্ পাল-গণকে ও উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বসঙ্কল্প অনুসারে মনুষ্য নলে অনুরক্তা ও তন্নিমিত্ত অশেষ যাতনা ভোগ করিতেও অকুণ্ঠিত, তিনি কি সতীগণের শির স্থানীয় নহেন? কলি কেবল নল ও দময়ন্তীর নিকটে পরাজিত নহে, কিন্তু তদীয় বিপদ্বন্ধু কৃতজ্ঞ কর্কোটক ও রাজর্ষি ঋতপর্ণ ঘটিত উপাখ্যান যেখানে আলোচিত হইবেক্ সেইখানে কলহদেবের যাইবার অধিকার নাই। কলি শব্দের অর্থ—কলহ বা অশান্তি, তাহার অধিদেবতা বলিয়া চতুর্থ যুগরাজ কলি নামে অভিহিত।

"তদর্থ মত্যর্থ কলি র্ব্বভূব"।

বিষ্ণুপুরাণ,

এইজন্য কলিশব্দ কলহার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আর্য্যগণ একান্ত শান্তি পরায়ণ ছিলেন। শান্তির পূর্ণাবস্থাই মুক্তি।

"শান্তি মাপ্নোতি নৈষ্টিকীম্।"

ভগবদ্গীতা।

এইরূপ শান্তি বিধ্বংসি—কলি-জয়ী-ব্যক্তি কি আর্য্য গৃহে প্রাতঃস্মরণীয় নহেন? কলি যে সকল আপদের অভিনেতা; অনুদিন তাহাকে পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। ছন্দোগ পরিশিষ্টে উক্ত হইয়াছে।

"শ্রোত্রিয়ং সুভগা গাঞ্চ অগ্নি মগ্নিচিতন্তথা।
প্রাতরুত্থায় যঃ পশ্যেৎ আপদ্ভ্যাঃ সবিমুচ্যতে॥
পাপিষ্ঠং দুর্ভগাং মদ্যং নগ্নমুৎকৃত্ত নাসিকং।
প্রাতরুত্থায় যঃ পশ্যেৎ তৎকালে রূপ লক্ষণম্॥"

বেদবিৎ ও কর্ম্ম নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সতী স্ত্রী, মানব জাতির চির জীবনের উপকারী এবং শান্ত পশু গরু, আর্য্য সন্তানগণের সকল সংস্কার ও ব্যবহারের প্রধান সাধক; গুরু স্থানীয় অগ্নি এবং সেই অগ্নি সিদ্ধ বা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে দর্শন করিলে আপদের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেক। শ্রোত্রিয়াদি দর্শন করিলে মনে শান্তি বা শুদ্ধভাবের উদয় হয় না কি? পক্ষান্তরে কলি সহচর বা অশান্তির উদ্দীপক ঘোর পাপাসক্তজনগণ, অসতী স্ত্রী, মানসিক বিকার বর্দ্ধক বিবসন ও নাসিকা বিহীন ব্যক্তিকে দেখিতে নিষেধ আছে।

আমরা অনেক পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আর্য্যগণ স্বর্গ ও সংসার, ধর্ম্ম ও কাম, যোগ ও ভোগের সামঞ্জস্য প্রয়োগ পরায়ণ ছিলেন এবং প্রতিক্ষণে তদ্রূপ শিক্ষা দিতে ব্যগ্র ছিলেন। সেই জন্য আর্য্য শাস্ত্রে প্রত্যহ অতুল ঐশ্বর্য্য ও প্রবল পরাক্রমশালী ও ধর্ম্ম প্রাণ নলাদি রাজর্ষি (রাজা-অথচ ঋষিগণের নাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা।

রাজর্ষি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন এই নিমিত্তই প্রাতঃকীর্ত্তনীয়।

কার্ত্তবীর্য্যের কীর্ত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বাচার্য্যগণ—যাহা বলিয়াছেন—তাহা এই।

"ননূনং কার্ত্তবীর্য্যস্য গতি যাস্যন্তি পার্থিবাঃ। যজ্ঞৈর্দানৈ স্তপোভির্ব্বা প্রশ্রয়েণ শ্রুতেন বা॥ ১॥" আবার

"সংগ্রাম নির্ব্বিষ্ট সহস্র বাহুঃ অষ্টাদশ দ্বীপ নিখাত যূপঃ।
অনন্য সাধারণ রাজ শব্দো; বভূব যোগী কিল কার্ত্ত বীর্য্যঃ॥ ১।

এইরূপ বাহ্য ও আন্তরিক সম্পত্তির অধিকারী কার্ত্তবীর্য্য যাহার অনুকার্য্য, তাহার সম্পত্তির কি বিপত্তি আছে?

ক্রমশঃ

আত্মা।

আত্মার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় দার্শনিক দিগের মতামত তুলনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মিল, বেন, হিউম প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় দার্শনিকেরা বলেন যে আত্মা কেবল অনুভূতি সমূহের সমষ্টি (Series of the states of consciousness) আত্মার এইরূপ লক্ষণ করিয়া তাঁহারা তৃপ্ত নহেন। এই সঙ্গে তাঁহারা একটী গুরুতর সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছেন যে বর্ত্তমান বিষয়মাত্র অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি আত্মাকে অথবা "আমাকে" কেবল অনুভূতির সমষ্টি বলা যায় তবে অনুভূতির সমষ্টি কিরূপে গতবিষয় "স্মরণ" করিয়া থাকে, কিরূপেই বা ভবিষ্যত বিষয় "আশা" করিতে পারে। consciousness is only present, how can it expect & remember" মিল নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে তিনি এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অসমর্থ। দার্শনিক গণের মতে" আত্মা কি" ইহা স্থির হইল না। জার্ম্মন দেশীয় প্রধান দার্শনিক ক্যাণ্ট আত্মাকে আর একপদ ঊর্দ্ধে তুলিয়াছেন। ক্যাণ্ট বলেন যে আত্মা কেবল অনুভূতি সমূহের সমষ্টি নহে। কিন্তু যে অন্তর্নিহিত শক্তি মনের সমস্ত কার্য্যকে আবদ্ধ করিয়া রাখে অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা আমরা বলিয়া থাকি যে এই সমস্ত মানসিক কার্য্য "আমার" তাহার নাম আত্মা। State of consciusness belong to me; this uniting principle or the Synthetie unity of apperception is আত্মা।

ক্যাণ্ট ইহার অধিক স্বীকার করেন নাই। তাহার মতে আত্মা যে আছে এইটুকু মাত্র আমরা অনুভব করিতে পারি। কিন্তু আত্মার স্বরূপ কি, কিরূপে আত্মার কার্য্য হইয়া থাকে ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিবার শক্তি মানবের আদৌ নাই। শুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব মাত্র আমরা প্রমাণ করিতে পারি, কিন্তু আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে নানাবিধ ভ্রমে পতিত হইতে হয়। ইংলণ্ডে ক্যাণ্টের একদল শিষ্য আছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আত্মা সম্বন্ধে আরও অধিক স্বীকার করিয়া-

ছেন। ম্যানসেল বলেন, যে, আমরা যে কেবল মাত্র আত্মার অস্তিত্ব মাত্র জানি এরূপ নহে, আমরা আত্মার স্বরূপও কতক অংশে নির্ণয় করিতে পারি। অর্থাৎ আত্মা যে নিজেই নিজের বিষয়, নিজের কার্য্য জানিতে পারে, ইহা আমরা অনুভব করিতে পারি (self is conscious of its own nature)। জর্ম্মন দেশীয় আর একজন পণ্ডিত উপরোক্ত মতের বিরোধী। ইউবারভেগ বলেন যে মানসিক কার্য্যের অনুভূতি মধ্যে একটি আর একটিকে অনুভব করে এই কথা বলা যায় না। এখানে কর্ত্তা কর্ম্মের প্রভেদ নাই, যিনিই অনুভব করিতেছেন তিনিই অনুভূত পদার্থ। অর্থাৎ অনুভব কর্ত্তা ও অনুভূত বিষয় মানসিক ব্যাপার, দুই এক, (In internal perception there is no distinction between subject and object &c)। দর্শন ও দৃষ্ট, কর্ত্তা ও কর্ম্ম; অনুভব কর্ত্তা ও অনুভূত পদার্থ, এইরূপ প্রভেদ আত্মা ব্যতীত অন্য পদার্থের অনুভূতিতেও হইয়া থাকে। অর্থাৎ যখন আমি আমার নিজের অভ্যন্তরিক কার্য্য প্রত্যক্ষ করি, তখন যিনি দর্শক তিনিই দৃষ্ট বস্তু। কিন্তু যখন বহির্জগতের কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করি তখন দর্শক ও দৃষ্ট বস্তুতে পার্থক্য থাকে। আমি দর্শক এবং বৃক্ষ দৃষ্ট পদার্থ। কিন্তু এখানেও এইরূপ বলা যাইতে পারে যে আমি ও আমার ক্রোধ এক বস্তু নহে; আমি দর্শক আমার ক্রোধ দৃষ্ট পদার্থ। ইয়ুবারবেগ এইরূপ প্রভেদ স্বীকার করিয়াও প্রমাণ করেন যে ক্রোধ আত্মা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। যে মুহূর্ত্তে ক্রোধ হৃদয়ে জাগিয়া উঠে সেই মুহূর্ত্তেই ইহা আত্মার অংশ হইয়া যায়। যখন ইহা আত্মার অংশ হইয়া যায় তখন এই পূর্ণ আত্মা আপনার অংশকে (যাহাকে ক্রোধ বলা হইয়াছে) অবলোকন করিতে থাকে। এইরূপে আত্মা প্রতিনিয়ত সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। যদিও সমস্ত মানসিক পদার্থ এই আত্মার মধ্যে বীজ রূপে নিহিত থাকে, তথাপি আমাদের বয়োবৃদ্ধির সহিত সুপ্ত বিষয় গুলি ক্রমে ক্রমে জাগ্রত হইতে থাকে। এই কারণে এই শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর ন্যায় আত্মাও ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যাহা হউক এক্ষণে বিলিতি

মতে দেখান গেল কিরূপে আত্মা নিজের অস্তিত্ব ও কার্য্য অনুভব করে। গ্রীস দেশীয় দার্শনিক প্লেটো জর্ম্মান দেশীয় হেগেল আত্মা সম্বন্ধে যতদূর বলিয়াছেন তাহা এখানে বিচার করিবার আবশ্যক নাই। আমরা সংস্কৃতমতে আত্মার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমরা উপরে দেখাইয়াছি যে আত্মা,

(১) অনুভূতি সমষ্টি।

(২) কেবল অনুভূতির সমষ্টি নহে কিন্তু মানসিক কার্য্য সমূহ আবদ্ধ করিয়া রাখিবার যে শক্তি তাহাই আত্মা। ইহার অস্তিত্বমাত্র আমরা জানিতে পারি।

(৩) শুদ্ধ অস্তিত্ব জানিতে পারি এরূপ নহে, কিন্তু আত্মা নিজে নিজের কার্য্য অবলোকন করে।

(৪) আত্মা ও আত্মার কার্য্য দুই বস্তু নহে, আত্মা তাহার অনুভূতির বস্তুকে নিজের অংশ করিয়া লইয়া তাহাই অবলোকন করে ইহা সতত পরিবর্ত্তনশীল।

এই সমস্ত মতের সহিত তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সংস্কৃত দার্শনিকেরা কত সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। স্থূল হইতে সূক্ষ্মে উঠিতে হইলে প্রথমে ইন্দ্রিয় হইতে মন, পরে অহংকার, পরে বুদ্ধি ও সর্ব্বশেষে আত্মা আমাদের চিন্তার পদার্থ। এই আত্মার অন্য নাম পুরুষ।

এক্ষণে দেখা যাউক ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংস্কৃত শাস্ত্রে কি প্রমাণ আছে। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কথা সাধারণে স্বীকার করিয়া থাকেন। এই গুলি সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের কার্য্য। যাহাতে এই ভিন্ন গুণ আছে তাহাকে প্রকৃতি কহে। প্রকৃতি এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। এই তিন গুণ একত্র আছে বলিয়া প্রকৃতি সংঘাত পদার্থ। প্রকৃতি সংঘাত পদার্থ মাত্রই পরার্থ। অর্থাৎ গৃহ শয্যা, প্রভৃতির ন্যায় ইহারও ভোক্তা আছে। অতএব এই পর অথবা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পদার্থ অবশ্যই থাকিবে, ইহারই নাম আত্মা।

দ্বিতীয়তঃ বোধ হয় ইহাও বিজ্ঞান বলে দেখান যায় যে উত্তম, মধ্যম, ও অধম গুণত্রয় যদি সমান ভাবে একত্র

করা যায় তবে কোন গুণেরই কার্য্য হইতে পারে না। এজন্য সত্ত্ব রজ ও তমঃগুণের সাম্যাবস্থার কোন কার্য্য হইতে পারে না। কেবলমাত্র উহাদের বৈষম্য হইলেই কার্য্য হইতে পারে। যাহার অস্তিত্ব অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির সাম্যাবস্থার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে তাহাই আত্মা বা পুরুষ। এই অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুভূতিই প্রধান প্রমাণ। কিন্তু যাঁহারা যুক্তি ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না তাহাদের জন্য আরও অনেক প্রমাণ আছে। সময়ান্তরে আমরা ইহার শাস্ত্রিয় বিচারে যত্নবান হইব।

আর্য্যগণ আত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া পরে যুক্তি তর্ক দ্বারা আভ্যন্তরিক জগতের সমস্ত রহস্য ভেদ করিয়াছেন। কিরূপে আত্মা নিষ্ক্রিয় হইয়াও ভোক্তা ও কিরূপে ইহা সচ্চিদানন্দ, ইহা প্রত্যক্ষ ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় এতদূর সূক্ষ্ম যে স্থূলদর্শী ব্যক্তি গণের নিকট ইহার সমস্তই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান অন্ধ হিন্দুসন্তানের ইয়ুরোপীয় সভ্যতা চক্ষু ফুটাইতেছে, কাজেই তাহাদের দৃষ্টি স্থূল। স্থূল দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম বিষয় দেখা যায় না।

জাতিভেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অতএব জাতিভেদ সম্বন্ধ লইয়া মনুষ্যের ইষ্টানিষ্ঠ চিন্তা করা অতীব হাস্য জনক। সিংহ ব্যাঘ্র ও গর্দ্দভ প্রভৃতি পৃথক্ জাতিভেদ থাকাতে জগতের অনেক অনিষ্ট হইয়া থাকে, কারণ সিংহ ব্যাঘ্রাদিরা প্রাণী হিংসা দ্বারা জগতের বহুবিধ অনিষ্ট করিয়া থাকে, সুতরাং উহাদের পৃথক অস্তিত্ব না মানিয়া কেবল একই গর্দ্দভ জাতিই মানা বিধেয়; তাহা হইলে জগতের উপকার হইবে, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেমন, আর ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ থাকিলে জগতের অনেক অনিষ্ট

হয়, অতএব উহা না মানিয়া কেবল জগতে এক জাতিরই অস্তিত্ব স্বীকার করিব, ইহা বলাও তদ্রূপ।

এখন আমাদের দেখা আবশ্যক যে কোন সহজাত স্বভাব, কোন্ অপরিহার্য্য গুণ, কোন্ ইতর ব্যবর্ত্তক প্রকৃতি, কোন একতাবোধক শক্তি দ্বারা (যাহাকে জাতি বলিয়া লক্ষ্য করা যায়) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি পৃথক পৃথক জাতীয়।

শাস্ত্রে প্রথমে সাধারণ মনুষ্যকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। অবশ্য এ বিভাগেরও মূল কারণ,—গুণগত। আর্য্য দৃষ্টি সর্ব্বাবস্থায়ই গুণেরই পক্ষপাতি! স্থূলত তাঁহারা আবার এই গুণকেও তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা সত্ব, রজঃ ও তমঃ।

সত্তং রজ স্তমইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবা॥
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহি দেহি নমব্যয়ম্॥

গীতা

আবার যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিতেছেন,

চাতুর্বর্ণ্য ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ॥

এবং মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রেও যখন উহারই সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় তখন আর আর্য্য শাস্ত্র, যে, সর্ব্বথা গুণেরই পক্ষপাতি ইহা প্রমাণ করিতে বেশী প্রয়াস পাইতে হইবে না।

এই গুণত্রয়রই আবার চারিটী অবস্থা শাস্ত্রকারগণই নির্ণয় করিয়াছেন।

১ম। সত্ব বহুল।

২য়। রজঃ বহুল।

৩য়। রজঃ ও তমঃ বহুল।

৪র্থ। তমঃ বহুল।

১ম। অতিশয় শান্তি, সন্তোষ, বিবেক শক্তি, বৈরাগ্য শক্তি, উদাসীনতা উদারতা প্রভৃতি গুণ সম্পন্ন অবস্থা,—সত্বগুণ বহুল।

২য়। ভোগলিপ্সা সম্পন্ন,—রজোগুণ বহুল।

৪র্থ। ভোগলিপ্সা দ্বারা বিমুগ্ধ ও অন্ধ,—তমোগুণ বহুল।

৩য়। দ্বিতীয় ও চতুর্থ অবস্থার মধ্যম অবস্থাপন্ন,—রজ-স্তমো বহুল।

এই চারি প্রকার স্বভাব হইতে মনুষ্য শরীরে চারি প্রকার প্রকৃতি গঠিত হয়। শাস্ত্রমতে বিভিন্ন প্রকৃতিই আকৃতি-পার্থক্যের কারণ। সুতরাং তদ্দ্বারা আকৃতির ও কিছু কিছু পার্থক্য হইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার ও বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে।

কি প্রণালীতে গুণভেদে আকৃতির পার্থক্য হয় তাহাও মহাত্মাগণ সুবিস্তার মতে বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রকৃতি সর্ব্বদাই নিজ ক্রিয়ার অনুকূল পরমাণুর আকর্ষণ করিয়া থাকে। সুতরাং মানব যখন যেরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে তাহার দেহীয় পরমাণু সকলও সেইরূপ প্রকৃতির অনুমোদিত হইয়া পড়ে। কাজেকাজেই পরমাণুর পরিবর্ত্তন সংঘটন হইলে আকৃতিরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবি। সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যগণ এই সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া উক্তরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে মনুষ্যকে যেরূপ প্রকৃতিগত চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া আসিলাম উহাদের আকৃতিগতও তদ্রূপ যে সমস্ত পার্থক্য আছে এক্ষণে তাহাই দেখাইব।

১ম। সত্ত্বাধিক প্রকৃতি বিশিষ্ট মানবের জ্ঞাপক স্নায়ুমণ্ডলের কার্য্য উত্তমরূপে ও অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে বলিয়া ইহারা স্নায়ুমৎ প্রকৃতির।

২য়। রজাধিক প্রকৃতি বিশিষ্ট মানবের রক্তের মধ্যে লৌহাদি সার পদার্থ অধিক থাকে এবং রক্তের ও পরিমাণ অধিক,—ইহারা রক্তীয় প্রকৃতির।

৩য়। রজস্তম বহুল মানবের শরীরে পিত্ত অধিক থাকে, সুতরাং ইহারা পিত্তাধিক প্রকৃতি।

৪র্থ। তমো বহুলতা প্রযুক্ত যাহাদের শরীরে, রসাধিক শিরা বিশেষ অধিক পরিপুষ্ট তাহারা রসবৎ প্রকৃতি।

ক্রমশঃ।

২য় ভাগ। সন ১২৯৪ সাল। ১২শ খণ্ড।

অদৃষ্ট।

অদৃষ্ট সম্বন্ধে আজ কাল নানা প্রকার বাদ বিবাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাকৃত লোকেরা বলিয়া থাকে "অদৃষ্ট মানে কপালের লেখা, আমাদের যাহা কিছু হইতেছে ও হইবে, সমস্তই বিধাতা কর্ত্তৃক কপালে লিখিত আছে। সেই লেখা বা অদৃষ্ট ব্যতীত কখনই কাহার কিছু হইতে পারে না।" আবার শাস্ত্রদর্শীগণের মধ্যে আধুনিক নৈয়ায়িকগণ বলেন, "অদৃষ্ট আত্মার এক প্রকার গুণ বিশেষ, উহা কর্ম্মমাত্রেরই কারণ হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে কোন বস্তুর যে কোনরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে তৎসমস্তই অদৃষ্ট-জনিত। কুম্ভকার যে ঘটের উৎপাদন করিতেছে, তাহার কারণ আমাদের অদৃষ্ট, তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করিতেছে তাহারও কারণ আমাদের অদৃষ্ট, কর্ম্মকার হল গড়িতেছে তাহারও কারণ আমাদের অদৃষ্ট; বৃষ্টি, বাত্যা, শীত, গ্রীষ্মাদি হইতেছে তাহারও কারণ আমাদের অদৃষ্ট; এবং মৃত্তিকা প্রস্তর হইতেছে, প্রস্তর মৃত্তিকায় পরিণত হইতেছে ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যেরই কারণ আমাদের অদৃষ্ট। আমরা যে হস্ত পদাদির পরিচালনা করিতেছি, কিম্বা জৃম্ভন,

নিষ্ঠীবন, ও শিরঃকম্পনাদি করিতেছি তত্সমস্তেরই কারণ আমাদের অদৃষ্ট। অদৃষ্ট ব্যতীত কখনও কাহার কিছু হইতে পারে না”। আবার পাশ্চাত্য প্রভায় প্রদীপ্ত নব্য সম্প্রদায় বলেন ,‘অদৃষ্ট একটা ভূয়ো কথা, উহা দুর্ব্বল হৃদয়ের কল্পনা প্রসূত মিথ্যা সংস্কার মাত্র। এই মিথ্যা-সংস্কার থাকাতে সমাজের ঘোর অনিষ্ঠ হইতেছে, সমাজ দিন দিনই অবনত হইতেছে, পুরুষকার শূন্য হইয়া অকর্ম্মণ্য ও গুরুতর ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে। অতএব এই সর্ব্বানর্থের মূলীভূত অদৃষ্ট না থাকা এবং না মানাই ভাল। এই প্রকার আরও অনেক প্রকার বাদ বিবাদ আছে। আমরা মনে করি, অদৃষ্টের প্রকৃততত্ত্ব অজ্ঞাত থাকাই এই সকল বিবাদের মূল। শ্রুতি দর্শন প্রসিদ্ধ অদৃষ্টতত্ত্ব সকলে পরিজ্ঞাত থাকিলে বোধ হয় এই বিবাদ থাকিতে পারে না। এজন্যই আমরা অদৃষ্টের তত্ত্ব যাহা জানি, সাধারণকে নিবেদন করিতেছি।

অদৃষ্টতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় পূর্ব্বে ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণ অবগত হওয়া আবশ্যক, কারণ অদৃষ্ট ধর্ম্মাধর্ম্মেরই অবস্থা বিশেষ মাত্র। বৈশেষিক দর্শণে বলেন “যতোভ্যুদয় নিশ্রেয়স সিদ্ধিঃ সধর্ম্মঃ” যে শক্তি বা গুণ বিশেষের দ্বারা আত্মার সদ্গতি এবং পরমেশ্বরের সহিত একাত্মা হইয়া যায় তাহার নাম ‘ধর্ম্ম’। এই ধর্ম্মের লক্ষণ বলাতে অধর্ম্মের লক্ষণও সূচিত হইল, যাহা ধর্ম্মের বিপরীত তাহাই অধর্ম্ম, ইহা অধর্ম্মশব্দ দ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে,—অর্থাৎ যে শক্তি বা গুণ বিশেষের দ্বারা আত্মা অধোনত হয় এবং ঈশ্বর হইতে দূরবর্ত্তী হয় তাহারই নাম “অধর্ম্ম”। এই হইল বৈশেষিক দর্শনোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণ। কিন্তু এতদ্দারা ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপটী কি তাহা কিছু বুঝিতে পারা গেল না।

ভগবান্ কনাদ ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিলেন না কেন? ইহার স্বরূপের কোন নাম নাই, এ নিমিত্ত করিলেন না। ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম মূলে এক একটী মাত্র পদার্থ হইলেও, ইহাদের অপরিসংখ্যেয় প্রকার ভেদ আছে। সুতরাং তাহার নাম হইতে পারে না। তবে সেই মূল পদার্থের নাম আছে বটে, তাহা বুঝান যাইতে পারে। ধর্ম্মের মূল অবস্থার নাম সত্ত্বগুণ, অধর্ম্মের মূল অবস্থার নাম রজোগুণ এবং তমোগুণ। ইহাই শাস্ত্র বলিয়াছেন “ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যং।

সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপরীতং।” (সাংখ্যকারিকা) ধর্ম্ম, জ্ঞান বৈরাগ্য এবং অনিমাদি ঐশ্বর্য্য, সত্ত্বগুণের কার্য্য; আর অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্যাদি তমঃ এবং রজোগুণের কার্য্য।” মূল বীজ স্বরূপ স্বত্ত্বগুণ হইতেই সমস্ত ধর্ম্মের বিকাশ হইয়া থাকে। এবং রজঃ আর তমোগুণ হইতেই নিখিল অধর্ম্মের বিকাশ হইয়া থাকে, এজন্য সমস্ত ধর্ম্মের সমষ্টির নাম সত্ত্বগুণ এবং নিখিল অধর্ম্মের সমষ্টির নাম রজঃ আর তমঃ।

এখন সত্ত্বগুণাদিরও কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। “সত্ত্বং লঘু প্রকাশ মিষ্টং উপষ্টকঞ্চলঞ্চ রজঃ গুরু বরণ কমেব তমঃ” (সাংখ্যকারিকা)। যে শক্তি বা গুণটী থাকিলে আত্মার মধ্যে এক প্রকার লঘু লঘু ভাব—হালকা হালকা ভাব অনুভূত হয়, আত্মার জড়তা, মলিনতা নিবৃত্তি হইয়া, এক প্রকার প্রকাশভাব—নির্ম্মলভাব অনুভূত হয়, এবং সমস্ত কুপ্রবৃত্তির বিনাশ হইয়া অন্তরে অন্তরে আত্মতত্ত্ব—ঈশ্বরতত্ত্বের উপলব্ধি হয়, অপরিমিত তৃপ্তি বা শান্তি সুখের অনুভব হয়, যাহা আর কিছু অধিক সময় থাকিবার নিমিত্ত মনে মনে আগ্রহ হয়, তাহাই সত্ত্বগুণ বা সত্ত্বশক্তি। আর যে গুণ বা যে শক্তি সমুদ্রিক্ত হইলে আত্মার বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়া বহির্মুখীন গতি হয়, নানাবিধ ভোগ্য বিষয়ের দিকে গতি হয়, পার্থিব পদার্থের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয় এবং অন্তরে এক প্রকার তাপ এক প্রকার দুঃখ এক প্রকার অশান্তির অনুভব হয়, তাহাই রাজোগুণ বা রজঃ শক্তি। যে শক্তি বা যে গুণ বিশেষ সমুদ্রিক্ত হইলে আত্মার মধ্যে এক প্রকার গুরুত্ব-এক প্রকার ভারি ভাব অনুভূত হয়, আত্মার আন্তরিক দৃষ্টি বিনষ্ট হইয়া অভ্যন্তরে অন্ধতা উপস্থিত হয়—হিতাহিত বোধ বিরহিত হয়, তাহাই তমঃশক্তি। কিন্তু এই সাধারণ লক্ষণের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ বিবরণ কিছুই বুঝা যাইতে পারে না, যাহা বিশেষ রূপে বুঝা না যায় তাহার গ্রহণ বা পরিত্যাগ করা অসম্ভব। অতএব ধর্ম্মের গ্রহণ এবং অধর্ম্মের পরিত্যাগও অসম্ভব। এজন্য অপরিসংখ্যেয়-ধর্ম্মাধর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বরূপ প্রকাশক নাম করা হইয়াছে। তাহাতেই —“ধৃতিঃ ক্ষমাদমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। ধীর্ব্বিদ্যা সত্য মক্রোধোদশকং ধর্ম্ম লক্ষণ।” মনু। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়-

নিগ্রহ, ধীশক্তি, আত্মজ্ঞান, সত্য এবং অক্রোধ প্রভৃতিকে ধর্ম্মের লক্ষণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও কতক গুলি মুখ্যমুখ্য ধর্ম্মের নাম করা যায়, যথা, ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, অনুরাগ, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, শান্তি, সন্তোষ ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত আর যে সকল ধর্ম্ম আছে তাহার স্বরূপ প্রকাশক কোন নাম করা যায় না। কিন্তু যে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহা উৎপন্ন হয় সেই সেই ক্রিয়ার নাম দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন করা গিয়া থাকে। যজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা এক প্রকার ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহা যজ্ঞজ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়, ব্রতের দ্বারা এক প্রকার ধর্ম্ম বিকাশিত হয় তাহা ব্রতজন্য ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, এবং আচার জনিত ধর্ম্মকে আচারজ ধর্ম্ম বলা হয়, নিয়ম-জনিত ধর্ম্মকে নিয়মজ ধর্ম্ম বলা হয়, একাদশী প্রভৃতি উপবাস জনিত ধর্ম্মকে উপবাসজন্য ধর্ম্ম বলা হয়। এইরূপ অপরিসঙ্খ্যের বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের দ্বারা অপরিসঙ্খ্যেয় প্রকার ধর্ম্মের বিকাশ হইয়া থাকে, এবং তাহাদিগকে এই সকল ক্রিয়ার নাম সম্মিলিত করিয়াই প্রতিপাদন করা যায়।

মীমাংসা দর্শনাদি গ্রন্থে যে "চোদনা লক্ষণো ধর্ম্মঃ" এইরূপ সূত্রাদির দ্বারা ব্রতযজ্ঞাদিকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা লাক্ষণিক ভাবে বুঝিতে হইবে। কার্য্যকারণের অভেদ কল্পনা করিয়া ঐরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যজ্ঞব্রতাদির দ্বারা এক একপ্রকার ধর্ম্মের বিকাশ হয়, সুতরাং উহারা ধর্ম্মের কারণ, এনিমিত্ত যজ্ঞব্রতাদিকেই "ধর্ম্ম" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বাস্তবিক ব্রতযজ্ঞাদি ক্রিয়া গুলিই ধর্ম্ম নহে।

অধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপই জানিতেহইবে; অধর্ম্মেরও কতগুলির স্বরূপ প্রকাশক নাম আছে যথা, ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, হিংসা, দ্রোহ, পিশুণতা, মাৎসর্য্য ইত্যাদি। আর কতকগুলি অধর্ম্মের এক এক কারণ সম্মিলিত নাম আছে, যথা,—গোহত্যা জনিত অধর্ম্ম, স্ত্রীহত্যা জনিত অধর্ম্ম, মিথ্যা প্রয়োগ জনিত অধর্ম্ম ইত্যাদি।

উক্ত ধর্ম্ম আর অধর্ম্মের দুইটি অবস্থা আছে;—একটি-বিকাশাবস্থা, আর একটি লীনাবস্থা। যখন বিকাশাবস্থা হয় তখন ইহাদের নাম "প্রবৃত্তি" বা "বৃত্তি" আর যখন লীনাবস্থা হয় তখন তাহার নাম সংস্কার প্রবৃত্তি অবস্থা আর সংস্কারাবস্থার বিশেষ পার্থক্য আছে,—ধর্ম্মাধর্ম্মের।

যখন প্রবৃত্তি বা বিকাশাবস্থা হয় তখন ইহাদের ক্রিয়া এবং অস্তিত্ব সুস্পষ্ট রূপে হৃদয় মধ্যে অনুভব করা যায়। দেহের মধ্যেও তাহা ক্রিয়া হইতে থাকে, এবং দেহের ভাবভঙ্গীরদ্বারাই তাহার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আর যখন সংস্কারাবস্থা হয়, তখন তাহার কোন ক্রিয়া বা অস্তিত্ব মাত্রও কোনমতে অনুভব গোচর হয় না, দেহের মধ্যেও কোন প্রকার ক্রিয়া বা ভাবভঙ্গী পরিলক্ষিত হয় না। মনে করুন, ভক্তি একটি ধর্ম্ম, ইহা যখন কোন কারণে মনের মধ্যে বিকাশিত হয়, তখন আমাদের জীবাত্মার মধ্যে যেন কিরূপ এক শীতবীর্য্য ভাব হয়, হৃদয়টা যেন জুড়াইয়া যায়, প্রচণ্ড গ্রীষ্ম জ্বালায় সমস্তদিন দগ্ধ হইয়া—'হা বায়ু, হা জল' করিতে করিতে পূর্ণ সুধাংশু কিরণাঙ্কিত সায়ংকালে তটিণীতীরে বসিয়া কল্লোলশীকরাভিষিক্ত সমীরণ সেবায় প্রাণ যাদৃশ সুশীতল হয়, ভক্তির উন্মীলনাবস্থায় যেন তাহার ও সহস্রগুণে, প্রাণটা আপ্যায়িত হয়, আমাদের 'আঁখির' প্রতি অণুতে অণুতে যেন সুধা ঢালিয়া সমস্ত আঁখিকে, পরিপূর্ণ করিয়া দেয়, আনন্দের তরঙ্গ যেন উঠিতে থাকে,—আনন্দের তরঙ্গে যেন আত্মাটা হেলিতে দুলিতে থাকে, তখন যেন কি এক অদ্ভুত শক্তির তরঙ্গ হয় তাহা হৃদয়ই বুঝিতে পারে। তৎপর বাহির হইতেও অনেক লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়? শরীরে এক প্রকার বেপথু হইতে থাকে, কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ হইয়া আইসে, অধরপুট বিকম্পিত হইতে আরম্ভ হয়, অপাঙ্গ দেশ হইতে আনন্দাশ্রুকণা বিগলিত হয়। আবার যখন ঐ ভক্তির ভাবটী মনোমধ্যে বিলীন হয়, তখন আর কিছুমাত্র অনুভব হয় না। প্রচুর গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দ্বারায় ইষ্ট দেবতার অর্চ্চনা করা কালে হৃদয় মধ্যে কি একরূপ অপূর্ব্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস হয়,—কি একরূপ হাল্‌কা হাল্‌কা ভাব হয়—নির্ম্মল পবিত্রতার বিকাশ হয়, তাহা উপাসকগণমাত্রেই হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিতে পারেন, তাহার লক্ষণ বাহির হইতেও কতকটা লক্ষিত হইতে থাকে। এই হইল পূজা-জনিত ধর্ম্মের বিকাশ অবস্থা। আবার যখন ভাবটী সংস্কারাবস্থাপন্ন হয়—হৃদয়ে বিলীন হইয়া যায়, তখন কিছুমাত্র অনুভূত হয় না। এইরূপ অতিথি সৎকার, দান, যজ্ঞকালেও এক এক প্রকার সাত্ত্বিক ভাবের অনুভূতি হইয়া থাকে তাহাই ঐ সকল ধর্ম্মের বিকাশিতাবস্থা। আবার যখন লীনাবস্থা হয় তখন উহাদের কোনরূপ ক্রিয়া বা অস্তিত্বমাত্রেরও উপলব্ধি হয় না। অধর্ম্ম সম্বন্ধেও

এইরূপ,—মিথ্যা প্রয়োগ এবং চৌর্য্যাদিকালে মনের মধ্যে এক প্রকার রাজস ও তামস ভাব উদ্দীপিত হয় তাহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করা যায়, শরীরের মধ্যেও নানা প্রকার লক্ষণ বিকসিত হয়। তখন ঐ সকল অধর্ম্মের প্রবৃত্তি অবস্থা। আবার যখন ঐ সকল ভাব মনের মধ্যে লীন হইয়া যায় তখন তাহার কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না, তখন উহার সংস্কারাবস্থা বলা হয়। আরও দেখুন,—ক্রোধ একটি অধর্ম্ম, ইহা যখন মনোমধ্যে বিকসিত হয় তখন ইহার অস্তিত্ব এবং ক্রিয়া হৃদয় মধ্যে অনুভব করা যায়, শরীরেও নানা প্রকার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, চক্ষুর্দ্বয় রক্তিমাকার গ্রহণ করে, ফুস্‌ফুস্‌ হৃৎপিণ্ডাদি অতিশয় বেগবান্‌ হয়, কণ্ঠধ্বনি বিকৃত হইয়া যায়, তখন ইহার প্রবৃত্তি অবস্থা। আবার যখন ঐ ক্রোধটী মনের মধ্যে বিলীন হইয়া যায় তখন তাহার সংস্কারাবস্থা হয়; তখন তাহার কোন ক্রিয়া বা অস্তিত্বেরও উপলব্ধি হয় না; ইহাই প্রবৃত্তি অবস্থা আর সংস্কারাবস্থার পার্থক্য।

এই সংস্কারাবস্থার প্রতি হয়ত অনেকের সংশয় হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক সংশয়ের কোন কারণ নাই, ইহা এক প্রকার প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়। কার্য্যের দ্বারা ইহার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়। আমাদের মনের মধ্যে যে কোন ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি বা ভাব উদ্দীপিত হয়, তাহাই সংস্কারাবস্থায় থাকে, এবং উপযুক্ত কারণ পাইলে আবার তৎক্ষণাৎ উদ্দীপিত হইয়া সেই সেই প্রবৃত্তির অবস্থায় পরিণত হয়, ইহা নির্ব্বিবাদে সর্ব্বসম্মত কথা। মনোনিবেশ পূর্ব্বক কোন বস্তু দেখিলে, শুনিলে, কিম্বা স্পর্শনাদি করিলে, উদ্দীপনার কারণ পাইলে, সময় সময় কালান্তরে আবার তাহা মনোমধ্যে উপস্থিত হয়,—যেন ঠিক ঠিক সেই ভাবটী বিকশিত হয়। ৪০ বৎসর ৫০ বৎসর পূর্ব্বে নানা প্রকার গ্রন্থের অধ্যয়ন করা হইয়াছে, উদ্দীপক কারণ পাইলে যেন কোথা হইতে অবিকল সেই বাক্যাবলী নিঃসৃত হইতে থাকে। অতএব ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, আমাদের মনে যত প্রকার প্রবৃত্তির বিকাশ হয় তাহার কোনটিই একবারে বিনষ্ট বা অন্তর্হিত হয় না, উহা সূক্ষ্মভাবে মনের মধ্যে অবস্থিতি করে। মনের ক্রিয়াগুলি এক একবার উদ্দীপিত হইয়া যদি সমূলেই বিনষ্ট হইত, তবে সহস্র চেষ্টা দ্বারাও অতীত ঘটনাগুলি আমরা মনে করিতে পারিতাম না, সমস্ত বিষয়ই আমাদের নিকট সর্ব্বদা অভিনব থাকিত; পরিচিত বিষয় আর অপরিচিত

বিষয়ের কিছুমাত্র পার্থক্য থাকিত না। কোন বিষয়ের স্মরণ হইতেও পারিত না। মনের ক্রিয়াগুলি সংস্কার অবস্থায় থাকে বলিয়াই পূর্ব্ব পরিচিত বিষয় আর অজ্ঞাত বিষয়ের পার্থক্য হইয়া থাকে।

মনের ক্রিয়ার নিয়ম এই যে, ঠিক একই সময়ে বিভিন্ন প্রকারের দুইটি ভাব মনের মধ্যে বিকাসিত হয় না, উহা পর পর ক্রমে হইয়া থাকে। যখন দর্শন ক্রিয়া হয় তখন শ্রবণ ক্রিয়া হয় না, যখন শ্রবণ ক্রিয়া হয় তখন স্পর্শন ক্রিয়া হয় না, কিন্তু পরে পরে হয়। আমাদের দর্শন স্পর্শনাদি কোন রূপ ক্রিয়া হইতে হইতে যদি অন্য আর একটি দর্শন স্পর্শনাদি ক্রিয়া আসিয়া উপস্থিত হয় তখন এই শেষের ক্রিয়াটির দ্বারা পূর্ব্বেকার ঐ দর্শন স্পর্শনাদি ক্রিয়াটি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হয়। তখন শেষকার দর্শন স্পর্শনাদি ক্রিয়াটিই মনের উপর আধিপত্য করিয়া বিকসিত হয়। এই নিয়মেই আমাদের মনে সকল প্রকার ক্রিয়া হইয়া থাকে। এখানে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে যদিচ শেষকার ক্রিয়া দ্বারা পূর্ব্বেকারই বিকাশিত ক্রিয়া গুলি ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হয় সত্য, তথাপি পূর্ব্ব প্রকাশিত ক্রিয়া গুলির পুনরুদ্দীপনার চেষ্টা বিলক্ষণ থাকে, পরে একটুকু, সুযোগ ও সাহায্য পাইলেই পুনর্ব্বার মনোমধ্যে উদ্দীপ্ত হয় এবং পূর্ব্ববৎ ক্রিয়া সাধন করে। মানসিক ক্রিয়ার এইরূপভাবে অবস্থিতিকেই সংস্কারাবস্থা বলে। বিষয়টি বিশদ করার নিমিত্ত আর একটু বিস্তার করা যাইতেছে ;—মনে করুণ আপনি রামসুন্দরকে দেখিতেছেন, এখন অবশ্যই স্বীকার্য্য, যে, আপনার মনমধ্যে এক প্রকার ক্রিয়া হইতেছে ; এখন ঐ ক্রিয়া হইতে হইতেই যদি শ্যামসুন্দর আসিয়া আপনার সম্মুখস্থ হয়, তবে শ্যামসুন্দরের শরীর হইতে তাহার গৌরপীতাদি বর্ণাকার শক্তিটি প্রসারিত হইয়া আপনার চক্ষু প্রণালী দ্বারা মস্তিষ্কে উন্নতী হইবে, পরে মনের উদ্বোধন করিবে ; কিন্তু ঠিক এক সময়ে একরকমের ২টী ক্রিয়া, মনোমধ্যে বিকশিত হইতে পারে না। অগত্যাই তখন ঐ রামসুন্দর দর্শন করার ক্রিয়াটি ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইবে, অবশেষে অত্যন্ত ক্ষীণ ও লুপ্ত প্রায় হইবে। তখন শ্যামসুন্দরেই দর্শন ক্রিয়ার পূর্ণ বিকাশ হইবে, আপনি তখন রামসুন্দরকে ছাড়িয়া শ্যামসুন্দরকেই দেখিতে থাকিবেন। আবার শ্যামসুন্দরকে দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণদাস

আসিয়া উপস্থিত হইলেও ঐরূপ ঘটনাই হইবে। কিন্তু ঐ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রিয়া গুলি মন হইতে বিদূরিত হয় না, এককালে নিশ্চেষ্টও হয় না, উহারা পুনরুদ্দীপনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে থাকে। উপযুক্ত সহায় পাইলেই পূর্ব্বমত ক্রিয়া জন্মাইয়া দেয়, সেই ক্রিয়াকেই রামসুন্দর, শ্যামসুন্দরের স্মরণ হওয়া বলে।

দর্শন স্পর্শনাদি বৃত্তির ন্যায় সকল প্রকার বৃত্তিরই এই নিয়মে সংস্কারাবস্থাপন্ন এবং এই নিয়মেই পুনরুদ্দীপিত হইয়া থাকে। ভক্তি, শ্রদ্ধা, সন্তোষ প্রভৃতি ধর্ম্মে এবং ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া প্রভৃতি অধর্ম্ম সকলেরই এই প্রকার প্রবৃত্তি ও সংস্কারাবস্থা আছে। একবার বিকাশিত হইয়া উহারা কেহই সমূলে বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয় না, পূর্ব্ব নিয়মানুসারে সকলেই অপর প্রবৃত্তি দ্বারা দুর্ব্বল হইয়া এক এক বার ক্ষীণাবস্থা হয় এবং উপযুক্ত সহায় পাইলে পুনঃপুনঃ উদ্দীপিত হয়। আবার সংস্কারাবস্থা হয়, আবার উদ্দীপিত হয়, আবার সংস্কারাবস্থা হয়, আবার উদ্দীপিত হয়, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ভক্তির উদ্দীপনা হইয়া থাকিতে থাকিতে যখন কোন বিষয়ের চিন্তা বা আর কোন প্রকার একটি বৃত্তি মনোমধ্যে বিকসিত হয়, তখন ভক্তি গুণটি সংস্কারাবস্থায় অবস্থিতি করে, এবং উপযুক্ত সহায় পাইলে আবার পরিস্ফুরিত হইয়া পূর্ব্ববৎ ক্রিয়াও করে। পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ, পূর্ব্বের ন্যায় তৃপ্তি এবং পূর্ব্বের ন্যায় শান্তি সুখাদির অভিব্যক্তি করে। ব্রত, নিয়ম, অতিথি সৎকার, ও উপাসনাদিকালেও আত্মাতে একরূপ সাত্বিক ভাবের বিকাশ হয়, আবার অন্য কোন একটি বৃত্তির উদ্দীপনা হইলে সংস্কারাবস্থায় থাকে, এবং উপযুক্ত কারণের সহায়তা পাইলে পুনঃ পুনঃ সেই রূপ ভাব উদ্দীপিত হয় অধর্ম্ম সম্বন্ধেও এই রূপই নিয়ম। ইহাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন,— "দ্বয়ে খল্বমী সংস্কারঃস্মৃতি ক্লেশ হেতবো বাসনারূপাঃ বিপাক হেতবো ধর্ম্মা ধর্ম্মরূপাস্তে পূর্ব্বভবাভি সংস্কৃতাঃ পরিণাম চেষ্টা নিরোধ শক্তি জীবন শক্তি বদপরিদৃষ্টা" (পাতঞ্জল ভাষ্য)। ইহার ভাবার্থ এই, আমাদের মনে যে কোন প্রকার শক্তি বা ক্রিয়ার বিকাশ হয়, তাহা হইতে দ্বিবিধ সংস্কার সঞ্চিত হয়; তন্মধ্যে যে জাতীয় সংস্কার গুলি স্মরণের কারণ এবং অবিদ্যাদির কারণ তাহাদের নাম "বাসনা" আর যে জাতীয় সংস্কার গুলি আমাদের নানা প্রকার সুখ দুঃখ ভোগ, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট জন্য এবং

দীর্ঘ জীবিতা ও অল্প জীবিতার কারণ তাহাদের নাম ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম। এই সমস্ত প্রকার সংস্কারই আমাদের পূর্ব্বেকার ক্রিয়ার দ্বারা সংগঠিত হয়, পূর্ব্বেকার ক্রিয়াগুলিই সংস্কার রূপে মনের মধ্যে অবস্থিতি করে। ধর্ম্মাধর্ম্মের যখন সংস্কারাবস্থা হয় তখন মনে মনে তাহার অনুভব করা যায় না, পরিণাম শক্তি এবং জীবন শক্তি প্রভৃতির যেমন অনুভব করা যায় না ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কারও তেমন অনুভব করা যায় না। এ নিমিত্ত ঈদৃশ সংস্কারাবস্থার নামই "অ-দৃষ্ট" অর্থাৎ মনের অনুভবের অবিষয়, মনের অগোচর।

এই সংস্কারাবস্থা বা অদৃষ্টের আর একটী নাম আছে "অপূর্ব্ব"। ইহাই দার্শনিক চূড়ামণি ভগবান্ কার্ষ্ণাজিনি বলিয়াছেন, "কর্ম্মণ এ বোত্তরাবস্থা ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যাপূর্ব্বম্," (বেদান্ত দর্শন) ইহার অর্থ এই,— যাগযজ্ঞাদি হউক আর গোবধাদি হউক যে কোন বিহিত বা অবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় তৎকালে আত্মার মধ্যে এক প্রকার ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তৎপর তাহার যে অবস্থাটী (সংস্কারাবস্থাটী) মনের মধ্যে থাকে তাহার নাম ধর্ম্ম, অধর্ম্ম বা অপূর্ব্ব"। তন্মধ্যে যে গুলি কুৎসিৎ বা কষ্টদায়ক গুণের সংস্কার তাহাকে দুরদৃষ্ট বলে, আর যে গুলি ধর্ম্মের সংস্কার তাহার নাম শুভাদৃষ্ট। এইরূপ অদৃষ্টই আর্য্যদিগের অভিমত এবং পাঠকগণের ও বোধ হয় এইরূপ অদৃষ্টে' কোন আপত্তি হইবে না।

অদৃষ্টের ক্রিয়া প্রণালী

অদৃষ্ট কাহাকে বলে তদ্বিষয় বলা হইয়াছে, এখন তাহার ক্রিয়া প্রণালী বলা আবশ্যক, শুভাদৃষ্ট আর দুরদৃষ্টের তিন প্রকার শ্রেণীভেদ আছে। এক জন্মজনক অদৃষ্ট, দ্বিতীয় আয়ুর্জনক অদৃষ্ট, তৃতীয় ভোগজনক অদৃষ্ট। কতকগুলি অদৃষ্টের দ্বারা আমাদের মনুষ্যাদি দেহ সংগঠিত হয়, তাহাদের নাম জাতি বা জন্মজনক অদৃষ্ট, আর কতকগুলি দ্বারা আমাদের আয়ুর ন্যূনাধিক্য সম্পাদিত হয় তাহার নাম আয়ুর্জনক অদৃষ্ট, অপর কতকগুলি দ্বারা আমাদের সুখ দুঃখাদির ভোগ হইয়া থাকে, তাহার নাম ভোগজনক অদৃষ্ট। সুখ দুঃখের আবার অসংখ্যেয় বিভাগ আছে। অসংখ্যেয় কারণে অসংখ্যেয় সুখ দুঃখাদি হইয়া থাকে,

এবং এক এক প্রকার সুখ দুঃখ এক এক প্রকার অদৃষ্ট দ্বারা সংঘটীত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ভোগজনক অদৃষ্টের বিভাগ, অপরিসংখ্যেয়, তথাপি দিগদর্শনের নিমিত্ত কতকগুলি নাম করা যাইতেছে, যথা—পুত্র লাভজনক অদৃষ্ট, ধন লাভজনক অদৃষ্ট—, খ্যাতি লাভজনক অদৃষ্ট, এবং দারিদ্র্যজনক অদৃষ্ট, পুত্রনাশজনক অদৃষ্ট, রোগজনক অদৃষ্ট ইত্যাদি।

এখন প্রত্যেকটীর কার্য্য প্রণালী বলা যাইতেছে।

ক্রমশঃ

ব্রাহ্মণদিগের প্রতি কলঙ্কারোপ।

সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরত ভজন্তে।

মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয় নেয় বুদ্ধিঃ॥

মনুর অষ্টম অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়ঞ্চৈব বৈশ্যংচ ব্রাহ্মণো বৃত্তিকর্ষিতৌ।
বিভৃয়াদানৃশংস্যেন স্বানিকর্ম্মাণি কারয়ণ। ৪১১।
দাস্যন্তু কারয়ল্লোভা ব্রাহ্মণঃ সংস্কৃতান্ দ্বিজান্।
অনিচ্ছুতঃ প্রাভবত্যাত্ রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্। ৪১২।
শূদ্রন্তু কারয়েদাস্যং ক্রীতমক্রীতমেববা।
দাস্যায়ৈবহিসৃষ্টোঽহসৌ ব্রাহ্মণস্যস্বয়ম্ভুবা। ৪১৩।

ব্রাহ্মণ, আত্মরক্ষণে অক্ষম ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে অনৃশংস ভাবে, নিজ নিজ জাত্যুক্ত কর্ম্ম করাইয়া গ্রাসাচ্ছাদনাদি প্রদান পূর্ব্বক প্রতিপালন করিবেন। ৪১১। কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ, লোভনিবন্ধন, কোন সংস্কৃত দ্বিজকে, প্রভুত্বাবলেপে, অনিচ্ছাসত্বে পাদধাবনাদি দাসকার্য্যে নিযুক্ত করিলে, রাজা তাহাকে ছয়শত পণদণ্ড করিবেন। ৪১২। পরন্তু ক্রীতই হউক আর অক্রীতই হউক, ব্রাহ্মণ শূদ্রকে দাসোচিত পাদধাবনাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে

পারেন। কারণ ব্রহ্মা শূদ্রদিগকে ব্রাহ্মণের দাসত্বের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। ৪১৩। এবংবিধ মনূক্ত দৃষ্টার্থব্যবস্থা পাঠে এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে—"ভিল্ল" প্রভৃতি অসভ্য লোক দর্শনে, বৈদেশিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে—শূদ্রগণ এতদ্দেশে প্রথম আগমন করিয়া অত্রস্থ অধিবাসী দিগকে পরাভব পূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন। বিজিত অধিবাসীগণ—বিজয়ি শূদ্রজাতি কর্ত্তৃক, উৎপীড়িত ও বিতাড়িত হইয়া পর্ব্বত ও অরণ্যে বাস করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যে সকল পার্ব্বত্য লোক বিলোকিত হয়; ইহারা সেই শূদ্রবিজিত 'আদিম অধিবাসিগণের বশংধর। পরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ উপস্থিত হইয়া শূদ্রদিগকে পরাজিত এবং দাস দশায় পাতিত করেন।"

যদিও হিন্দু শাস্ত্রে কুত্রাপি দ্বিজজাতি কর্ত্তৃক শূদ্রের পরাজয় বৃত্তান্ত উপলব্ধি হয় নাই; এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিগ্রহ নানাস্থানে দর্শন করিয়া "ব্রাহ্মণ গণ গৃহবিচ্ছেদ ভয়ে দ্বিজ শূদ্র বিগ্রহ বৃত্তান্ত গোপণ করিয়াছেন" এতাদৃশ অনুমাণ করিতেও বুদ্ধিমান ব্যক্তির রুচি হয় না। তথাপি এতদ্দেশীয় এক সংপ্রদায় সরলভাবে, এই সিদ্ধান্তকে আপ্তবাক্যের ন্যায় বিশ্বাস করিয়া নানাবিধ রাজনৈতিক সামাজিক এবং ধর্ম্মবিষয়ক নূতন নূতন সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহারা একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন না—

যস্মিন্ দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ।
তথৈব পরিপাল্যোঽসৌ যদাবশমুপাগতঃ॥

যাজ্ঞবল্ক সংহিতা। ১ম
অধ্যায় ।৩৪৩ শ্লোক।

দেশস্য জাতেঃ সঙ্ঘস্য ধর্ম্মোগ্রামস্য যোভৃগুঃ।
উদিতঃ স্যাৎ স তৈ নৈব দয়েভাগং প্রকল্পয়েৎ॥

দায়তত্ত্ব ধৃত কাত্যায়নবচন।

যে ব্রাহ্মণগণ বৈদেশিক নীতিতে, দায় ও অপরাধাদি বিষয়ে এতাদৃশ উদার নীতির অনুসরণ করিতেন; তাহারা এক বিজয়ী জাতিকে বিজিত করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া ছিলেন—বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে ইহা বিশ্বাস করা এবং তদুপরি দণ্ডায়মান হইয়া নানাবিধ অভিনব

সিদ্ধান্ত অবতারণা করা আমাদের বিবেচনায় ধৃষ্টতা বলিয়া বোধ হয়। শূদ্রগণ যে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ জাতি কর্তৃক পরাভূত হইয়াছিল এতদ্বিষয়ে বাচনিক কোন প্রমাণ নাই। অধিকন্তু আনুসঙ্গিক কোন নির্ভর যোগ্য প্রমাণ ও উপলব্ধ হয় না—দেখ ব্রাহ্মণগণ কিছু শূদ্রজাতিকে নিরস্ত্র করিবার কোন বিধি করেন নাই। বাস্তবিক কোন ইতিহাস বা পুরাণে দ্বিজগণ কোন জাতিকে নিরস্ত্র করিয়াছেন অদ্য পর্য্যন্ত শুনি নাই। বিশেষতঃ নারদসংহিতা প্রভৃতি দর্শনে. সুস্পষ্ট অনুভূত হয় শূদ্রগণ বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় বৃত্তি অনুসরণ করিতে পারিত—অথচ তাহারা কস্মিন্ কালেও ব্রাহ্মণ জাতির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে নাই। ইহা কখনও বিজিত জাতির লক্ষণ নহে। অপিচ জাতিবিশেষের প্রতি কর্ম্ম বিশেষের ভার আর্য্য সমাজের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়—তদ্দ্বারা কোন জাতিকে পরাজিত বলিয়া অনুমান করিতে হইলে বৈশ্য জাতিকেও পরাজিত বলিয়া মনে করিতে হয়—যথা মনু বলিয়াছেন " বৈশ্য শূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্ম্মাণি কারয়েৎ। তৌহিচ্যুতৌ স্বকদ্ম্ভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদং জগৎ।" রাজা যত্ন পূর্ব্বক বৈশ্য শূদ্র দ্বারা নিজ নিজ জাত্যুক্ত কৃষি বাণিজ্য ও সেবাদি করাইবেন। কারণ তাঁহারা স্বকর্ম্মাচ্যুত হইলে, এই জগত্ ব্যাকুলিত হয়।

৮অ। ৪১৮।

ইহা দ্বারা দৃষ্ট হয় যখন যে রাজার অধিকার ছিল তিনি বৈশ্য ও শূদ্র দ্বারা স্ব স্ব জাত্যুক্ত কর্ম্ম করাইতে পারিতেন। অন্ততঃ তাহারা যাহাতে স্বজাত্যুক্ত কর্ম্মেব্যাপৃত থাকে এতাদৃশ ভাবে রাজ্য শাসন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

আর দেখ আমেরিকা নামে এক প্রকাণ্ড দেশ খৃষ্টানেরা অধিকার করিয়া বাস করিতেছে। ঐ দেশের পুর্ব্ব অধিবাসিগণ এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে। খৃষ্টানগণ এই অতি কলঙ্কর ব্যাপারের উপপাদনের নিমিত্ত, এক নূতন সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিয়াছেন—যাহা শ্রবণ করিলে গাত্র রোমাঞ্চিত এবং শরীরের শোনিত শীতল হয়। সিদ্ধান্তটি এই "প্রবলাবলসমাগমে প্রবল শেষ"—অর্থাৎ কোন প্রবলজাতির সহিত দুর্ব্বলজাতি একত্র বাস করিলে দুর্ব্বল জাতি বিলুপ্ত হয়, ইতরেরা বৃদ্ধিপায় এবং অবশিষ্ট থাকে। এই পৌলস্ত্য কুলোচিত সিদ্ধান্তানুসারে বিচার করিলেও শূদ্রগণ পরাজিত জাতি বলিয়া উপপন্ন হয় না। কারণ, ব্রাহ্মণ যে এক অতি প্রবল জাতি

ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই—মনু ব্রাহ্মণ জাতির অতীতপ্রভাব বিষয়ে কি বলেন দেখুন—

পরামপ্যাপদংপ্রাপ্য ব্রাহ্মণান্ন প্রকোপয়েৎ।
তেহ্যেনং কুপিতাহন্যুঃ সদ্যঃ সকল বাহনম্। ৩১৩।
লোকানন্যান্ সৃজেয়র্যে লোকপালাংশ্চকোপিতাঃ।
দেবান্কুর্য্যুরদেবাংশ্চকঃ ক্ষিণ্বংস্তান্সমৃধ্নুয়াৎ। ৩১৪।
যানুপাশ্রিত্যতিষ্ঠন্তি লোকাদেবাশ্চসর্ব্বদা।
ব্রহ্মচৈব ধনংযেষাং কোহিংস্যাত্তান্ জিজীবিষুঃ। ৩১৬।

রাজা অত্যন্ত বিপদ্গ্রস্ত হইলেও ব্রাহ্মণদিগকে কোপিত করিবেন না। তাঁহারা কুপিত হইলে তৎক্ষণাৎ সবলবাহন রাজাকে বিনাশকরিতে পারেন। ৩১৩। যাহারা কুপিত হইলে, অন্য লোক সকলকে ও লোকপাল-দিগকে সৃষ্টি করিতে পারেন, এবং দেবতাদিগকে দেবত্ব বিহীন করিতে পারেন তাঁহাদের পীড়া করিয়া কে সমৃদ্ধ হইতে পারে?। ৩১৫। যাহা-দিগকে আশ্রয় করিয়া সকল লোক এবং দেবতাগণ সর্ব্বদা অবস্থান করেন এবং দেব যাহাঁদের ধন, কোন ব্যক্তি জীবনের আশা করিয়া তাহাদের হিংসা করিতে পারে?। ৩১৬। এতাদৃশ প্রভাব সম্পন্ন ব্রাহ্মণ-গণের সহিত বিজিত শূদ্রগণ চিরকাল একত্র বাস করিতেছে অথচ আমেরিকাবাসীদিগের ন্যায় বিলুপ্ত হয় নাই। ব্রাহ্মণের সংখ্যা হইতে শূদ্রের সংখ্যা কোন অংশে ন্যূন নহে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে—মনু ব্যবস্থা করিলেন "ব্রাহ্মণ, নিঃশঙ্ক-ভাবে শূদ্র হইতে ধনগ্রহণ করিতে পারেন। শূদ্রের কোনধনে স্বত্ব নাই তাহার সমুদায় ধনই ভর্ত্তার প্রাপ্য।" এতাদৃশ নিষ্ঠুর বিধিদর্শনে কাহার প্রতীতি না হয় যে, শূদ্রগণ এক সময় নির্জ্জিত ও দাসীকৃত জাতি ছিল।

পরন্তু ইহা সাধারণ শূদ্রসম্বন্ধে বিহিত নহে। সপ্তবিধ দাস শূদ্র সম্বন্ধেই বিহিত হইয়াছে যে তাহাদের ধন ব্রাহ্মণ আপদ কালেই বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেও তাহাকে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে না।

ঐ শ্লোকের টীকা দেখ—

মনুর শ্লোক—৯ম। ৪১৭।

বিপ্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাৎ দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ।
নহিতস্যাস্তিকিঞ্চিৎ স্বং ভর্তৃহার্য্য ধনোহিসঃ।

টীকা। নির্ব্বিচিকিৎস মেব প্রকৃতাদ্দাস শূদ্রাৎ ধনগ্রহণং কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণঃ যস্তস্য কিঞ্চিদপি স্বং নাস্তি; যস্মাত্তর্ত্তৃগ্রাহত ধনোঽসৌ। এব হতাপদি বলাদপি দাসাদব্রহ্মণোধনং গৃহ্ণন্ নরাজ্ঞা দণ্ডনীয় ইত্যেবমর্থ মেতদুচ্যতেইতি কুল্লূকভট্টঃ।

এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে শূদ্রগণ যে পরাজিত ও দাসীকৃত জাতি—আমাদের তাদৃশ সিদ্ধান্তে কোনপ্রকার আস্থা স্থাপন করিতে রুচি হয় না। বিশেষতঃ শূদ্র ও ব্রাহ্মণের মধ্যে যে প্রকার অঙ্গাঙ্গিভাব; বিজিত এবং বিজেতার মধ্যে, সকলবিষয়ে সমান অধিকার লাভ না করিলে, তাহা সম্ভব হয় কি না বিশেষ সংশয়ের বিষয়। অধিকন্তু শূদ্রগণ সমর নির্জ্জিত এতাদৃশ কোন সংস্কার কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র কাহার মনে নাই। কোন গ্রন্থেও তাদৃশ প্রমাণ বা আখ্যান দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমান বিজয়ী জাতীয় লোক বিজিত জাতিকে যদ্রূপ নিরস্ত্র বা অতি প্রয়োজনীয় লবণাদি শিল্প হইতে ছলে বলে বঞ্চিত করিয়া সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী করিতে চেষ্টা করেন—ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের প্রতি কখনও তাদৃশ কৌশল প্রদর্শন করেন নাই। মনুর দশম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে দৃষ্ট হয়—ব্রাহ্মণ যথাশাস্ত্র সমুদায় জাতির জীবিকা ও বৃত্তি শিক্ষা করিবেন এবং তাহাদিগকে উহা উপদেপ দিবেন ও স্বয়ং তাদৃশ নিয়মে রত থাকিবেন। যথা সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণো বিদ্যাৎ বৃত্ত্যুপায়ান্ যথাবিধি প্রব্রূয়াদিতরেভ্যশ্চ স্বয়ং চৈব তথা ভবেৎ।”

এই জীবিকা বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধি সকল শূদ্রের পক্ষে যত অনুকূল ব্রাহ্মণের পক্ষে তদ্রূপ নহে। এই সমুদায় বিবেচনা করিলে প্রমাণিত হইবে যে “শূদ্র কস্মিন্ কালেও পরাজিত জাতি নহে। এবং ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য পাশববল মূলক নহে উহা জ্ঞান ও ধর্ম্ম মূলক। আক্ষেপের বিষয় আমাদের মধ্যে অনেক “প্রায়োগিকং মাৎসরিকং মাধ্যস্থ্যং পাক্ষপাতিকং। সোপন্যাসঞ্চ জানীয়াৎ বচঃ সংশয়িতং তথা” এই ষড়্‌বিধবাক্য ভেদ নিরূপণে অক্ষমতা নিবন্ধন বিদেশাগত সমুদায় সিদ্ধান্তই বিশ্বাস করিয়া তদ্দ্বারা সমাজে নানা বিপ্লব উপস্থিত করিতেছেন। আমরা তাহাদিগকে

বন্ধুভাবে অনুরোধ করি যে তাহারা ব্রজবিহার ক্রমে যে সকল বৈদেশিক সিদ্ধান্ত এযাবৎ কেবল উদরসাৎ করিয়াছেন; সম্প্রতি রোমন্থন করিয়া সারাংশ গ্রহণ এবং অসার ভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাজ দেহের স্বাস্থ্য বিধান করুন্।

ইন্দ্রিয় চাপল্যে কোন কুলকলঙ্কিনী রমণী নিজ কলুষিত কর্ম্মের জন্য কোন সজ্জন কর্ত্তৃক অনুযুক্তা হইলে, সে স্বীয় দোষ লাঘবের নিমিত্ত, স্বামী শ্বশুর শ্বশ্রূ ননন্দা প্রভৃতি স্বামিকুলবাসিজনগণের প্রতি নানাবিধ দোষ আরোপ করিয়া থাকে;—এই মানসিক দুর্ব্বলতা পূর্ব্বে নারী জাতিতেই পরিলক্ষিত হইত। সম্প্রতি নারী জাতির সাম্যাভিলাষী এতদ্দেশীয় কোন কোন পুরুষেও ইহা ষোড়শকলায় উপলব্ধ হয়। ইহারা লোভে বা আলস্যে বা অজ্ঞতা নিবন্ধন নিজকুল, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া পৈত্রিক ধর্ম্ম, ধর্ম্মাচার্য্য প্রভৃতির প্রতিকূলে নানাবিধ কলঙ্কারোপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহারা যেন পিতৃকুলের সমালোচন কালে, রসনা সংযম করিতে অভ্যাস করেন। কারণ ইহার অভাবে লোকে তাহাদের বাক্যে, ছিন্নলাঙ্গুল শৃগাল ন্যায়ে, আস্থা করিতে বিরত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

ভূমিকা।

পৃথিবী অনন্ত। কেন না, ইহা কোন সম্বৎসরের কোন মাসের কোন তারিখে কি বারে কত ঘণ্টা কত মিনিটের সময় সৃষ্ট হইয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারে না, কোনঠাঁই লেখা পড়াও নাই। যাহারা ঐ কথা বলিয়াছে তাহাদের কথা বিজ্ঞানের কাছে উন্মত্ত প্রলাপ হইয়াছে। এইজন্য বিজ্ঞ বিচক্ষণ তত্ত্ব দর্শী মাত্রেই বলেন পৃথিবীর সৃষ্টি অনন্ত কাল হইতে, সেকাল মনুষ্যের গণনার মধ্যে আসে না। পৃথিবীর সৃষ্টির ক্রমও অনন্ত রূপ এবং ইহাতে সৃষ্টপদার্থেরও অন্ত নাই; জল, স্থল, প্রাণী,

উদ্ভিদ, ফল, ফুল যা কিছু দেখ, যাহা কিছু শুন, সকলই অনন্ত। অনন্তকাল হইতে উৎপন্ন অনন্তকাল অবধি অবস্থিত এবং কত কালে যে বিলীন হইবে তাহারও ইয়ত্তা নাই।

এই অনন্ত জগন্মণ্ডলের তুলনায় এই মানুষ একটী নগণ্য কীটানু বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতম কোন বস্তু যদি থাকে তৎসদৃশ হইলে ও অনন্ত। আকার, প্রকার, জাতি, ও স্বভাব ভেদে মনুষ্য অনন্ত। এই অনন্ত মনুষ্যের ভাষা অনন্ত, শাস্ত্র অনন্ত, ধর্ম্ম অনন্ত, ব্যবসায় অনন্ত, রুচি অনন্ত।

অন্য দেশের কথা বলি না, অন্য জাতির কথা ছাড়িয়া দিলাম, এই ভারতবর্ষের আর্য্য জাতির কথাই বলিতেছি। আর্য্য জাতির গ্রন্থ সকল পাঠ কর,—বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ, পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র পড়িয়া দেখ—দেখিবে এই আর্য্য জাতির মধ্যেই অনন্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কত ঘাত প্রতিঘাত, বিমর্দ্দ সম্মর্দ্দ, জয় পরাজয়, উদয় অস্ত অথবা এক কথায় সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় ঘটিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? কত রাজবিপ্লব, কত দেশ বিপ্লব, কত ধর্ম্ম বিপ্লব, আর কত যে সমাজ বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহারও অন্ত নাই। প্রাচীন ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র হইতে চৈতন্য চরিতামৃত পর্য্যন্ত যে কিছু সংস্কৃত পুস্তক পাওয়া যায় সকল গুলি একটু মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই আর্য্য জাতির মধ্যে ধর্ম্ম-ভেদ বা সমাজ বিপ্লব একটা নূতন কথা নয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্রপাত হইবার অনেক পূর্ব্বেও ভারতে ধর্ম্ম বিপ্লবের কথা শুনা যায়, আদি কাব্য রামায়ণে ঘোর নাস্তিকের কথা পওয়া যায়। ধর্ম্ম লইয়া ভারতে যত মতভেদ এরূপ আর কোথায়ও হইয়াছে কি না সন্দেহ।

পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া দেখিলে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল ধর্ম্ম বিপ্লব হইয়াছে তাহার তুলনায় বর্ত্তমান ধর্ম্ম বিপ্লব কিছুই নয় বলিলেই চলে। আধুনিক ধর্ম্ম বিপ্লব অতি সামান্য হইলেও বর্ত্তমান কলিযুগ প্রভাবেই হউক অথবা অধঃপতন মুলক দুষ্ট দৃষ্টির প্রভাবেই হউক আমাদের মধ্যে আর একটি ভয়ানক বিপ্লব ঘটিয়াছে। সেইটিই বিশেষ ভয়ের জিনিষ বা অনিষ্টের মূল। সেটি আর কিছুই নয় সত্যের বিপ্লব।

পূর্ব্বকার লোকেরা যে যে ধর্ম্মেই দীক্ষিত হউক না কেন আন্তরিক

বিশ্বাসের সহিতই তাহা প্রতিপালন করিত। এবং কেবল কথায় নিজের ধর্ম্ম বা বিশ্বাস স্থাপন করিত না। তখন "দিনে গৌররাতে যীশুখৃষ্ট ভজার' দল ছিল না। তখন যাহারা বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন, তাহারা অন্তরে বাহিরে ঐ ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেন এবং বিরুদ্ধাচারীর সহিত কোন রূপ সংশ্রব রাখিতেন না। বৈদিক ধর্ম্ম যাহা এক্ষণে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা আর কিছুই নয় কেবল কতকগুলি সদাচার প্রতিপালন। সে আচার গুলি প্রতিপালন না করিলেই পাতিত্য ঘটিত। একবার পতিত হইলে আর বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দলে প্রবেশ করা যাইতে পারিত না। সুতরাং তখন ধর্ম্মে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সুযোগ বুঝে আজ ব্রাহ্ম, কাল হিন্দু হইবার যো ছিল না। অথবা স্বয়ং যথেচ্ছাচরণ করিয়া হিন্দুদিগের মন ভুলাইবার জন্য কেবল মুখে হিন্দুধর্ম্মের জয় গান করিলে হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারা যাইত না। কারণ প্রধানতঃ আচার রক্ষাই তখন হিন্দুধর্ম্ম পালন বলিয়া গণ্য হইত। এই আচার রক্ষা মুখের কথা নয়, হাতে কলমে করা চাই।

ঐ আচার গুলি বর্ণ এবং আশ্রমভেদে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া বর্ণাশ্রমাচার নামে প্রসিদ্ধ। এইরূপ বর্ণাশ্রমাচার পৃথিবীর আর কোন স্থলে নাই, আর যদিও কোন স্থলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে থাকে—ধর্ম্মের সঙ্গে উহার কোন সংশ্রব নাই। আচার রক্ষার নাম যে ধর্ম্ম ইহা ভারতবর্ষের আর্য্যঋষিগণ ভিন্ন আর কেহই বলেন নাই। ধর্ম্মের এ রহস্য আর কেহই বুঝেন নাই এবং সেই জন্যই ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোন দেশেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া একটা কথা নাই। সনাতন ধর্ম্ম আর কিছুই নয় কেবল কতকগুলি শাস্ত্রোক্ত সদাচারের প্রতিপালন মাত্র। অনন্ত ধর্ম্ম বিপ্লব ঘটিয়াছে, অনন্ত চার্ব্বাক্ বুদ্ধদেবের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের সমগ্র স্থান প্রায় বিধর্ম্মে আচ্ছন্ন, কিন্তু বর্ণাশ্রমাচার যেটুকু কেন্দ্র করিয়া অবস্থান করিত সেই টুকুর মধ্যে অতি পবিত্রভাবেই ছিল ও অতি বিশ্বাসের সহিতই রক্ষিত হইত। এবং সেই পবিত্রতা প্রভাবেই ইহা যুগ যুগান্তর ধরিয়া বিধর্ম্মীর আক্রমণ উৎপীড়ন সহ্য করিয়া মৃত প্রায় হইয়াও পুনরায় উজ্জীবিত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। পুনরায় আবার সমুদয় বাধা

নিরোধ অতিক্রম করিয়া সমগ্র ভারত ভূমি আচ্ছাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এই বর্ণাশ্রমাচার ভারতবর্ষের স্বভাবানুসারে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রাণের গতি অনুসারে গঠিত। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন জাতিভেদ নাই একমেবাদ্বিতীয়ংই" পরমধর্ম্ম. আমরাও স্বীকার করিলাম। কিন্তু এ সব কাহার পক্ষে ? সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে, গৃহীর পক্ষে নয়। গৃহীর পক্ষে একমাত্র বর্ণাশ্রমাচার প্রতিপালনই ধর্ম্ম।

খাদ্য।

শরীরের সহিত শরীরীর সম্বন্ধ যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন ভৌতিক ভোগ্য-জাত শরীর ধারণের প্রধান সাধন হইবে। তন্মধ্যে, তেজ, বায়ু, জল ও পৃথিবী এই ভূত চতুষ্টয়ের আবশ্যকতা অহরহ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আবার ইহাদের মধ্যেও বায়ুঃ, জল ও পৃথিবীর প্রয়োজনীয়তা কতকটা শীঘ্র অনুভব করিতে সমর্থ্য হওয়া যায়, কিন্তু তেজের প্রয়োজন কিঞ্চিৎ অনুধাবন ব্যতীত বোধগম্য হয় না। বায়ু ভিন্ন ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারি না। জল ভিন্ন কিছুকাল জীবিত থাকিতে পারি, কিন্তু অধিক কাল নহে। খাদ্য ভিন্ন দুই একদিন মাত্র প্রাণন কার্য্যে সমর্থ্য হই। পিপাসা ও বভুক্ষা প্রতিদিন আমাদিগকে দর্শন দিয়া থাকে। এই সমস্ত বিষয় প্রতিদিন আমরা উপলব্ধি করিতেছি। প্রাণন কার্য্য প্রাণায়াম-পর, যোগী ভিন্ন অন্যের বোধ করিবার অনুমাত্রও শক্তি নাই। কাহার সাধ্য প্রকৃতির সহিত বিরোধ করে ? বিরোধ হইলে প্রথমতঃ যাতনা ও অন্তিমে শেষ দশা উপনীত হইয়া থাকে। প্রাণি সকল স্বভাবের অনতীক্রমনীয় বিধানে পরিচালিত। প্রকৃতি সুন্দরী বিবিধ বেশে সুসজ্জিত হইয়া বহুবিধ-উপকরণ পূর্ণ-হস্তে প্রত্যেকের নিকট দণ্ডায়মানা। সেই দ্রব্য-সম্ভার আমাদের "জীবন ও দেহধারণের প্রধান উপায়।

দেহিগণ বিবিধ বিচিত্র দেহে মায়ার লীলা প্রকটন করিয়া থাকে। দেহি-গণের দেহ যেমন বিভিন্ন, খাদ্যও তদ্রুপ বিভিন্ন। ভূচর, খেচর, জলচর ও উভচরগণের খাদ্য গ্রহণে অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে, সুতরাং গ্রহণ-সাধন কল সকলও বিভিন্ন। আবার গ্রাহ্য পদার্থ নিচয়েও সকলের তুল্য প্রীতি হয় না। একে যাহা হেয় বলিয়া পরিহার করিয়া থাকে, ঘৃণ্য বোধে দূর হইতেই বিসর্জ্জন দেয়, অন্যে তাহা উপাদেয় স্থির করিয়া সাগ্রহে গ্রহণ করে। একের ত্যক্ত পদার্থ অন্য প্রাণীর অমৃতোপম। ইহা যেমন বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তেমন একাকৃতিক প্রাণীর মধ্যেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেশভেদে রুচিভেদে, অবস্থাভেদে ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ভেদে উহার ভেদ হইয়া থাকে। আর্য্য, যবন, ম্লেচ্ছ, শাক ও ফ্রুকশ প্রভৃতির খাদ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিলেই উহা দৃষ্ট হয়। যাহারা অসভ্য অজ্ঞ তাহারা প্রায়ই পশ্বাদির প্রায় আমাহারে দেহ পোষণ ও জীবন ধারণ করিয়া থাকে। পশুর মধ্যেও উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট আছে। উৎকৃষ্ট পশুগণের আহারও ম্লেচ্ছাদির আহার প্রায় একরূপ। মানুষ ও পশু উভয়েই প্রাণী। প্রাণী হইয়াও বিবেকবলে মানুষ প্রধান। বিবেক রাহিত্যে পশু অধম। মানব বিবেক বলে ইন্দ্রিয় গ্রাম নিরোধ করিতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ মনুষ্যোচিত ক্ষমতা আছে, আর যে তাহাতে অক্ষম সেই পশুতুল্য। এই বিবেক ও নিরোধগুণে আর্য্যগণ জগতের গুরু, সুতরাং ভূদেব। অনার্য্যগণ অবিবেক, ও উশৃঙ্খলতায়, নর-পিশাচ।

আমরা নিয়তই ইহা বলিতেছি যে, ছলে বলে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিলেই সভ্য হয় না। যাহাদের যত বিচার শক্তি ও কার্য্যফল বোধে পরিণাম ভাবনা আছে, তাহারা তাবন্মাত্র সভ্য। আর্য্য ভিন্ন অন্য জাতির অতি অল্পই বিচার শক্তি আছে। অতএব আর্য্য জাতির খাদ্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিলেই খাদ্য সম্বন্ধে প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা প্রকটিত হইতে পারে। আর্য্যজাতির ইহাই অসাধারণ বিজ্ঞতা ও সভ্যতার নিদর্শন যে, উহাঁরা যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া খাদ্য জাতের বিনির্ণয় করিয়াছেন তেমন উহা ধর্ম্মানুগতও করিয়াছেন। ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আর্য্য কার্য্যকলাপ পবিত্র এবং ভব্যতা ও বিজ্ঞতার উৎকৃষ্ট চিহ্ন। পরম হিতৈষিনী শ্রুতি বলিয়াছেন "অন্নময়ং হি সৌম্যমনঃ" যে যেরূপ অন্ন অশন করে তাহার মনও তদনুরূপই হয়। অন্নই পরিণাম

প্রাপ্ত হইয়া দেহ ধারণ করে। দেহ ও মনের নৈকট্য সম্বন্ধ, সুতরাং অন্নানুসারে দেহের সংস্থান ও মনের গতি বিভিন্ন হইয়া থাকে ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। আমমাংসভোজী অসভ্য বর্ব্বর, প্লুষ্ট মাংসভোজী ম্লেচ্ছ, ও পক্কমাংসভোজী যবন ইহাদের মনের গতি পর্য্যালোচনা করিলেই উহা আরও বুঝা যাইতে পারে। উহাদের মন বাহ্য জগতেই আকৃষ্ট এবং দয়া দাক্ষিণ্য ও শৌচাদি সুগুণ হইতে সুদূরে অবস্থিত। অন্তর্জগতের গভীরতত্ত্বে শেষোক্ত জাতির মন কথঞ্চিৎ প্রধাবিত হইতে পারে মাত্র, কিন্তু আধ্যাত্ম বিষয়ে একান্তই দুর্ব্বল, ইহার কারণ কি? পাশববলের উপচয় হইলেও অন্তর্ব্বলে উহারা নিরতিশয় দীন ও কৃপণ। নিরোধগুণে মানবের মানবত্ব, কিন্তু উহাদের ঐ গুণ অতি অল্পই আছে।

জগৎ মায়াময়। মায়ার উপাদান সত্ত্ব, রজ ও তম। প্রত্যেক পদার্থেই ঐ ত্রিগুণ আছে। ঐ ত্রিগুণ বা দ্রব্যত্রয়ই দেহীদিগের দেহে পিত্ত, বাত ও শ্লেষ্মারূপে বিরাজিত। উহারা মিশ্রিত ও ক্রম পরিণামে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মারূপে পরিণত হইয়াছে। সাঙ্খ্যাদি দর্শন ও বৈদ্যক শাস্ত্র যাহারা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাহারা ইহা অবগত আছেন।

" দোষধাতুমলাদীনাং নেতা শীঘ্রঃ সমীরণঃ।
রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মো রূক্ষঃ শীতো লঘুশ্চলঃ ॥ "

ভাব প্রকাশঃ।

বায়ু রজোগুণময়, সূক্ষ্ম, রূক্ষ, শীত, লঘু ও চল। বায়ুই, দোষ, ধাতু ও মলাদির নেতা।

পিত্তমুষ্ণং দ্রবং পীতং নীলং সত্ত্বগুণোত্তরম্।
সরং কটু লঘুস্নিগ্ধং তীক্ষ্ণ মম্লন্তু পাকতঃ ॥"

ভাব প্রকাশঃ।

পিত্ত সত্ত্বগুণময়। উহা নিরাম ও সামভেদে পীত ও নীল, কটু, লঘু, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ এবং পাকে অম্ল।

"শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা
তমোগুণাধিকঃ স্বাদুর্বিদগ্ধো লবণোভবেৎ"।

ভাব প্রকাশঃ।

শ্লেষ্মা তমোগুণাধিক। শীতল, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ইত্যাদি।

বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের অবতার ইহাই বলা হইল। মানুষের প্রকৃতিও তদনুসারে গঠিত হয়। বাত প্রকৃতি, পিত্ত প্রকৃতি ও শ্লেষ্মা প্রকৃতি।—মিশ্রণে, বাত-পিত্ত প্রকৃতি কি বাতশ্লেষ্ম-প্রকৃতি ইত্যাদিও হইয়া থাকে। ফলতঃ যাহার যে গুণ প্রধান তদনুসারে তৎপ্রকৃতিক বলিয়া অভিহিত হয়। আহার বিহার ও তপস্যা সাহচর্য্যে প্রকৃত্যন্তর সম্ভটনও ঘটিয়া থাকে। এখন সঙ্খেপতঃ কোন্ প্রকৃতির কেমন ক্রিয়া ও আচরণ তাহার উল্লেখ করাযাইতেছে।

সত্ত্বগুণ প্রধান মনের লক্ষণ।

"আস্তিক্যং প্রবিভজ্যহভোজন মনুত্তাপশ্চ তথ্যং বচঃ
মেধাবুদ্ধিধৃতিক্ষমাশ্চ করুণা জ্ঞানঞ্চ নির্দ্দম্ভতা।
কর্ম্মানিন্দিতং স্পৃহশ্চ বিনয়ো ধর্ম্মঃ সদৈবাদ-
রাদেতে সত্ত্বগুণান্বিতস্য মনসো গীতা গুণা জ্ঞানিভিঃ॥"

ভাব প্রকাশঃ।

আস্তিক্য, প্রবিভজ্য ভোজন (পবিত্র ভোজন অর্থাৎ অতিথি প্রভৃতিকে প্রদানান্তর যজ্ঞাবশেষ ভোজন) অক্রোধ, সত্যবচন, মেধা, বুদ্ধি, ধৃতি, ক্ষমা, করুণা, জ্ঞান, (আত্মজ্ঞান) নির্দ্দম্ভতা, অনিন্দিত কর্ম্ম, নিষ্কাম, বিনয় ও ধর্ম্ম এই সকল গুণ সতত সত্বগুণ প্রধান মানসে বিচরণ করে, ইহা জ্ঞানিগণ বুঝিয়াছেন॥

রজোগুণ প্রধান মনের লক্ষণ।

"ক্রোধস্তাড়ন শীলতা চ বহুলং দুঃখং সুখেচ্ছাধিকা
দণ্ডঃকামুকতাপ্যলীক বচনঞ্চাধীরতাহঙ্কৃতিঃ।
ঐশ্চর্য্যাভিমানিতাতিশয়িতানন্দোধিকশ্চাটনং
প্রখ্যাতাহি রজোগুণেন সহিতস্যৈতেগুণাশ্চেতসঃ॥"

ভাব প্রকাশঃ।

চিত্তে রজোপ্রাবল্যে নিম্নলিখিতগুণ সমস্ত পরিলক্ষিত হয়। ক্রোধ, তাড়নশীলতা, বহু দুঃখ, অধিক বিষয় সুখবাসনা দম্ভ, কামুকতা, অলীকবচন অধীরতা, অহঙ্কার, ঐশ্বর্য্যাদির অভিমানে অতি আহ্লাদ ও পর্য্যটন।

তমোগুণ যুক্ত মনের লক্ষণ।

"নাস্তিক্যং সুবিষন্নতাতিশয়িতালস্যং চ দুষ্টামতিঃ।
প্রীতির্নিন্দিত কর্ম্ম শর্ম্মণি সদা নিদ্রালুতাহর্নিশম্॥
অজ্ঞানং কিল সর্ব্বতোঽপি সততং ক্রোধান্ধতা মূঢ়তা।
প্রখ্যাতাহি তমোগুণের সহিত স্যাতে গুণাশ্চেতসঃ॥

ভাব প্রকাশঃ।

নাস্তিক্য, সুবিষন্নতা, অতিশয় আলস্য, দুষ্টমতি, নিন্দিত কর্ম্মকে সুখজনক বুঝিয়া তাহাতে প্রীতি, সতত নিদ্রালুতা, সর্ব্ব বিষয়ে অজ্ঞান, সর্ব্বদা ক্রোধান্ধতা ও মূঢ়তা তমোগুণ প্রধান মানসে পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক দেহীর উক্তগুণত্রয় বিদ্যমান আছে। যাহাতে যে গুণের আধিক্য তিনি তৎপ্রকৃতিক বলিয়া কথিত হন্।

" তত্র প্রভূত সত্ত্বস্তু সাত্ত্বিকঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
রাজসস্তামসশ্চৈব ত্রিবিধাগুণ মানবঃ॥"

ভাব প্রকাশঃ।

ঐ সকল গুণের মধ্যে প্রভূত সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তি, সাত্ত্বিক, তদ্রূপ রাজস ও তামস ইত্যাদি।

এখন দেখা যাউক ঐরূপ মানব সকলের কিরূপ আহারে রুচি হয়।

" আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরাহৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ॥"

ভগবদ্গীতা।

যাহা আহার করিলে আয়ুঃ, চিত্তের স্থৈর্য্য, বল, আরোগ্য, অকৃত্রিম সুখ এবং প্রীতি বিবর্দ্ধন করে, যে আহার রসযুক্ত এবং স্নেহ প্রধান, যে দ্রব্য আহার করিলে তাহার ক্রিয়া অধিককাল শরীরে স্থায়ী হয় এবং যাহা বিকট বা উৎকট গন্ধযুক্ত নহে তাদৃশ দ্রব্য সকল সাত্ত্বিক লোকের প্রিয়।

" কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরূক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজস স্যেষ্টা দুঃখ শোকাময়প্রদাঃ॥"

ভগবদ্গীতা।

যেসকল দ্রব্য অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবন যুক্ত, অত্যুষ্ণবীর্য্য, অতিতীক্ষ্ণ, অতিরুক্ষতাকারক এবং উত্তাপ বিবর্দ্ধক তাহা রাজস প্রকৃতির প্রিয়। এইরূপ আহারদ্বারা দুঃখ শোক ও নানা প্রকার ব্যাধি হইয়া থাকে।

"যাতযামং গতরসং পুতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপিচামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥"

ভগবদ্গীতা।

যাহা অর্দ্ধপক্ক, বিরসতাপ্রাপ্ত, পুতিমৎ, (দুর্গন্ধি) পর্য্যুসিত (বাসি) উচ্ছিষ্টাদি অমেধ্য, তাহা তামস লোকের প্রিয়।

আমরা কার্য্য সৌকর্য্য জন্য আরও দুইটী কথা বলিয়া রাখি।

আহার্য্য দ্রব্যের রস ষড়বিধ।

"মধুরো লবণস্তিক্তঃ কষায়োঽম্লঃ কটুস্তথা।"

১ মধুরো, ২ লবণ, ৩ তিক্ত, ৪ কষায়, ৫ অম্ল ও ৬ কটু। যাহা ঝাল তাহাই কটু, যথা কটু তৈল (সার্ষপতৈল)

"কটুস্তু তীক্ষ্ণ সংজ্ঞঃস্যাৎ মরীচাদৌ সচেষ্যতে"।

আহার ও ষড়বিধ।

"আহারং ষড়্বিধং চুষ্যং পেয়ং লেহ্যন্তথৈবচ।
ভোজ্যম্ভক্ষ্যন্তথাচর্ব্ব্যং গুরু বিদ্যাৎযথোত্তরম্॥"

ভাব প্রকাশ।

১ চুষ্য, ২ পেয়, ৩ লেহ্য, ৪ ভোজ্য, ৫ ভক্ষ্য, ও ৬ চর্ব্ব্য। ইহাদের একটী হইতে অপরটী ক্রমে গুরু। চুষ্য যথা—ইক্ষু দাড়িমাদি। পেয়—পানক শর্করোদকাদি। লেহ্য—রসাল কপিত্থাদি। ভোজ্য—ব্যঞ্জন প্রভৃতি। ভক্ষ্য—লড্ডুক মোদকাদি। চর্ব্ব্য—চিপিটক চণকাদি।

কতিপয় লোক গোধুমঃ আতপতণ্ডুল, ঘৃত দুগ্ধ শর্করা প্রভৃতি খাদ্যে অনুরক্ত, কেহ মাংস ও অতি তীব্র উপস্কার (বাট্না মস্লা প্রভৃতি) সংযুক্ত সুপাদি বা পলান্ন প্রভৃতি আসুর বা রুক্ষ বীজ-কীটাদি আহারে সোৎসুক, কেহ বা অমেধ্যোদ্ভব কপি, শালগম, মোদক বিপনির পর্য্যুষিত মিষ্টান্ন, এবং বিপনির উচ্ছিষ্ট অন্ন গ্রহণে ব্যাকুল। পাঠক! এই ত্রিবিধ

খাদ্য গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করিলে তোমার কোন্‌টী প্রিয় হইবে? যদি সাত্ত্বিক হও তবে আতপ তণ্ডুল কাচকলা ঘৃত দুগ্ধাদি, যদি রাজস হও পলান্নাদি, আর যদি তামস হও তবে সত্বর অন্ন-বিপণিতে গমন পূর্ব্বক সদ্য উদর পূরণ করিয়া বাষ্পীয় শকটে আরোহণ কর। সদ্যই গৌরাঙ্গ দর্শনে ও স্পর্শনে পুলকিত তনু ও অন্তিমে শ্বেত দ্বৈপায়ন ধাম লাভ হইতে পারিবে। আশু প্রীতিকর আহারে উদর পূর্ণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। লোভ অশেষ অনর্থের হেতু, পরিণাম দর্শনে কার্য্য বিচার, বুদ্ধিমান আর্য্যের কার্য্য। অতএব সকলেরই সাত্ত্বিক আহার করা উচিত এবং সত্ত্ব প্রকৃতিক হওয়া কর্ত্তব্য। কেননা "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্"। জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই।

"নাবেদবিন্মনুতেতমিতি" শ্রুতিঃ

"তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যু মেতি" শ্রুতিঃ

"মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব নচান্যথা"

পঞ্চদশী।

জ্ঞানই মুক্তির কারণ। তাহাই মানবের প্রর্থনীয় ও পরম পুরুষার্থ। জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে সাত্ত্বিক আহার করিতে হইবে, সুতরাং আহারের সহিত ধর্ম্মের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। উহা আরও বিশদ করিয়া বুঝান যাইতেছে।

প্রাণিগণের আহার গ্রহণ স্বাভাবিক। কারণ, আহার ভিন্ন জীবন থাকে না। আহার গ্রহণ করিতে হইলে সেইরূপ আহারই গ্রহণ করা উচিত যাহাতে শরীর ও মন পবিত্র থাকে, দেহধাতু সংরক্ষিত হয়, খাদ্যগুলি সুখাদ্য সারবান হয়, এবং সহজে জীর্ণ হইয়া শরীর কার্য্যে বিনি-যোজিত হয়। আবার সেই দেহ ও দেহজ বলরক্ষণার্থ অন্য প্রাণি-হনন না করিয়া, অন্যের ক্ষতি না জন্মাইয়া, সারবান্ আহার গ্রহণ করা বিধেয়। আপাততঃ আমাদের ইন্দ্রিয় ও মন আশু প্রীতিজনক বিষয়ে সহজে প্রবৃত্ত হয়। অনেক সময়ই তাহাতে অশেষ অকল্যাণ জন্মে। কোন্ সময় কোন্ বিষয়ের প্রতি নিরাকাঙ্ক্ষ হইতে হইবে আমাদের ততদূর অভিজ্ঞতা নাই। সুতরাং শাস্ত্র ও শিষ্টবৃদ্ধের অনুসরণ আবশ্যক। যাহা মেধ্য সারবান, রুচিকর, ও চিত্ত চাঞ্চল্যের পরিপন্থী তাহাই উৎকৃষ্ট খাদ্য।

আবার তাহাও [illegible] অবশ্য কর্ত্তব্য। নচেৎ [illegible] আহারেও অপকার হয়। সময়ের সহিতও সম্পর্ক আছে। সময় মত, পরিমাণানুসারে উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করিতে হইবে ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করি-বেন। উহার ব্যতিক্রমে ভোজন করিলে বিষমাশন হয়।

"বহু স্তোকমকালে চ অশনং বিষমাশনম্"

বৈদ্যক শাস্ত্র।

ভুক্ত দ্রব্য সম্পূর্ণরূপ জীর্ণ না হইলে ভোজন করাও মহান্ দোষ। ঐরূপ ভোজনকে অধ্যশন বলে।

"অজীর্ণে ভুজ্যতে যত্তু তদধ্যশনমুচ্যতে,,

ভাব প্রকাশঃ।

এতদ্ভিন্ন বিরুদ্ধাশনও পরিত্যজ্য। কোন দ্রব্য দ্রব্যান্তরের সহিত সংযুক্ত হইলে বিরুদ্ধ হয়। যথা—

"সংযোগ বিরুদ্ধ,,

"মৎসমানূপ মাংসঞ্চ দুগ্ধযুক্তং বিবর্জ্জয়েৎ।
কপোতং সার্ষপস্নেহেং ভার্জ্জিতম্পরিবর্জ্জয়েৎ॥
মৎস্যানিক্ষোবিকারেণ তথা ক্ষৌদ্রেণ বর্জয়েৎ।
শক্তূন্ মাংস পয়োযুক্তানুষ্ণেণাপি বিবর্জ্জয়েৎ॥
উষ্ণৈর্নভোজ্যমুনা ক্ষৌদ্রং পায়সং কৃশরান্বিতম্।
রম্ভাফলং ত্যজেৎ তক্রে দধি বিল্বফলান্বিতম্॥
দশাহমুষিতং সর্পিঃ কাংস্যে মধু ঘৃতং সমম্।
কৃতান্নঞ্চ কষায়ঞ্চ পুনরুষ্ণীকৃতং ত্যজেৎ॥
একত্র বহুমাংসানি বিরুদ্ধ্যন্তে পরস্পরম্।
মধুসর্পির্বসা তৈল পানীয়ানি যথা তথা॥" ভাব প্রকাশঃ।

দুগ্ধযুক্ত মৎস্য * ও মাংস বর্জ্জন করিবে। সার্ষপ-তৈল-ভর্জ্জিত কপোত

---

* মূলে আনূপ মৎস্য আছে আমরা সামান্যতঃ মৎস্যই লিখিলাম।

"কূলে চরাঃ প্লবাশ্চাপি কোশস্থাঃ পাদিনস্তথা।
মৎস্যা এতে সমাখ্যাতাঃ পঞ্চধানূপজাতয়ঃ॥

ভাব প্রকাশঃ।

পরিত্যজ্য। গুড়, চিনি ও মধুযুক্ত প্রভৃতি মৎস্য বর্জন করিবে। মাংস বা দুগ্ধযুক্ত শক্তু (ছাতু) এবং উষ্ণ দ্রব্য সংযুক্ত দধি পরিবর্জ্জনীয়। উষ্ণদ্রব্য বা নক্ত জল যুক্ত মধু এবং পায়স ও খিচুরী সংযুক্ত হইলে বিরুদ্ধ হয়। ঘোলে কদলী, ও বিল্বে দধি বিরুদ্ধ। কাংসপাত্রে ঘৃত মধু রাখিলে তাহা যেমন বিরুদ্ধ, তেমন দশদিনের অধিক ঘৃত রাখিলে তাহাও বিরুদ্ধ হয়। অন্ন ও কষায় একবার প্রস্তুত হইলে পুনর্ব্বার উষ্ণ করিলে বিরুদ্ধ হয়। বহুমাংস একত্র হইলে পরস্পর বিরুদ্ধ হয়। মধুসর্পিবসা তৈল ও পানীয় হইলে যথাতথা বিরুদ্ধ। *

বিরুদ্ধাশনের ফল।

"ব্যাধিমিন্দ্রেয় দৌর্ব্বল্যং মরণঞ্চাধিগচ্ছতি।
বিরুদ্ধরস বীর্য্যাণি ভুঞ্জানোনাত্মবান্নরঃ॥"

বিরুদ্ধরস ও বিরুদ্ধবীর্য্য দ্রব্যাহারে ব্যাধি, ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য ও মরণ হয়। আত্মবান্ (মনস্বী, জ্ঞানবান্ ইত্যাদি) হওয়া ত ঘটেই না।

'ঘৃতস্তৈলঞ্চ পানীয়ে, কষায়ং ব্যঞ্জনয়াদিকম্।
পক্ক শীতীকৃতং চোষ্ণং তৎসর্ব্বংস্যাদ্বিষোপমম্॥'

পানীয়ে, ঘৃত ও তৈল, ও কষায়, ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া একান্ত শীতল অথবা উষ্ণাবস্থা, বিষের তুল্য হয়।

স্বভাবতঃ হিত।

"শালীনাং লোহিতঃ শালি যষ্ঠিকেষু চ যষ্ঠিকা।
শূকধ্যানেষ্বাপি যবো গোধূমঃ প্রবরো মতঃ॥
শমীধান্যে বরো মুদ্গো মসুরশ্চাঢ়কীতথা।
রসেষু মধুরঃ শ্রেষ্ঠো লবণেষু চ সৈন্ধবম্।
দাড়িমামলকদ্রাক্ষা খর্জ্জুরঞ্চ পরূষকম্।
রাজাদনং মাতুলুঙ্গং ফলবর্গেষু শস্যতে॥

---

* ইহার অনুবাদে সন্দেহ আছে।

পত্রশাকেষু বাস্তুকং জীবন্তী পোতিকা করা।
পটোলং ফলশাকেষু কন্দশাকেষু সূরণম্ ॥
এণঃকুরঙ্গো হরিণোঙ্গলেষু প্রশস্যতে।
পক্ষিণাং তিত্তিরির্লাবো বরোমৎস্যেষু রোহিতঃ ॥
হরিণ স্তাম্রবর্ণঃস্যাৎএণঃ কৃষ্ণতয়ামতঃ।
কুরঙ্গ স্তাম্র উদ্দিষ্টো হরিণাকৃতিকোমহান্ ॥
জলেষু দিব্যং দুগ্ধেষু গব্য মাজ্যেষু গোরসম্।
তৈলেষু তিলজস্তৈল মৈক্ষবেষু সিতা হিতো ॥

"শস্যং ক্ষেত্রগতং প্রাহুঃ সতুষং ধান্য মুচ্যতে"। স্মৃতিঃ। অতএব মাংস্য, মটর, যব, গোধূম, কর্ত্তৃতি, সকলই ধান্য। অধুনা ধান্যশার কেবল শালি জাতিই ব্যবহৃত হয়। উপরিলিখিত বচনগুলি আবৃত্তি মাত্রেই উহার প্রতীতি হইতে পারে।

শালির মধ্যে লোহিত শালি, ষষ্টিকের ষষ্ঠিকা (ষেটেধান), শূকধান্যের মধ্যে যব ও গোধূম শ্রেষ্ঠ। শমীধানের মধ্যে মুগ, মসূর আঢ়কী (রহর বা অরহর); রসের মধ্যে মধুর রস, লবণে সৈন্ধব, ফলে দাড়িম, আমলক, দ্রাক্ষা, খর্জূর, পরূষক (পরূষা), রাজাদন (পিয়াল), ও মাতুলুঙ্গ (লেবু-বিশেষ) প্রশস্ত। পত্রশাকের মধ্যে বেতুয়া শাক জীবন্তী ও পুইশাক শ্রেষ্ঠ। ফলশাকে পটোল, কন্দশাকে সুবর্ণ (ওল) জঙ্গলের মধ্যে এণব কুরঙ্গ ও হরিণ প্রশস্ত। হরিণ জাতীয়ের মধ্যে তাম্রবর্ণ গুলি হরিণ, কৃষ্ণবর্ণ গুলি এণ, অতি বৃহৎ তাম্রবর্ণ হরিণ কুরঙ্গ। পক্ষিগণের মধ্যে তিত্তিরি ও লাব। মৎস্যে রোহিত শ্রেষ্ঠ। জলের মধ্যে দিব্য জল, দুগ্ধের মধ্যে গোদুগ্ধ, আজ্যে গব্যঘৃতং তৈলে তিল তৈল, ইক্ষুজাত পদার্থে শর্করা প্রশস্ত।

স্বভাবতঃ হিত।

শমীষু মাষান্ ব্রীহর্ষো লবণেষ্টৌষরং ত্যজেৎ।
ফলেষু লকুচং শাকেসার্ষপং নহিতং মতম্ ॥

গোমাংসংগ্রাম্য মাংসেষু নহিতা মহিষী বসা।
মেষীপয়ঃ কুসুম্ভস্য তৈলস্ত্যাজ্যঞ্চ ফাণিতম্॥"

ভাব প্রকাশঃ।

গ্রীষ্মকালে শমী জাতির মধ্যে মাষ, লবণে ঔষর (ক্ষার লবণ) ফলে লকুচ (ডেহুয়া), শাকের মধ্যে সার্ষপ শাক অহিত। গ্রাম্য মাংসের মধ্যে গোমাংস স্বভাবতঃ অহিত। মহিষী বসা হিত নহে। দুগ্ধের মধ্যে মেষী দুগ্ধ, তৈলের মধ্যে কুসুম ফুলের বিচির তৈল, ও ফাণিত স্বভাবতঃ অহিত। ইক্ষুরস পাকে অর্দ্ধঘন হইলে ফাণিত হয়।

বাহুল্যভয়ে আর লিখিত হইল না। স্থূলভাবে সংক্ষেপে লেখা হইল। আরও সংক্ষেপে বলিতে হইলে ত্রিবিধ অন্নদোষের প্রতি বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। যথা

"অন্নদোষ স্ত্রিবিধঃ দৃষ্ট দ্বারকঃ, অদৃষ্টদ্বারকঃ, দৃষ্টাদৃষ্টদ্বারকঃ। দৃষ্টদ্বারকঃ আয়ুর্ব্বেদোক্তঃ। অদৃষ্টদ্বারকঃ স্মৃত্যুক্তঃ। উভয়োক্তস্তু বলে বৎসা বিবৎস্বা দুগ্ধাদিদোষো দৃষ্টাদৃষ্টদ্বারকঃ।" স্মৃতিঃ

আয়ুর্ব্বেদোক্ত দোষ স্মৃত্যুক্ত দোষ অদৃষ্ট দোষ, উভয়োক্ত দোষ দৃষ্টাদৃষ্ট দ্বারক। এই ত্রিবিধ দোষের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আবশ্যক। তন্মধ্যে স্মৃত্যুক্ত দোষ পরিহার না করিলে সত্ত্বশুদ্ধি হয় না। বরং পাপজরোগজন্মে, বেদানুগত স্মৃতি সর্ব্বথা মান্য আয়ুর্ব্বেদে পথ্য ও ঔষধাদির ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসককেও ধর্ম্মশাস্ত্রানুশাসন যথাসাধ্য পালন করিয়া ব্যবস্থা দিতে হইবে। এইজন্য "সত্যধর্ম্ম পরোযশ্চ বৈদ্য ঈদৃক্ প্রশস্যতে।

ক্রমশঃ

গ্রাহকদিগের প্রতি বিনীত নিবেদন।

ধীরে ধীরে একটি, দুইটি করিয়া তিনটি বৎসর কাটিবার উপক্রম হইল। আর একটি মাস পরেই বেদব্যাসের তিনটি বৎসর পূর্ণ হইবে। এই তিন বৎসর আমরা যথাসাধ্য পাঠকগণের সন্তোষ সাধনে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি; কেবল বর্ত্তমান বর্ষে এককালীন কতকগুলি সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত হওয়ায় বেদব্যাস সম্বন্ধে কতকগুলি ত্রুটি হইয়াছে। সে সমস্ত ত্রুটি আমরা নিজে বুঝিতে পারিয়াও অনিবার্য্য কারণে উহার সংশোধন করিতে পারি নাই। সেই জন্য গ্রাহকগণের নিকট অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছি। যাহাতে বেদব্যাসের কার্য্য সম্বন্ধে আর কোনরূপ গোলযোগ না হয় তজ্জন্য আমরা এবার হইতে বিশেষ যত্নশীল হইব। আমরা অন্যান্য সমস্তকার্য্য হইতে একরূপ অবসর গ্রহণ করিয়া বেদব্যাসের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। অতএব আমরা বিশেষ ভরসা করি যে আগামী বর্ষে বেদব্যাসের নানাবিধ উন্নতি দেখিয়া পাঠকগণ সুখী এবং অনুরাগী হইবেন। কিন্তু বেদব্যাসের সমস্ত উন্নতিই গ্রাহকগণের অনুরাগ ও অনুকম্পার উপর নির্ভর করে। আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় যে, অদ্যাবধি বেদব্যাসের কোন গ্রাহকই তাঁহাদের দেয় মূল্য না দিয়া বেদব্যাসকে বিব্রত করেন নাই। এখন আমাদের বিনীত অনুরোধ যে গ্রাহকগণ পূর্ব্বের-ন্যায় ঔদার্য্য গুণে উৎসাহিত হইয়া সত্বর বেদব্যাসের আগামী বর্ষের প্রাপ্য টাকা প্রেরণ করেন। আমাদের নিয়ম ৩০ শে চৈত্র পর্য্যন্ত কেবল ১৲ হিসাবে গ্রাহক লওয়া হইবে। তৎপরে আর কিছুতেই ওরূপ হিসাবে বন্দবস্ত হইবে না; তখন সকলকেই ২৲ টাকা করিয়া দিতে হইবে। ইহা যেন স্মরণ থাকে।

শেষে বেদব্যাসের মঙ্গলাকাঙ্খী দিগের প্রতি আমাদের সানুনয় নিবেদন যে, তাঁহারা যেরূপ বেদব্যাসের প্রতি অনুরাগী তদ্রূপ বেদব্যাসের কল্যাণের জন্য কখন চেষ্টিত হন নাই। বেদব্যাস যাহাতে হিন্দুর প্রতি গৃহে বিরাজ করে তাহার জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। প্রত্যেকে যদি অন্ততঃ পাঁচ জন করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন তাহা হইলেও বেদব্যাসের আরও বহুল প্রচার হয়। বেদব্যাসের কি বাহুল প্রচার একান্ত প্রার্থনীয় নহে? আমরা যতদূর শুনিয়াছি তাহাতে অনেকেই এরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সেইজন্য, সেই ভরসায় বুক বাঁধিয়া আমরা পুরাতন গ্রাহকদিগের নিকট সানুনয় প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন বেদব্যাসের কল্যাণার্থ কথঞ্চিৎ স্বার্থ-ত্যাগ করিয়া বেদব্যাসের গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর হন। আমাদের বিশ্বাস তাঁহাদের সামান্য চেষ্টাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমরা আশা করি গ্রাহকগণ আমাদের এ অনুরোধ রক্ষা করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

সম্পাদক।